কি শো র ক ণ্ঠ

গল্প সমগ্র

৩

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন

কিশোরকণ্ঠ

গল্পসমগ্র

৩

www.icsbook.info

কিশোরকণ্ঠ গল্পসমগ্র-৩

প্রকাশনায়
কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন
৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৭২৩৬

গ্রন্থস্বত্ব
কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল
নভেম্বর, ২০১৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : হামিদুল ইসলাম

গ্রাফিকস : মনিরুজ্জামান মনির

মুদ্রণ
মনিরামপুর প্রিন্টিং প্রেস
৭৬/এ নয়া পল্টন, ঢাকা

দাম : ২০০ টাকা

Kishorkantha Golposomogro-3
(a complete story collection published in the monthly kishorkantha)
Published by Kishorkantha Foundation
51, 51/A Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh
kishorkantha@yahoo.com, www.kishorkanthabd.com
Printed at November, 2019
Price : Tk. 200 ■ US$ 10

www.icsbook.info

কিশোরকণ্ঠ

৩

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

নির্বাহী সম্পাদক
মু. রাজিফুল হাসান

সহকারী সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান
তোফাজ্জল হোসাইন
আবিদ হাসান

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন

www.icsbook.info

সূচিপত্র

বেপরোয়া ॥ আল মাহমুদ ১১

ফুটবল আর আমি ॥ জুবাইদা গুলশান আরা ১৬

কোকিলের সাতকাহন ॥ নয়ন রহমান ২১

অপুর অভিমান ॥ জাফর তালুকদার ২৮

খালা–দ্যা গ্রেট ॥ ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ ৩২

আরিজের ঈদ ॥ মাহবুবুল হক ৩৯

ক্যাম্পিং ॥ হোসেন মাহমুদ ৪৪

একজন সুখীর কথা ॥ এনায়েত রসুল ৫৩

বিড়াল তপস্বী মিলি ॥ সোলায়মান আহসান ৬৪

সেই বৈশাখে ॥ মোশাররফ হোসেন খান ৭২

ভূতের মা ডাইনি ॥ নাজিব ওয়াদুদ ৭৮

www.icsbook.info

তাদের কি নাম ॥ বুলবুল সরওয়ার ৮৯

এই নাও জুলফিকার ॥ আবদুল হালীম খাঁ ৯৫

মৃত্যু বিভীষিকা ॥ আহমদ মতিউর রহমান ৯৭

সততা ও ধূর্ততার লড়াই ॥ রূপান্তর : হাসান হাফিজ ১০৫

ঐতিহাসিক বিজয় ॥ মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ ১১০

তানিজিং গ্রহের আগন্তুক ॥ মহিউদ্দিন আকবর ১১৬

অঙ্গীকার ॥ ইকবাল কবীর মোহন ১২০

বেজি ও গুপ্তধনের গল্প ॥ দেলোয়ার হোসেন ১২৩

নিশিরাতে মামাবাড়ি ॥ শরীফ আবদুল গোফরান ১২৮

পুঁজি ছাড়া ব্যবসা ॥ মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ১৩২

অনিক ও গুইসাপ ॥ জাকির আবু জাফর ১৩৬

ওরা চাঁদে যায় ॥ হারুন ইবনে শাহাদাত ১৪৪

সোনালি দিনের প্রত্যাশা ॥ আলতাফ হোসাইন রানা ১৪৮

রোশনীদের ঈদ ॥ মাহফুজুর রহমান আখন্দ ১৫২

ঈদের চাঁদ ॥ আবুল হোসেন আজাদ ১৫৬

বিশ্বাস ॥ হেলাল আনওয়ার ১৫৯

সুরের মূর্ছনা ॥ রফিক মুহাম্মদ ১৬৬

জলপ্রপাতের জীবন্তিকা ॥ শাহনাজ পারভীন ১৭২

শীত উপহার ॥ জুবায়ের হুসাইন ১৭৬

দাগ ॥ মুহাম্মাদ দারিন ১৮৩

মূল্যায়ন ॥ আশরাফ জামান ১৯০

www.icsbook.info

রক্তেভেজা পালক ॥ তমসুর হোসেন ১৯৪

শাওনের গল্প লেখা ॥ আহসান হাবিব বুলবুল ১৯৮

একটি কান্নার গল্প ॥ আহমদ বাসির ২০৩

আজব কাণ্ড ॥ আহমেদ বায়েজীদ ২০৯

ছুটির দিনে ॥ তৌহিদুর রহমান ২১৩

শহুরে এক ছাগলছানা ॥ এ কে আজাদ ২২২

নানুর যুদ্ধ জয়ের গল্প ॥ আবদুল ওহাব আজাদ ২২৮

বাবা ফিরে আসেনি ॥ আবদুস সবুর খান ২৩২

স্বাধীনতার গল্প ॥ তোফাজ্জল হোসাইন ২৩৫

ওপারের জারজিস ॥ নাবিউল হাসান ২৩৮

www.icsbook.info

বড় বেদনার সাথে আজ একথা উচ্চারণ করতে হয় যে, সাতচল্লিশ-উত্তর এদেশের পাঠ্যবইয়ে যতটুকু নীতি-নৈতিকতা এবং আদর্শিক শিক্ষামূলক গল্প-ইতিহাস প্রভৃতি ছিল, যা কিশোর-মানস গঠনে ছিল সহায়ক– সেটুকুও কালক্রমে বিলুপ্ত হলো। যতই কষ্টের বিষয় হোক না কেন, বাস্তবে তো এটাই ঘটলো– একাত্তরের স্বাধীনতা-উত্তর যেসব পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা হলো, তাতে আর যাই থাকুক না কেন, আগের সেইসব গল্প-ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হলো। ইসলাম তো দূরের কথা, মুসলিম সেন্টিমেন্টকেও সেখানে অবহেলা করা হলো। কোথায় সেই হাজী মুহাম্মদ মুহসীন, মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী, শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর! সেই সব জায়গা দখল করে নিল কালক্রমে ভূত-প্রেত আর কল্পকাহিনী। শেখ সাদী, রুমীর গল্পের পরিবর্তে এখন আমাদের শিশু-কিশোরদের স্কুলপাঠ্য হিসাবে পড়তে হয় টোনাটুনির গল্প, গোপালের কপাল, বানরের রুটিভাগ, শেয়ালের পাঠশালা, ডাইনি বুড়ি প্রভৃতি। নগরকেন্দ্রিক প্রায় প্রতিটি স্কুলের গেটের সামনে অদ্ভুত সব মাল্টিকালারের ঝকমকে প্রচ্ছদে শোভিত শতশত গল্প বইয়ের পসার সাজিয়ে রাখে এক শ্রেণির বিক্রেতা। তারা খুব কম দামে কিনে চড়া দামে এসব বই তুলে দেয় কিশোরদের হাতে। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কিংবা অন্যভাবে পিতা-মাতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই অর্থে কিনে আনছে তারা এইসব বই। কৌশলে তাদের কী বই পড়ানো হচ্ছে? আফসোসের বিষয় বটে, তার চেয়ে অনেক বেশি আশঙ্কার কথা। এইসব হলো– 'জোলা আর সাত ভূত', 'গোপাল ভাঁড়ের গল্প', 'রাক্ষসী রাজকন্যা', 'হাসির গল্প'– ধরনের সেই পুরনো, অতি

www.icsbook.info

পরিচিত এবং ততোধিক অমার্জিত ভুলে ভরা বই। ছোটরা যেহেতু গল্প শুনতে, বলতে এবং পড়তে ভালোবাসে, সে কারণে এক শ্রেণির সুচতুর ধূর্ত জ্ঞানপাপী সেই সুযোগের পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করেই চলেছে। ভাবা যায়, আমাদের সন্তানরাই এসব বই পড়ে লুকিয়ে, চুপিসারে কিংবা প্রকাশ্যে।

সন্দেহের অবকাশ নেই, স্কুলপাঠ্য থেকেই তারা উদ্বোধিত এবং উৎসাহিত হচ্ছে এইসব বইয়ের প্রতি। যেহেতু তাদের পাঠের তৃষ্ণা ও জানার স্পৃহা প্রবল, সেই কারণে যা সামনে এবং সহজে পাচ্ছে তাই পড়ছে আর শিখছে।

যারা ভাবতে পারেন এবং কিছু করতে পারেন, তাদের জন্যই বলা– আমাদের সন্তানেরা যে ধরনের গল্প পাঠে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে এবং তার ফলে যে মানসিকতায় বেড়ে উঠছে– তা আগামীর জন্য কতটা আশঙ্কা ও ভয়াবহতার ব্যাপার, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই এখন ভেবে দেখা জরুরি।

অধিকাংশ লেখকের বড় ব্যর্থতা হলো– এত কাল লিখেও, শতশত বই প্রকাশ করেও আমাদের সন্তানদের আমরা গল্প পাঠের মানসিক তৃপ্তি দিতে পারিনি। সেটা পারলে সন্দেহ নেই– 'গোপাল ভাঁড়' ছেড়ে তারা নিশ্চয়ই এই দিকে অনেক বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠতো। লেখার প্রতি আমাদের অনাদর এবং অদক্ষতাই সম্ভবত এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুরাবস্থার মূল কারণ। ছোটদের ভেতর ভালো গল্প, ভালো বই পাঠের তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলার টেকনিকটা সম্ভবত আমরা ধরতে পারছি না। এটা তো ঠিকই, একজন কিশোর যদি একটি লেখা পাঠ করে আর একটির প্রতি লোভী দৃষ্টি না ফেলে, তাহলে বলাই বাহুল্য– সেই ব্যর্থতা ঐ কিশোরের নয় বরং লেখকের। বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত বলে মনে করি।

সংখ্যাধিক্য কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– ভালো লেখা। আমাদের সন্তানদের হাতে আমরা এমন বই তুলে দিতে চাই, যে বই পেলে তারা নাওয়া-খাওয়া ভুলে এক নিঃশ্বাসে পড়ে যাবে। কিংবা হুমড়ি খেয়ে পড়বে প্রতিটি বর্ণের ওপর, প্রতিটি বিষয়ের ওপর মিষ্টিলোভী পিঁপড়ার মতো। বইটি হতে হবে এমন বই, লেখাটি হতে হবে এমন লেখা– যা কাজ করবে ঠিক ঐ লাউ শাকের চারার মতো– শিকড়ে পানি পেলে যে চারা লকলক করে বেড়ে ওঠে। কী সবুজ, কী তরতাজা, কী পরিপুষ্ট তার এক-একটি লতাপাতা! তরতর করে বেড়ে উঠছে, বেড়ে উঠছে আলো-পানি আর

www.icsbook.info

বিশুদ্ধ বাতাসের সাহায্যে। বড় হচ্ছে। তার জন্য তখন প্রয়োজন পড়ছে বিশাল মাচা বা ছাউনির। তারপর অবাক-বিস্ময়ে তারা তাকিয়ে থাকবে পৃথিবীর দিকে। বলবে, হ্যাঁ! এই পৃথিবী আমার। আমিই এর যোগ্য উত্তরাধিকার।

আমরা তো চাই তরতাজা প্রাণস্পন্দনে টইটুম্বুর তেমনি শিশু-কিশোর– যারা পুঁই কিংবা লাউয়ের মতোই শুধু হবে না, কেউ কেউ হয়ে উঠবে বিশাল বট কিংবা শালবৃক্ষও।

কিন্তু তার জন্য ক্ষেত্র তৈরির দায়িত্বটি পালন করতে হবে আমাদেরই। ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা একই সাথে লেখক আবার অভিভাবকও বটে।

২০০০ সালে কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'কিশোরকণ্ঠ উপন্যাসসমগ্র ১'। 'সমগ্রটি' প্রকাশের পর কিশোরদের মাঝে তো বটেই, বিদগ্ধপাঠক ও সুধীমহলে সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিশোরকণ্ঠ পরিবারও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। ইচ্ছা ছিল এইভাবে প্রকাশনার ধারা অব্যাহত রাখার। সেই পদক্ষেপেরই ধারাবাহিকতায় একে একে প্রকাশ পেয়েছে কিশোরকণ্ঠ গল্পসমগ্র ১ ও গল্পসমগ্র ২, কিশোরকণ্ঠ সায়েন্স ফিকশন সমগ্র ১, কিশোরকণ্ঠ কার্টুনসমগ্র, পাহাড়ি এক লড়াকু প্রভৃতি।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশ পাচ্ছে 'কিশোরকণ্ঠ গল্পসমগ্র ৩'। এটা ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত কিশোরকণ্ঠে প্রকাশিত গল্পসমূহ থেকে বাছাইকৃত গল্পের সমাহার। গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা বরাবরই দেশাত্মবোধ, শিক্ষা, নীতি-নৈতিকতাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ফলে আশা করি কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন থেকে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মতো বর্তমান গল্পসমগ্রটিও সমানভাবে পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশনের এ ধারা যেন অব্যাহত থাকে সে জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য ও সকলের দোয়া কামনা করছি।

মোশাররফ হোসেন খান
অক্টোবর, ২০১৯

www.icsbook.info

www.icsbook.info

বেপরোয়া

আল মাহমুদ

নাম সফিক। বয়স সতেরোর বেশি হবে না। বাড়ি কোথায় তা জানি না। তবে সব সময় তাকে শহরের অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতে দেখি। কখনও দেখি স্টেশনের বারান্দায় বাউণ্ডুলে ছেলেদের সাথে বসে কী সব খেলছে। অথবা ফেরিওয়ালা ছেলেদের সাথে মারপিট করে রক্তাক্ত দেহে রাস্তা দিয়ে চলেছে। সব সময় তাকে দেখা যায় গায়ে ছেঁড়া কোট, পরনে ময়লা প্যান্ট, মাথায় চাইনিজ টুপি– যার নিচে চোখ দু'টি ওঁৎ পেতে আছে সাহেবদের পকেট মুখো।

পকেটমার? চুপ! আস্তে বল, শুনতে পেলে জিভ টেনে ঝুলিয়ে দেবে তোমার। নিজের বদনাম সে শুনতেই পারে না। নিজের জাত-ভাইদের ঘৃণা

www.icsbook.info

করে সে। সফিকের মতে তারা চুরি করতে জানে না, শুধু মার খেতে জানে। সেও তো চোর, কিন্তু দেখ তার বাহাদুরি, কখনও সে জেলে যায়নি বা ধরা পড়েনি। তার ভাই-বেরাদরেরা ধরা পড়ে যখন বেদম মার খেতে থাকে, সে সময় সফিক কোটের কলারটা উঁচু করে হাসতে হাসতে ওদের দিকে এগিয়ে যায়, ঘৃণাভরে বলে, মারো বেটাদের মেরে ফেল। তারপর জুতো দিয়ে ঠোক্কর মারে চোরটার পিঠের ওপর। বলে, মর বেকুব, মরে যা... আদ্দির পকেটে হাত আটকে যায়? বিষ খেয়ে মরতে পারো না, ছিঁচকে চোর কোথাকার...।

সাহেবদের দিকে ফিরে বলে, 'ছেড়ে দিন সাব, আমি বানিয়ে দিচ্ছি; আমার হাতে ছেড়ে দিন।' তারপর ছেলেটাকে টেনে তোলে, ওঠ্... উঠে আয়। এভাবে চোরটাকে নিয়ে সরে আসে সফিক। চোরটা জালিমের হাতে পড়েছে ভেবে সাহেবরা নিশ্চিন্ত মনে পথ ধরেন। এদিকে সফিক চোরটাকে তার চুলের মুঠি ধরে নিরালা জায়গায় নিয়ে আসে। তারপর বলে, এ লাইন ছেড়ে দে, বড় কষ্ট রে, কত মার আর খেতে পারবি। তা ছাড়া জেলে যেতে আর কতক্ষণ। ছেলেটা কান্নাভেজা চোখে হেসে ফেলে। খুশিতে সফিককে প্রশংসা করতে যায়–

'তুমি আমার...।'

'চারটা পয়সা দে বলছি, চা খাব।'

'পয়সা দেব কোথা থেকে?'

'ভাগ...।' লাথি উঁচিয়ে বলে সফিক। ছেলেটা দ্রুত দু'পা পিছিয়ে যায়।

'আবার দাঁড়িয়েছিস?'

চিৎকার করে উঠে সফিক। তাড়াতাড়ি ছেলেটা সরে যায়। এভাবে তাদের বাঁচায় সফিক। সেদিন সন্ধ্যায় সফিক বসেছিলো চায়ের দোকানটায়। কোনো আড্ডা থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছে সে। তিন বাজিতে সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে ফতুর করে দিয়ে এসেছে।

একশো টাকা চৌদ্দ সিকি দাম তার ছেঁড়া পাতলুনের বাঁ দিকের পকেটটার, মুখে মৃদু হাসি থেবড়ে আছে। ছেলেদের খেলার মার্বেলগুলোর মতো চোখ দুটো চকচক করে জ্বলছিল তার। ধূমায়িত চায়ের কাপটা সামনের টেবিলটায় ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হচ্ছে।

এমন সময় ট্রেন এসে থামলো স্টেশনে। পিঁপড়ের সারির মতো পিলপিল করে প্যাসেঞ্জার বের হয়ে আসতে লাগল প্লাটফর্ম হতে। সফিকের দৃষ্টি এসে থেমে গেল তাদের ওপর। ভিড়ের ভিতর হতে হঠাৎ একটা লোক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, ব্যাগ, আমার ব্যাগ...।

www.icsbook.info

জনতার ভিড় ঘিরে ধরল তাকে।

'কী হয়েছে মশায়?'

'পকেট মারা গেছে নাকি?'

'কত টাকা ছিল দাদা?'

এক ঝাপটা প্রশ্ন সাথে সাথে ঝরে পড়ল।

আমার সর্বনাশ হয়েছে ভাইসব, আমার সব গেছে, আমার ছেলের ফিসের টাকা নিয়ে পালিয়েছে...।

কেঁদে ফেলল লোকটা। আবার জনতার মুখ হতে প্রশ্ন ঝরে পড়ে, কত টাকা ছিলো, য়্যা... কী করে নিল মশায়... ছেলেটা কোন ইয়ারে পড়ে ভাই...। অর্ধেক খেয়ে কাপটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল সফিক। ক্যাপটা নামিয়ে দিল চোখের ওপর। কোটের কলারটা খাড়া করে দিয়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে যায়। ভিড়ের ভেতর ঢুকে সোজাসুজি লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'কত টাকা খোয়া গেছে বললেন?'

'সত্তর টাকা দু-আনা। আমার ছেলের ফিসের টাকা।' বলেই আবার হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল লোকটা। লোকটার আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলাতে লাগল সফিক।

পরনে খদ্দরের ময়লা পাঞ্জাবি, ছেঁড়া ধুতির কোচা খসে রাস্তায় লুটোচ্ছে, বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, ভাঁজপড়া গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের পানি।

'কোন স্টেশনে টাকাটা খোয়া গেছে বললেন?'

'এইখানে, এই প্লাটফর্মের ভেতর।'

'কী করে বুঝলেন?'

'গাড়ি থেকে নামবার সময় পকেটে হাত দিয়ে দেখেছি টাকাটা আছে, আর এক্ষুনি...।'

কাঁদবেন না, আসুন আমার সঙ্গে। লোকটার হাতে ধরে টেনে ভিড় থেকে আলাদা করে আনল সফিক। পেছন ফিরে তাকাল একবার। ভিড় তার অনুসরণ করছে কি না। ওর পেছনে লোক যারা আসছিল, তাদের দিকে কটমট করে তাকাল সফিক। বলল, 'কোথায় আসছেন আপনারা? কী চান... চলে যান, চলে যান যে যার পথে। কেন আসছেন, কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবেন ওর টাকা?'

ভিড় ভেঙে গেল। সফিক লোকটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল হোটেলের এক ঘুপচিতে। নিজের ময়লা ব্যাগটা খুলল।

www.icsbook.info

'কত খোয়া গেছে?'

লোকটা কথা বলতে পারল না, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সফিকের দিকে।

'কথা বলছেন না যে?'

'সত্তর টাকা!' কাঁপতে কাঁপতে বলল লোকটা।

নিন, লাল দশ টাকার সাতটা নোট এগিয়ে দিল সফিক লোকটার দিকে।

'একি তুমি দেবে কেন?'

'এমনি দিচ্ছি না, দান নয়। যেই আপনার টাকা নিক না কেন ঠিক আদায় করে নেব। নিন।' লোকটার হাতে টাকা কয়টা গুঁজে দিল সফিক। 'সাবধান, টাকা পাওয়ার কথা কাউকে বলবেন না যেন, চুপচাপ চলে যান এই ফাঁড়ি রাস্তা ধরে।'

'তুমি...।'

'চুপ! কথা বলবেন না, টাকা পেয়েছেন, চলে যান। হাঙ্গামা বাড়াবেন না। বুড়ো হয়েছেন তবু নিজের পকেট সামলাতে পারেন না। চোখ বুজে চলাফেরা করেন নাকি?'

'ধন্যবাদ বাবা, দীর্ঘজীবী হও...।'

'থাক প্রশংসার দরকার নেই।'

'সত্যিই দেবতা তুমি...।'

'আমি পকেটমার... চলে যান বলছি।' চিৎকারে ফেটে পড়ল সফিক। খুশি মনে বিড়বিড় করতে করতে পথ ধরলো লোকটা।

হোটেলের বয়কে চিৎকার করে ডাকল : 'কলিম, এদিকে আয়।'

'কি? কিছু চাই নাকি ভায়া? কী দেব বলো? ভেড়ার মাংস আছে আজ, দেব একটু?' হাত কচলাতে কচলাতে কাছে এসে দাঁড়াল ছেলেটি।

'বোকার মতো দাঁত বের করেছিস কেন?'

'ছেলেটার কলার ধরে টানল সফিক। হ্যাঁচকা টান খেয়ে ছেলেটার মাথা নুইয়ে পড়ল তার মুখের কাছে।

'কি মারধোর করছ কেন?'

'মারব না, শোন...।'

ছেলেটার কান সফিক তার মুখের কাছে টেনে আনল।

'আজ যদি ছিঁচকে চোরদের কেউ এখানে মাংসের অর্ডার দেয় আমাকে তার নাম জানাতে পারবি?'

'নিশ্চয়ই পারব।'

'পুরস্কার পাবি।'

www.icsbook.info

পুরস্কারের কথা শুনে হাসল ছেলেটি।

'কেন বল তো?'

'ছিঁড়ে ফেলব তাকে।'

দাঁতে দাঁত ঘষল সফিক।

'ফাঁকি দিয়েছে বুঝি?'

'না, চুরি করেছে। একজন গরিবের টাকা। এতদিনে বুঝলাম, চুরি জিনিসটা ভালো না। নিজেদেরও বিশেষ কিছু হয় না আবার আর একজনেরও সর্বনাশ। যাতে এখানে আর চুরি না হয় তাই করব রে। সবার আজ চুরি ছাড়িয়ে তবে ছাড়ব। দুনিয়ায় আর কত কাজ আছে। এর চাইতে রিক্সা টানা ভালো।' বলল সফিক।

ছেলেটা হতভম্ব হয়ে গেল। একি কথা, ও যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না।

www.icsbook.info

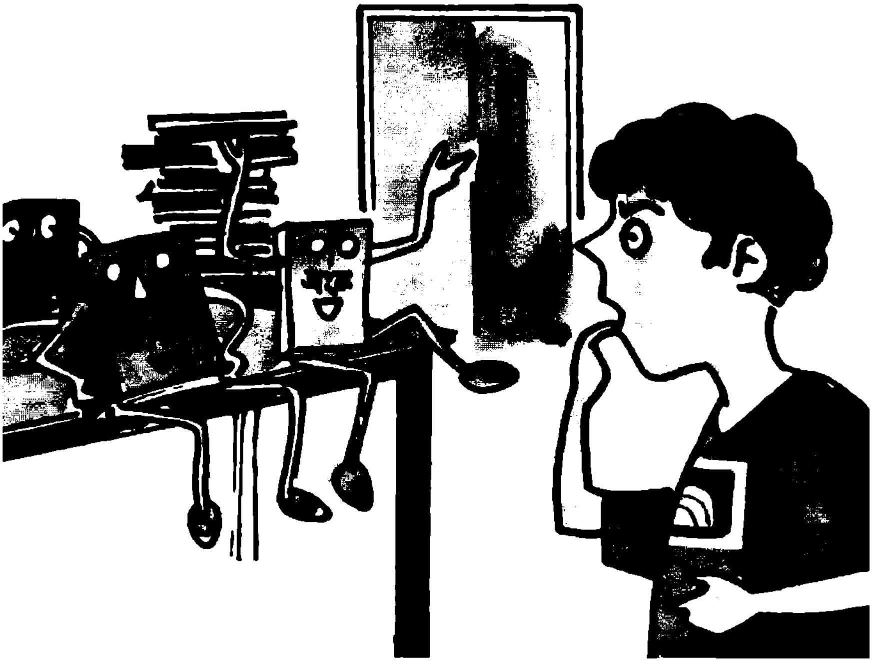

ফুটবল আর আমি

জুবাইদা গুলশান আরা

কাণ্ডটা ঘটেছিলো এই ঢাকা শহরেই। বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু ঘটলো যে একেবারে আমার চোখের সামনে। তাহলে বিশ্বাস না করি কেমন করে বলো?

ব্যাপারটা খুলেই বলি। ক'দিন ধরে বিশ্ব ফুটবলের মাতামাতি নিয়ে একেবারে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাবার জোগাড়। স্কুলে যাবার সময় দেখি দোকানে সাজানো কত কাপ-পেয়ালা, তাতে নানা দেশের ছবি। খেলোয়াড়দের ছবি আঁকা ক্লিপ, কাপড়ের ব্যাজ, তৈরি করে দোকান বোঝাই করে সাজানো। আমাদের বাড়িতেও মহা হইচই। আব্বার পছন্দ ব্রাজিল আর সাউথ আফ্রিকা, আমার প্রিয় জার্মানি– সেই মত একটা ঢাউস দেয়াল জোড়া ছবি এনে আব্বা আমাদের পড়ার ঘরের দেয়ালে লাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, বল, আর কী চাস? সবাইকেই তো এর মধ্যে পাবি তাই না? ফুটবলের

www.icsbook.info

রাজপুত্রদের মন ভরে দ্যাখ।

– কিন্তু আব্বা, বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় পেলে? পেলের আলাদা ছবি তো নেই। আর মেসি? মেসিও তো খুব ভালো খেলেন আব্বা! তা ছাড়া জিদান, তিনি তো বিখ্যাত!

– ওই হলো তো! বাবা আর ছেলে মিলে আমার বাড়িটা একেবারে ভূতের বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে! নিজেরা তো খেলাধুলোয় লাড্ডু। ওদিকে সারাক্ষণ টেলিভিশন চলছে আর চিৎকারে কান ঝালাপালা। আম্মা রেগে রেগে বলেন।

– কেন বকছো ছেলেটাকে! না হয় না-ই খেলা পারলো। কিন্তু হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে তো আমরা গর্বিত হতে পারি! আব্বার কথায় আমার খুব ভালো লাগে। আম্মার আর কী! নাটক, রান্না এসব ছাড়া কিছু ভালো লাগে না তার। এইতো দেখতে দেখতে ফুটবল খেলার দিন চলে যাবে। তখন আবার অঙ্ক, ইতিহাস ও ইংরেজি। ওরে বাবা, অঙ্কের স্যার যা কড়া। ভুল করলে আর রক্ষা থাকবে না। না, পড়াশোনা করতেই হবে। স্যারের কথা না শুনলে আর ক্লাস সিকসে উঠতে হবে না! কাজেই যতো ভালোই বাসো না কেন, ফুটবলের পাশাপাশি অঙ্কের সংখ্যাগুলো মনে না রাখলে চলবেই না।

সেদিন একটা ভারি মজার কাণ্ড ঘটে গেল, আমাদের বাসায় একটা ঝুড়ি ভরে কমলা নিয়ে বিক্রি করতে এসেছিল একটা ছেলে। প্রায় আমাদেরই বয়সী। ওর ঝুড়িতে বাতাবি লেবুও ছিলো। আম্মা বললেন, বাতাবি লেবুগুলো মিষ্টি আর ভালো। আমি বললাম, দেশী ফল না রেখে বিদেশী কমলা আর সবুজ লাল মাল্টা রাখো না কেন? ছেলেটা কেমন যেন জিদ করে বললো– না, বাতাবি লেবুই বেশি ভালো। আমিও কম যাই না। বার বার বলছি, লাল, কমলা আর সবুজ মাল্টাই ভালো।

– আমাগো গাছে জাম্বুরা হয়, হগলের চাইয়া মিঠা। ভাইজান একটা লন না, খুব স্বাদ! দেখলাম আম্মা ওর কথা শুনে বেশ পছন্দ করেছেন। ওর ঝুড়ি থেকে বেছে বেছে দুটো জাম্বুরা, বড় বড় আমড়া কিনে বললেন, ঠিক আছে তোর কথাই রাখলাম। আজকাল রোজার দিন, জাম্বুরা খেতে ভালো লাগবে। দুটো মাল্টাও অবশ্য রাখা হলো।

ছেলেটা হাসিমুখে সালাম জানিয়ে চলে গেল।

– দেশী ফলের স্বাদই আলাদা! মজা করে লবণ-মরিচ মাখানো জাম্বুরা খেতে খেতে বললেন দাদাজান। সবাই মিলে ইফতারিতে বসেছি, তাই আমি আমার রাগটা চেপে গেলাম। দেশী ফলের ওপর এত কী আদর শুনি? বলা

www.icsbook.info

যায় কিছুটা হিংসেই হলো আমার। সি ভিটামিনে ভরা জাম্বুরার গুণগান শুনতে শুনতে রাগ হলেও কিছু বলার ছিলো না আমার। ভালো মানুষটি হয়ে পড়ার টেবিলে বসতে হবে।

সেদিন হঠাৎ একটা মজার কাণ্ড ঘটলো। ঘুমটা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় দেখি কী পড়ার টেবিলের পাশে বই রাখা সেলফে বসে কারা যেন গুন গুন করে গান করছে।

আরে! সত্যিই তো! আমার ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল এমনকি পেন্সিলগুলোও আরাম করে বসে পা দোলাচ্ছে দেখি! লম্বা লম্বা ঠ্যাংগুলো প্রায় আমার নাকে এসে ঠেকে আর কি! আমি বলে উঠলাম, কে রে তোরা? আমার পড়ার ঘরে কী করিস?

ওরা এক সঙ্গে গাল ফুলিয়ে সুর করে বলে উঠলো– আমাদের না চিনলে তোমার চলবে কী করে? খেলার নেশায় পড়ায় ফাঁকি চলবে না, চলবে না। নিজেতো একটা গোলও করতে পারো না, খালি খালি বাংলাদেশ বাংলাদেশ বলে চেঁচামেচি করলে চলবে? জিততে হলে খাটুনি করা চাই। বুঝেছো? আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি!

যে বইগুলো বসে পা দোলাচ্ছিলো, তাদের মধ্যে একটা পেট মোটা বই আমার নাকের ডগায় আঙুল দুলিয়ে মোটা গলায় গেয়ে উঠলো– সারা দুনিয়ার যত খেলা আর যত খেলোয়াড়, সবাইকে ভালোবাসো, নিজের দেশের খেলোয়াড়দের খবর কি তুমি রাখো?

– রাখি তো! মিঁউ মিঁউ করে উত্তর দিলাম আমি।

– সারা গায়ে পতাকা জড়িয়ে স্টেডিয়ামে যেতে না পারলেও টেলিভিশনের সামনে বসে ওদের উৎসাহ দিই। তোমরা কি তা-ও পছন্দ করো না?

– না, করি না। লম্বা ঠ্যাং দুলিয়ে উত্তর দেয় অঙ্ক বই।

– পড়া ছেড়ে বসে বসে গোল খাওয়া ছাড়বে, সময়ে করবে কাজ, হোম ওয়ার্ক সবটা– নইলে কপালে আছে বড় চড় চাপটা। রাত জেগে খেলা দেখে ঝিমাবে, সকালে ভেবেছো কি স্কুলে কি আদর জুটবে কপালে?

নাঃ আমার সুখের ঘুমটা যে রসাতলে যাচ্ছে এখনই! চারদিকে বড় বড় চোখ করে বসে বসে বইগুলো খুব যেন মজা পাচ্ছে আমার দুরবস্থা দেখে। কী যে করি! এর মাঝে আবার আমার নাকের ডগায় এসে লাফাতে শুরু করলো একটা মস্ত গোল বল। একটা কোথায়? এক ডজন বলের ঘুষোঘুষি,

www.icsbook.info

লাফালাফির শব্দে আমি চোখ ছানাবড়া করে বসে আছি!

অঙ্ক বই, ভূগোল বইকে বললো, ও যে আজ আম্মার কাছে আবদার ধরেছিলো...

– আমি? কই না তো। আমি চিৎকার করে উঠি।

– না, মানে? তুমি বললে না, আম্মা আমার ব্রাজিলের ছবিওয়ালা গেঞ্জি চাই, কোরিয়ান ছবিওয়ালা ক্যাপ চাই, জার্মানির গ্লোব চাই। চাই। চাই। নইল চেঁচামেচি জুড়বো। করোনি মাকে জ্বালাতন? হুংকার দিলো সে।

– ওরে বাবা, থামো থামো না তোমরা! ফুটবল খেলা আমি ভালোবাসি বলেই তো এসব করেছি! তা আর না হয় জানো, আমার সব বন্ধুর ফুটবল খেলোয়াড়দের ছবিওয়ালা জামা, ক্যাপ, স্টিকার, মগ, ক্যালেন্ডার সব আছে। আমরা সবাই ওদের মতো ভালো প্লেয়ার হতে চাই। তাইতো সব কিছু চোখের সামনে সাজিয়ে রাখতে হয়।

– আচ্ছা, বাছাধন বলতো এইটা কি তোমার চোখের সামনে? মস্ত বড় সবুজ বন, পাহাড়, গাছপালাঘেরা একটা ছবি চট করে মেলে ধরে ইতিহাস বই। খটাস করে বুটে বুট ঠুকে বললো, বল দেখি বাবু এটা কোন্ জায়গা, কোন্ দেশ?

আমি থতমত খেয়ে খুব ভালো করে লক্ষ করে বললাম, কেন চট্টগ্রামের ফ'য়স লেকপার্ক।

– তোমার মাথা! এটা হলো নীলগিরি। বান্দরবান। নিজের দেশটাও তো ভালো করে চিনে উঠতে পারোনি। আচ্ছা, এই লোকটা কে?– বলো দেখি! মাথায় পাগড়ি পরা লোক দেখলেই আমার মনে পড়ে মীর কাসিম! চেঁচিয়ে বলি আমি।

– বোকার মতো কথা বলবে না। ইনি হলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, সিরাজউদ্দৌলা। আমার কানের মধ্যে এতক্ষণে বিন বিন করছে। ভাবছি, এরা যাবে কখন। এক সময় অঙ্ক বই লম্বা ঠ্যাংটা দুলিয়ে বললো, নিজেকে আগে ভালো করে গড়ে তোল বাবু, নইলে বলের ঘোরেই ঘুরপাক খাবে।

– আর হ্যাঁ, ঐ যে ছেলেটা তোমাদের পাড়ায় জাম্বুরা বেচতে আসে, ওকে তোমাদের খেলায় নিও। পারলে, তোমার সাতটা গেঞ্জি থেকে একটা ওকে দিও কিন্তু। ভুলে গেলে আমরা আবার আসবো।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরেজি বই তার কোটটা টেনে টুনে নিয়ে আমার কাছে এলো। বাংলা ব্যাকরণ এতক্ষণ কটমট করে তাকালেও এখন

www.icsbook.info

তার মুখটা বেশ হাসি হাসি দেখাচ্ছে। আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে বললো, কথাগুলো মনে রেখো, তাহলেই চলবে। কেমন? এখন ঘুমিয়ে পড়ো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে আমারও চোখ ভেঙে এলো। ঘরটা জুড়ে রিমিঝিমি কুয়াশা আর ঠাণ্ডা বাতাস।

– লেবু লইবেন নি লেবু? জাম্বুরা লইবেন ভাইজান!

আরে এতো ঐ ছেলেটাই, গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি। কিন্তু মুখটা ভারী হাসিখুশি। আমার কী যে হলো! ড্রয়ার খুলে সুন্দর একটা গেঞ্জি বের করে আম্মাকে বললাম, আম্মা, ওকে দিই?

– সে কি রে, কাউকে কিছু দিতে তো তোর মন ওঠে না। হঠাৎ এতো শখ! পরে আবার নিয়ে নিবি নাতো।

আমার বন্ধু রনি বললো– ওই ছেলেটা না খুব ভালো বল খেলতে পারে। আমি সেদিন দেখেছি, ঐ মাঠের ধারে। ধাঁই ধাঁই করে গোল করে।

– তাহলে তো ওকে শেখার সুযোগ করে দিতে হবে। বললেন আব্বা।

– কিন্তু ওর লেবু বিক্রির কী হবে?

– কেন, সারাদিন বিক্রি করবে। বিকেলে হাত-মুখ ধুয়ে তোদের লিটল ক্লাবে খেলবে। আবার কী! আমি তোদের ওস্তাদের সঙ্গে কথা বলবো।

– ছেলেটা বলে কি জানেন চাচা? বলে বিদেশী ফল তো বেচি ঠিকই কিন্তু আসলে আমাগো জাম্বুরাই ভালো। খাইতেও মিঠা, খেলতেও যেন ফুটবলের নাহাল।

ফুটবলের হৈ হৈ রৈ রৈ কিছুটা কামে এসেছে। কিন্তু আমাদের এখানে দারুণ জমজমাট হয়ে উঠেছে। খেলার দাপটে সারা পাড়া সরগরম। লেবু নিয়ে সাবু হাসিমুখে হাজির হয় সকালে। আর যেদিন ওর কাজ থাকে না, বিকেলে আমার দেয়া গেঞ্জি পরে হাসিমুখে হাজির হয় সে। সবাই বলে বড় হয়ে ও নাকি ভালো ফুটবল খেলোয়াড় হবে। আর একটা কথা তো না বললেই নয়। আবদার না করে আমি মন দিয়ে পড়া তৈরি করছি। তবে এ কথাও সত্যি, মাঝে মাঝেই মনে হয় রাতের বেলা, কারা যেন লম্বা লম্বা পা দুলিয়ে বসে আমাকে দেখছে, আমি ঠিকমতো ঘুমাচ্ছি কি না। সাধে কি আম্মা বলেন, লক্ষ্য করেছো আমাদের ছেলেটা এখন খুব নিয়ম মেনে চলে। আব্বা মুচকি হেসে বলেন, হু, বটেই তো।

www.icsbook.info

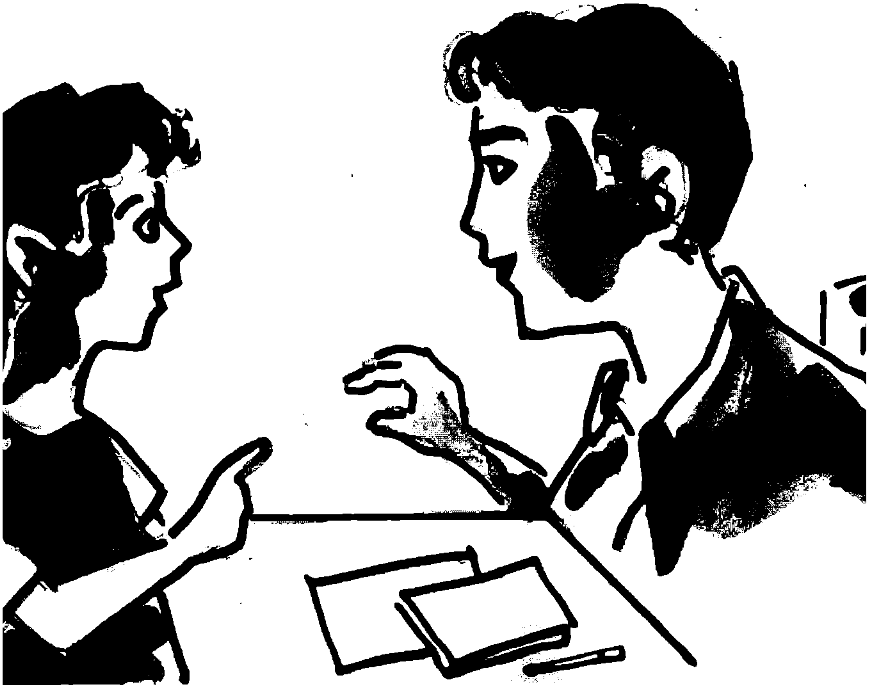

কোকিলের সাতকাহন

নয়ন রহমান

একটা পাখি থেমে থেমে ডেকে যাচ্ছে কুহু কুহু। ডাক শুনে মজা পাচ্ছে আসিফ। ও জানে এটা কোকিলের ডাক। শীত চলে গেছে। এখন বসন্তের ফুরফুরে হাওয়া চারদিকে। এই হাওয়া গায়ে মেখেই প্রকৃতির আঙিনায় এসে হাজির হয়েছে কোকিল। সময় সুযোগ বুঝে কোকিল এসে হাজির হয়। সময় ফুরিয়ে গেলে বিদায় নেয়। আসিফের স্যার একদিন হাসতে হাসতে বলেছেন, 'বসন্তের কোকিল'-এর মানে জানো তো? সুসময়ের বন্ধু। মানুষের সমাজেও এর ঢের উদাহরণ আছে। এসব মানুষকে বলা হয় বসন্তের কোকিল। তারপর ঝপ করে প্রশ্ন রাখলেন– কোকিল নিয়ে কে কতটুকু জানো, বল তো! ক্লাসে পিনপতন নীরবতা। মিটি মিটি হেসে বললেন, ঠিক আছে, কোকিল নিয়ে একটা রচনা লিখে এনো তো? এক সপ্তাহ সময় দিলাম। এখন ক্লাস টেনে উঠেছে। ক্লাস থ্রিতে গরু নিয়ে রচনা

www.icsbook.info

লিখেছ। ক্লাস টেনে উঠে গরু নিয়ে একই রকম রচনা লিখলে চলে না। কোকিল নিয়ে রীতিমত পড়াশোনা করে রচনা লিখে আনবে। যার রচনা উত্তম হবে তাকে পুরস্কার দেব।

পুরস্কারের কথা শুনে ছেলেরা নড়ে চড়ে বসে। একজন জিজ্ঞেস করে, স্যার কী পুরস্কার?

উহু, আগে গুমর ফাঁক করব না।

অন্য একজন বলে, স্যার, বই পুরস্কার দেবেন তো?

হ্যাঁ, বই খুব ভালো পুরস্কার। তবে আমি বই পুরস্কার দেব না। আমি তোমাদের বলধা গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে যাব।

সবাইকে স্যার!

হ্যাঁ, সবাইকে। একজন বা দু' তিনজনের কৃতিত্বে তোমাদের সবাইকে আমি বেড়াতে নিয়ে যাব।

স্যার, যদি লেখা ভালো না হয়?

হতাশার কথা বলবে না, আর 'না' শব্দটা খুব খারাপ। ভাল হবে, মোটামুটি ভালো হবে– এই চিন্তাটা মাথায় রাখবে।

ছুটির ঘণ্টার পর আসিফ বন্ধুদের সাথে সামান্য আলাপ আলোচনা করে। কিন্তু কেউই কোকিল সম্পর্কে খুব একটা কিছু বলতে পারে না। বাসায় ফিরে আসিফ ওর মাকে কথাটা বলে। মা ওর ভালো বন্ধু। মা বলেন, বাবা আমি কোকিল সম্পর্কে যা জানি তা খুবই সামান্য। তুমি এক কাজ করো, পাবলিক লাইব্রেরিতে চলে যাও, ওখানে পাখির ওপর অনেক বই আছে। খুঁজে দেখো, আর আমার জানা কথাও তোমাকে বলব। সব মিলিয়ে তোমার লেখা দাঁড় করিও। দেখো, কেমন হয়।

আসিফ উল্লাসে এক পাক ঘুরে বলে, মা তুমি আমার মোহিত স্যারের কথা ভুলে গেলে কেন? উনি তো সপ্তাহে দু'দিন পড়াতে আসেন। ওনাকে একটা ফোন করে দিই?

সে তুমি ফোন করতেই পারো। বুয়েটের ছাত্র। পাখি নিয়ে তার পড়াশোনা কতটুকু বলো? তুমি বরং পাবলিক লাইব্রেরিতেই চলে যাও।

মা, মোহিত স্যার গ্রামের ছেলে। কোকিল নিয়ে আমাদের চেয়ে তার ধারণা বেশি, লাইব্রেরি তো হাতে রইলোই। আসিফ ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ওর রচনাটা তো ভালো হতেই হবে। এটা একটা প্রেসটিজের ব্যাপার।

মোহিত স্যারও তার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। তিনি সরাসরি জানালেন,

www.icsbook.info

আমি সময়মতো আসব আসিফ। তুমি চিন্তা করো না। একটা সপ্তাহ তো হাতে আছে?

আসিফের তবু বুকের ভেতর উত্তেজনা। স্যার কখন আসবেন এ নিয়ে অস্থিরতা।

মোহিত স্যার হাসি হাসি মুখে ঘরে ঢুকেই প্রথম যে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন, তা শুনে তো আসিফ থ। মনে করে দেখো, কোকিলকণ্ঠী কাকে বলা হয়? সারাদিন তো টিভিতে মুখ দিয়ে বসে থাকো– এ প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারলে না?

আসিফ মুখ নিচু করে বসে থাকে।

মোহিত বলেন, কোকিলের কণ্ঠস্বর খুব মিষ্টি, খুব সুরেলা– তা জানো তো? কাকের কণ্ঠস্বর কর্কশ, তাই না? তাহলে আমরা বলতে পারি, যার কণ্ঠস্বর মিষ্টি ও সুরেলা কোকিলের মত তাকে আমরা বলি কোকিলকণ্ঠী। এই উপমহাদেশে কাকে কোকিলকণ্ঠী বলে জানো না? বিখ্যাত গায়িকা নূরজাহানকে কোকিলকণ্ঠী বলা হয় বুঝলে? তোমাকে-আমাকে বলা হয় না।

স্যার, বাংলাদেশেও তো...

হ্যাঁ, বাংলাদেশেও দু'জন বিখ্যাত গানের শিল্পী আছেন। তাদের কণ্ঠস্বরও অর্থাৎ গানের কণ্ঠ সুন্দর কিন্তু তাদের আজ পর্যন্ত কোকিলকণ্ঠী উপাধি দেয়া হয়নি। যাকগে, তুমি কোকিল নিয়ে কতটুকু ভেবেছ আগে তা শুনি। তারপর আমি তোমাকে শোনাব।

স্যার, আমি তো কোনদিন কোকিল দেখিইনি।

হ্যাঁ এটাই হলো মোক্ষম কথা। প্রথমত, তুমি থাকো খোদ ঢাকা শহরে। আর ঢাকা শহর এখন তো বলতে গেলে বৃক্ষবিবর্জিত। যেখানে ছায়াঘেরা গাছপালা নেই, সেখানে তুমি কোকিল দেখবে কি করে? আর কোকিল হল নিঃসঙ্গচারী। গাছের ডালে, পাতার আড়ালে থাকে। বসন্তের ফুলে ফুলে প্রকৃতি সেজে উঠলেই কোকিল এসে হাজির হয়। ডেকে ওঠে কুহু কুহু। গ্রামে বসন্তকালে গেলে এই ডাক তুমি অনবরত শুনতে পাবে। তবে এও বলি, ঢাকা শহরের কোথাও কোথাও কিছু গাছপালা আছে। তাই কোকিলের ডাক শুনতে পাচ্ছ। তোমাদের এই মিরপুর এলাকা যেমন, এখানে বহুতল ভবনের মাঝে মাঝে এখনো গাছপালা আছে। তাই কোকিল গাছে গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্যার, কাকের বাসাও কিন্তু আমাদের বন্ধুরা দেখতে পায়– আমিও

www.icsbook.info

দেখেছি।

খুব সহজ কথা আসিফ। কাক বাসা বাঁধে। কাকের বাসার কোন ছাদ-ছিরি নেই। তবুও তো বাসা, কোকিল তো বাসাই বাঁধে না।

বাসা বাঁধে না?

কোকিল খুব অলস প্রকৃতির। বাসা বাঁধার ঝক্কি পোহাতে চায় না।

ওমা, তাহলে কোকিল ডিম পাড়ে কোথায়? বাচ্চা ফোটে কী করে?

বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করেছ। কোকিল কাকের বাসা খুঁজে খুঁজে বের করে সেখানে ডিম পাড়ে।

ওমা, তাই?

হ্যাঁ, তাই।

কাক ওর বাসায় ডিম পাড়তে দেয়?

মোটেই না, কাকের নজর এড়িয়ে কোকিল গিয়ে ডিম পেড়ে আসে। আমি আগেই বলেছি, কোকিল কাকের চেয়ে বুদ্ধিমান। মা কোকিল ডিম পাড়ার সময় হলেই বাবা কোকিলকে বলে, এবার তোমার কাজ শুরু করো।

কাজ? কী কাজ স্যার?

কাজ হল কোকিল কাকের বাসার সামনে গাছের ডালে বসে কুহু কুহু করে ডাকতে থাকে। কাক এ ডাক শুনলে ক্ষেপে যায়। বাসা থেকে বেরিয়ে এসে কোকিলকে তাড়া করে। কোকিল এ ডালে ও ডালে নেচে নেচে বেড়ায় আর কুহু কুহু ডেকে বলে, ধরতে পারবি না তো! কাকেরও জেদ চেপে যায়। কোকিলকে তাড়া করতে থাকে, কোকিল কাককে বিভ্রান্ত করে অনেক দূরে উড়ে যায়। কাক ওকে তাড়া করতেই থাকে। এদিকে মা কোকিল কাকের দু-একটা ডিম ফেলে দিয়ে ডিম পাড়া শেষ হলে ওদের ভাষায় একটা সঙ্কেত পাঠায়। তার মানে হল, আমার কাজ শেষ, তোমার কুহু ডাক বন্ধ করো। মা কাক তখন বাসায় ফিরে ডিমের ওপর বসে তা দেয়। বোকা কাক বুঝতে পারে না এখানে কোকিলের ডিম আছে।

কোকিল আর কাকের বাসার ধারে কাছেও আসে না। কাকের বাচ্চা ফুটবার ১২-১৩ দিন এমনকি ১৮-১৯ দিন আগে কোকিলের বাচ্চা ফোটে। নরম তুলতুলে পালকবিহীন বাচ্চাকে নিজের বাচ্চা মনে করে কাক আদর যত্ন করে, খাবার এনে খাওয়ায়, কোকিল জন্মের পর থেকেই স্বার্থপর, কাকের ডিম থেকে ছানা বের হলে কোকিলের ছানা গা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিচে ফেলে দেয়। কেন, জানো? কাকের পুরো আদর পাবার জন্য। কাকের

www.icsbook.info

আনা খাবার পুরোটা খাওয়ার জন্য।

আসিফ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, পাখির জগতেও এত হিংসা, স্বার্থপরতা! তা মা কোকিল ডিমে তা দেয় না কেন? নিজের বাচ্চাকে খাবার দেয় না কেন?

উজ্জ্বল চোখে মোহিত বলেন, খুব বুদ্ধিমানের মত একটা প্রশ্ন করেছ। মা কোকিলের মাতৃত্ব বলে কিছু নেই। সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সন্তানকে লালন পালন করা ওদের ধৈর্যে নেই। আমরা বলি মার সাথে সন্তানের নাড়ির টান। ওদের সেটা নেই। ওরা কষ্ট করে বাসা বাঁধে না– কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। কিন্তু ডিমের ওপর বসে থেকে শরীরের উষ্ণতা দিয়ে ডিম থেকে ছানা বের করার ইচ্ছা বা ধৈর্য কোকিলের নেই। আসলে সব প্রাণীর মস্তিষ্কে একটা পদার্থ থাকে– তা থেকে হরমোন বের হয়। কোকিলের মস্তিষ্কে তা নেই। তাই ওদের মধ্যে অর্থাৎ মা কোকিলের মধ্যে মাতৃত্ব জাগে না। কোকিলের বাচ্চার ডানা একটু শক্তি হলেই বাসা ছেড়ে উড়াল দিয়ে সামনের ডালে বসে। সহজাত প্রবৃত্তির বশে পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে। নিজেদের খাবার নিজেরাই খুঁজে নেয়। গাছের নরম পাতার নির্যাস দিয়ে তেষ্টা মেটায়। ছোট ছোট পোকা-মাকড় খেয়ে পেট ভরায়। কোকিলের প্রিয় খাবার হলো শুঁয়ো পোকা।

একথা শুনে শিউরে ওঠে আসিফ।

কোকিলের ডাক খুব মিষ্টি। কিন্তু মা কোকিলের নয়, বাবা অর্থাৎ পুরুষ কোকিল মিষ্টি স্বরে ডাকে। স্ত্রী কোকিল একটু ভিন্ন স্বরে ডাকে, শুনতে ভালো লাগে না। পাখির জগতে আরো একটি পাখি আছে, যে পাখি পেখম তুলে নাচে!

স্যার, ময়ূর।

হ্যাঁ আমরা বলি, ময়ূর পেখম তুলে নাচে। এ নিয়ে অনেক কবিতা ও গানও আছে। যেমন, নাচ ময়ূরী নাচরে– অথবা কবি বলেন, মন আমার আজ ময়ূরের মত নাচে। আসলে ময়ূরী নাচে না, নাচে ময়ূর।

সে যাক- আমরা কোকিলের কথায় ফিরে আসি। পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় ১৩০ প্রজাতির কোকিল আছে। বাংলাদেশে আছে ২০ প্রজাতির কোকিল। এর মধ্যে ১৪টি স্থায়ী এবং ৬টি অস্থায়ী। এই ৬টি বিভিন্ন দেশ থেকে উড়ে আসে। মনে করে নাও, সময় বুঝে বেড়াতে আসে। বেড়ানো শেষ হলে চলে যায়। যেমন আমরা দেশের মধ্যে অথবা দেশের বাইরে বেড়াতে যাই।

www.icsbook.info

আমি ছুটিতে মামার বাড়ি যাই। আসিফ চোখে আলো ফুটিয়ে বলে। আরো একটা কথা বলছি, কোকিলের রং কালো কুচকুচে। তবে স্ত্রী কোকিলের চেয়ে পুরুষ কোকিল দেখতে সুন্দর। মিশমিশে কালো কোকিল আছে বাংলাদেশ, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ায়। অন্যান্য দেশের কোকিলের রং খুব কালো নয়– খানিকটা ধূসর রঙের। তবে সব কোকিলের স্বভাব প্রায় একই রকম।

স্যার চিড়িয়াখানায় কোকিল নেই।

মোহিত হেসে বলেন, আমি দেখিনি। তবে তোমার এ প্রস্তাব আমি চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষকে জানাব।

মা কোকিল একেবারে হৃদয়হীন, স্যার?

না আসিফ, একেবারে হৃদয়হীন নয়। আমি শুনেছি, ওরা কাককে খুব ভয় পায়। কোকিল দেখলেই কাক তেড়ে আসে। মা কোকিল ভয়ে বাচ্চার কাছে যায় না। তবে কখনো কখনো সতর্কতার সাথে বাচ্চাকে খাবার খাইয়ে আসে। তা মা কোকিল কি বাবা কোকিল তা বলতে পারি না। ঐ যে তোমাকে বললাম, সব প্রাণীর মস্তিষ্কে প্রোল্যাকটিন বলে একটা পদার্থ থাকে। তা থেকে হরমোন ক্ষরিত হয়। আরো বড় হলে তুমি এসব জানতে পারবে। আমি কিছু কিছু মেয়ের মধ্যেও লক্ষ্য করেছি, ওদের মধ্যে মাতৃত্ব থাকে না। যেমন আমি আমার এক আত্মীয়ার কথা জানি, যে নাকি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, তার বিয়ে হয়েছে, সে মা হয়েছে কিন্তু ছেলেকে সে আদর করে না, কোলে নেয় না, তার পাশে শোয় না এমনকি বুকের দুধ খাওয়াতেও চায় না। বাচ্চাকে কোলে দিলে সেই মা তাড়াতাড়ি বাচ্চা রেখে অন্য জায়গায় চলে যায়। এটা সব বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীর বেলায় প্রযোজ্য কি না আমি জানি না। কারণ আমি তো এ নিয়ে গবেষণা করিনি। তুমি বড় হয়ে কী হবে?

বলতে পারি না,

কেন, তোমার কোনো ইচ্ছা নেই? স্বপ্ন নেই?

ইচ্ছা থাকলেই তো হয় না স্যার। যে বিষয়ে আমি পড়তে চাই, সেখানে পড়ার চান্স পেতে হবে তো?

ভালো করে পড়াশোনা করো, লক্ষ্য স্থির করো, তাহলেই মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। তবে ভরসা রাখতে আল্লাহ তায়ালার ওপর।

স্যার এখন তাহলে আমার পড়া শেষ।

www.icsbook.info

বাহ! আমি তো আজকে কিছু পড়ালামই না। শুধু গল্প করলাম।

স্যার গল্পের মধ্য দিয়ে আপনি আমাকে কোকিল সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা দিলেন।

এখন তোমার কাজ হবে সব গুছিয়ে লেখা, লিখে আমাকে একটু দেখিয়ে নিও। এখনো হাতে তিন দিন সময় আছে লেখা জমা দেয়ার।

স্যার, মনে হয় আমি পারব। আমার লেখা সবার চেয়ে ভালো হলে আমি বলধা গার্ডেন দেখার সুযোগ পাব।

তা হলে আরো একটা লেখার বিষয় পাবে তুমি– বলধা গার্ডেন। তাই না?

আসিফ মাথা নাড়ে। তারপর বই-পত্তর গুছিয়ে বলে, স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

তোমাকেও ধন্যবাদ আসিফ। তোমার খুব ধৈর্য আছে। এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলে। সব কিছু জানার জন্য ধৈর্য থাকা চাই। মোহিত বেরিয়ে গেলেন। বিদায়ী সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে তার পিঠে। আসিফ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। ভাবলো, স্যার কত কষ্ট করে পড়াশোনা করেন। হেঁটে হেঁটে অনেক দূর গিয়ে বাসে উঠবেন। নিউমার্কেট নামবেন। তার পর হেঁটে যাবেন হল পর্যন্ত।

আসিফের মা এসে তাড়া দিয়ে বলেন, তোমার স্যারের কথা অনেক শুনলাম, এখন হাত-মুখ ধুয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে একটু পড়তে বসো।

আসিফ মার গলা জড়িয়ে ধরে আহলাদি গলায় বললো– স্যার গল্পচ্ছলে পড়িয়েছেন– আমার পড়া শেষ। এখন কোকিলকে আমি দাঁড় করাবো, পড়ে দেখব ঠিকঠাক হয়েছে কি না। আবার লিখব, ফ্রেস করব। ব্যাস– আমার কোকিল কুহু কুহু করে ডেকে উঠবে।

মা আসিফের কপালে চুমু খেয়ে বলেন, পাগল ছেলে!

www.icsbook.info

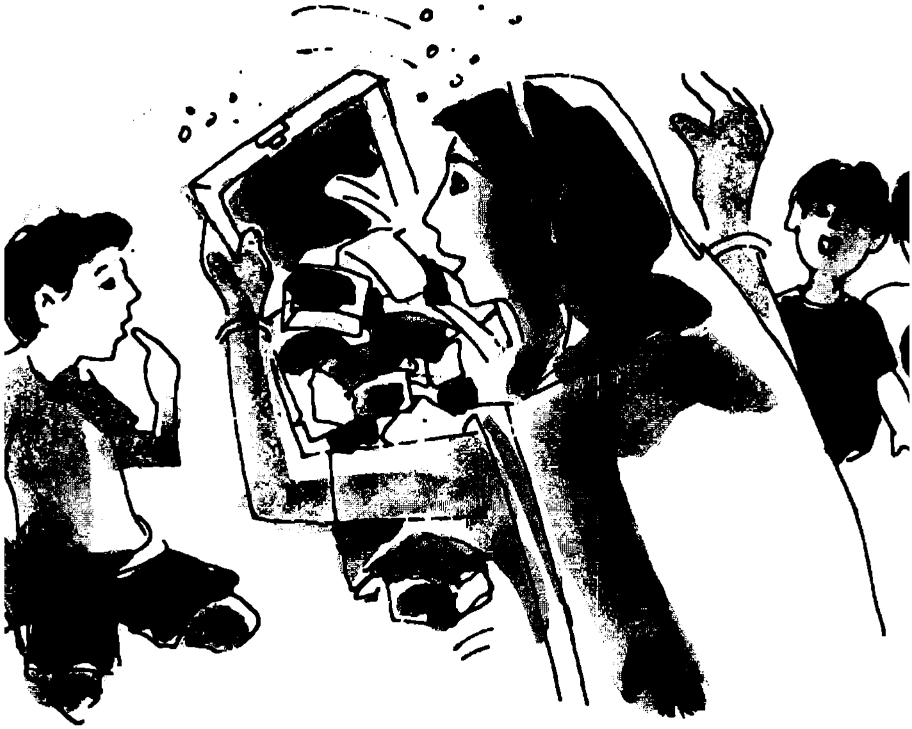

অপুর অভিমান

জাফর তালুকদার

মায়ের কাণ্ড দেখে লজ্জায় লাল হয়ে গেল অপু। সাপ খেলা দেখার মতো গোল হয়ে সবাই ঘিরে আছে মার চারপাশ। মা টিনের ভাঙা স্যুটকেশটা খাটের তলা থেকে টেনে এনে উপুড় করে ধরলেন মেঝেতে। মুহূর্তে দুর্গন্ধে চুর হয়ে গেল জায়গাটা। সবাই দাঁত বের করে হাসছে। কেউ আবার মজার চোখ করে ফিরে তাকাল অপুর দিকে। লজ্জায় কান কাটা গেল বুঝি। সবার সামনে থেকে দ্রুত পালাতে পারলে বেঁচে যায় সে।

আসলে অতো কিছু ভেবে কাজটা করেনি অপু। এবার মেলায় মা তাকে যে বিশটা টাকা দিয়েছিলেন তা দিয়ে কিনে আনল কয়েকটা বনরুটি। একটা হাতকাটা ছেলে ডেকে ডেকে বিক্রি করছিল রুটিগুলো। কিন্তু কেউ পাত্তা

www.icsbook.info

দিচ্ছে না দেখে তার কেমন মায়া হয়। অবশ্য দোকানের চিন্তাটা মাথায় আসে রুটি কিনে বাড়ি ফেরার পর।

খাটের তলায় একটা ভাঙা স্যুটকেশ পড়ে ছিল দীর্ঘদিন। সেটা ঝেড়েমুছে রুটিগুলো সাজিয়ে রাখল তাতে। তারপর ডালার মুখ বন্ধ করে সেই যে লুকিয়ে রাখল আর খোলার নাম নেই। এতদিন পর পচা গন্ধটা খুঁজতে গিয়ে মা এটা বের করেছেন খাটের তলা থেকে। ভেতরে ফেঁপে-ওঠা রুটিগুলো পচে সবুজ রঙ ধরে গেছে।

মা চোখ পাকিয়ে ডাকলেন, 'অপু।'

'জী, মা।'

'তুমি এভাবে রুটি রেখেছ কেন?'

'দোকান দেয়ার জন্য।'

'দোকান, তুমি রুটির দোকানদার হবে!' মায়ের ঠোঁট বিদ্রূপে বেঁকে গেল।

'হ্যাঁ, হব।' অপু যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'যাবে না, দাঁড়াও!' বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল দরজার আড়াল থেকে।

অপুর মুখ চুন হয়ে গেল।

বাবা মেজাজি মানুষ। তিনি হঠাৎ এসে পড়েছেন দেখে সবাই চলে গেল সুড় সুড় করে। মা স্যুটকেশটা এককোণে সরিয়ে রাখলেন বিরস মুখে। বাবার সামনে থেকে রুটিগুলো আড়াল করাই তার উদ্দেশ্য।

'এই শোনো, ওগুলো নিয়ে এক্ষুনি ওকে হাটে পাঠিয়ে দাও দোকনদারি করতে।' বাবার গলায় মিলিটারি নির্দেশ।

মা অপুর হাত ধরে পথ আগলে দাঁড়ালেন, 'ছেলেমানুষ, না বুঝে একটা কাজ করেছে। এ নিয়ে অতো রাগারাগির কী আছে?'

'সে তুমি বুঝবে না। ও খুব বাউণ্ডেলে হয়েছে আজকাল...।'

'আচ্ছা, বেশ হয়েছে। এখন তুমি যাও তো। চা দিয়েছি। মতি চাচু বসে আছেন।'

বাবা গজ্ গজ্ করে চলে যেতেই অপু হাওয়া হয়ে গেল। মা পেছন থেকে কি যেন বললেন কানে গেল না অপুর।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। তবে বাগানটা শীতল। এই দিনদুপুরেও কেমন নির্জন আর ছায়া ছায়া। কাঁচামিঠে আমগাছটার নিচে এসে একটু বসল।

www.icsbook.info

এবার অজস্র আম ধরেছে গাছটায়। প্রতিবার এই আম নিয়ে পাখিদের মধ্যে মাতামাতি পড়ে যায়। চমৎকার চোখকাড়া রঙ দেখে উড়ে আসে রাজ্যের পাখি। পাকার আগেই ঠুকরে ঠুকরে সব নষ্ট করে দেয় ওরা। তার মতো বোকা-পাখিগুলোরও তর সয় না কিছুতেই।

অপুর বুক চিরে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস বেরুল। বহুক্ষণ হলো পেট চোঁ চোঁ শুরু করেছে। হাতের কাছে কিছু নেই যে মুখে পুরবে। এই বাগানটা নানারকম গাছগাছালিতে ঠাসা। বুনো লতাপাতার ঝোপও এন্তার। সে খুঁজে পেয়ে কিছু পাকা ডুমুর, বেতফল আর আমলকী খেয়েছে বটে, কিন্তু খিদেটা ক্ষান্ত হয়নি তাতে। যতই কষ্ট হোক, সে কিছুতেই ঘরে ফিরে যাবে না। সে তো বাউণ্ডেলে...।

বাগানটা ভারি নিঝুম। একটা তক্ষক পাখি ডাকছিল ধরা গলায়।

রাতের বেলা কি একটা পাখি ডাকে কুপ্‌কুপ্‌ করে। এখন সেটা ঘুমিয়ে গেছে বোধ হয়। ও পাশে রাজকড়াই গাছের ডালে দুটো ঘুঘু মনের আনন্দে ডাকাডাকি করল কিছু সময়, তারপর কি যেন কথাটথা বলে ফুড়ুত ফুড়ুত উড়ল এ ডাল থেকে ও ডালে, হঠাৎ কি মনে হল পিছুটান দিয়ে সোজা উড়ে গেল বিলের দিকটায়।

বাগানের এপাশে, যেখানে ঝোপঝাড় একটু গাঢ়, লতাপাতার আড়ালটিও বেশ, সেখানে ছোট্ট মতো একটা খন্দ যে লুকিয়ে আছে তা আগে দেখেনি কখনও। একটু নিচু হয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল অপু, তারপর কিছু না ভেবেই সেই ঘেরাটোপের নরম ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল টান টান হয়ে।

ক্ষুধা, ক্লান্তি আর বিপুল অভিমানে একটু পরই গভীর ঘুমে হারিয়ে গেল অপু। মৃদু বাতাসে চিরল পাতারা আলতো প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে তার গায়ে।

ঘুমের রাজ্যে ডুব দিয়ে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখল অপু। সেই ছেলেবেলার মতো বাবা তাকে কাঁধে বসিয়ে নিয়ে গেছেন রূপসাগরের মেলায়। লালসালু আর সামিয়ানাঘেরা দোকানপাট, লোকজনের আনাগোনা, বানর আর পুতুলনাচের ডুগডুগি, গান, বায়োস্কোপ, মিঠে মাঠাইয়ের গন্ধ, পানের সুরভি, নাগরদোলার ক্যাঁচরম্যাঁচর, বাঁশির প্যাঁপোঁ– সবমিলিয়ে অফুরান আনন্দে জমে গেল মেলার জায়গাটা।

মেলা ঘুরে ঘুরে ঝুমঝুমি, বেলুন, বাঁশি, তালপাখা, নকশি রুমাল, মাটির ঘোড়া, কাগজের ফুল কত কি কিনে দিলেন বাবা। মুড়ি-মুড়কি, জিলাপি,

www.icsbook.info

বাতাসা, তিলের খাজা, বাদাম, কুলফি কিছুই বাদ গেল না। সবশেষে, নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে কুলকুলিয়ে হেসে উঠলেন বাবা– কিরে অমন শক্ত হয়ে আছিস কেন, ভয় পেয়েছিস নাকি?'

'হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছি। পরে যাবো নাতো বাবা?'

'আরে না, পড়বি কেন, আমি পাশে আছি না... ।'

কথাটা শেষ হয়নি তখনও, হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে নাগরদোলার বাক্সটা ঝপাত করে ছিটকে পড়ল মাটিতে। অপু হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ছোট্ট খন্দটার ভেতর। হালকা অন্ধকারে চোখ কচলে তাকাল এদিক ওদিক। পরম বিস্ময় আর উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপছে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাবা হাউমাউ কেঁদে জড়িয়ে ধরলেন তাকে, 'ওরে তুই এখানে লুকিয়ে আছিস, আর আমরা চারদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। কী পাগল ছেলে তুই বলতো!'

অপু কথা বলল না।

বিশাল অভিমানে বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল কেবল।

www.icsbook.info

খালা-দ্যা গ্রেট

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

কাশিটা শুরু হয়েছে একটু আগেই, এবার শুরু হলো হাঁচি।

বলি হচ্ছেটা কী? বর্ষা এখনও আসেনি, বৃষ্টিতে কেউ ভিজেনি– বৈশাখের সকাল বেলাতে। চারপাশে শুকনো খটখটে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। সর্দি কাশি কার হলো? ভারী উৎপাত তো!

রজতকান্তি রাগী আর গম্ভীর গলায় বলেন, এ্যাই– কী ব্যাপার! ভর সকালে হাঁচিকাশি শুরু–

হলো যে– কথাটি আর শেষ করতে পারেননি উনি। প্রথমে কাশলেন, কাশতে কাশতে চোখ দু'টি জবা ফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে। এরপর শুরু হয় হাঁচি এবং অবিরত হাঁচি।

নাতনি টুসকি বলে, দ্যাখো দাদু, কেমন লাগে!

www.icsbook.info

টুলটুল অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকায়।

কী– হচ্ছেটা কী?

কিচেন থেকে ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে। দারুণ লাগছে ওর। কাশতে কাশতে হাঁচি দিতে দিতে চোখে-নাকে পানি এসে গেছে সবার। খুশি হতে গিয়েও মুখ ভার করে ও।

ক্লাসের পড়া শেখা এখনও হয়নি। প্রথমে বেশ লাগলেও এখন ভাবনা হচ্ছে টুলটুলের। রাশেদ স্যারের হাতে লিকলিকে বেত থাকে। কথাটি মনে পড়ায় সারা শরীর ঘামতে থাকে ওর। পড়ার টেবিলে সে ছুটে আসে।

বলি হচ্ছেটা কী খালা? রাঁধছ না ম্যাজিক দেখাচ্ছ। কিচেন থেকে বের হয়ে ডাইনিং স্টেজে এসে দাঁড়ায় সুন্দরী। ঘেমে নেয়ে একাকার। নিজেও খুক খুক করে কাশছে। কাশতে কাশতেই খিল খিল করে হাসে।

– আমার টুলটুল বাবা কয় কি গো? আমি নাকি ম্যাজিক দেখাইতাছি। ম্যাজিক দেখাই না গো বাবা সোনা, ডাইল সম্ভার দিতাছি।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে সুন্দরী। তেজপাতা, শুকনো মরিচ আর পাঁচফোড়নের ঝাঁঝে দাদু, রজতকান্তি, মা-বাবা, টুলটুল আর টুসকির কাশি আর থামে না।

রজতকান্তি চোখ পাকিয়ে বলেন, এই– হচ্ছেটা কী? বলি হচ্ছেটা কী?

পাশের ফ্ল্যাটের আলমগীরও এসে দাঁড়ান।

– মোন হে রজত, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

হাঁচি দিতে দিতে রজত বলেন, মানেটা কি আলমগীর? আলমগীর বলেন, তোমার কিচেনই যত নষ্টের গোড়া।

সুন্দরী সামনে এসে দাঁড়ায়। ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সবাই।

রজত একদিন বলেছেন, দ্যাখো সুন্দরী, সব সময় কোমরে আঁচল গুঁজে কাজ করবে। আগুন লাগলে পুড়ে টুড়ে মরবে বাপু। আমরা পড়ব ফ্যাসাদে।

– এ কি কথা কইলেন বড়বাবু? ফ্যাসাদে পড়বেন ক্যান? দাদুর সোজা কথা– তোমার বাড়ির লোকজন এসে আমাকে ধরবে না?

সেই থেকে সুন্দরী এক ফালি আঁচল কোমরে গুঁজে রান্নাবান্না করে। মাথায় পুরনো কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা থাকে। দাদু বলেছেন, ভাত তরকারিতে যেন কক্ষনো চুল না পাই। ভাত রাঁধবে আর মাথা চুলকাবে– সেটি হবে না বাপু।

www.icsbook.info

মুখ ঘুরিয়ে সুন্দরী সেদিন বলেছে, বড়বাবুর ফ্যান কথা। কী শরমের কথাই না কয় বড়বাবু।

দাদু বলেছেন, শরমের কথা নয়, সত্য কথা। বড় বড় হোটেলে রেস্টুরেন্টে ছেলেরা সব মাথায় ক্যাপ পরে রাঁধে বাড়ে, যাতে খাবার দাবারে চুল না পড়ে।

কোমরে আঁচল গোঁজা, মাথায় ফেট্টি বাঁধা সুন্দরী দাঁড়িয়ে।

–এ্যাই, রান্নাঘরে করছিসটা কী? জবাব দে, কথা বলছিস না কেন? কাঁচুমাচু হয়ে সুন্দরী বলে, আমি তো কিছু করি নাই বড়বাবু, খালি ডাইল সম্ভার দিছি।

আলমগীর চোখ লাল করে বলেন, এটার নাম ডাল বাগার? রাজ্যের তেজপাতা-পাঁচফোড়ন দিয়ে কী ভরেছিস? দ্যাখ, কাশতে কাশতে দম আমার আটকে যাবার জোগাড়। বুঝলে রজত, তোমার ফ্ল্যাটে ডাল রাঁধা হয়, আমার বাড়িতে চলে হাঁচি আর কাশি। ঐ শোনো–শুনছো তো টুলটুল? নীলু পিলু সবাই কাশছে।

টুসকির দারুণ মজা। ঘর ভর্তি ধোঁয়া, চারপাশে হাঁচি–কাশি চলছে–এর মাঝে কি পড়াশোনা করা যায়? তার মানে ওর এখন ছুটি। বই-খাতা-পেন্সিল-রাবার সব গুছিয়ে রাখে টুসকি। আনন্দের আর সীমা নেই ওর। টুলটুল দারুণ চটেছে। ক্লাসের পড়া আর মুখস্থ হলো কই! বলে, ভাত দাও মা। খেয়ে স্কুলে তো যাই।

মিনু, বিরক্ত মুখে বলেন, এই সুন্দরী, টেবিলে ভাত দাও। বড় বাটিতে করে বেশি করে ডাল দিও, খেয়ে দেখুক সবাই কেমন হয়েছে। ভাবলেশহীন সুরে কিচেন থেকে জবাব আসে, ভাত হয় নাই, টনক রইছে।

মিনু বলেন, টনক রইছে তো আঁচ বাড়িয়ে দাও। রজতকান্তি বলেন, এই হলো আমাদের রান্নার লোক-বুঝলে আলমগীর? আলমগীর বলেন, সে তো বুঝলাম, কিন্তু টনক রইছে মানেটা কি?

–সিম্পল কথা, ভাত সেদ্ধ হয়নি শক্ত রয়েছে। দ্যাট মিনস, টনক রইছে।

হো হো করে হাসেন আলমগীর, –তাই বলো। ভাত-ডাল-তরকারি টেবিলে রাখে সুন্দরী মলিন মুখে। হাঁচি-কাশির জের তখনও কাটেনি বাড়িতে।

সুন্দরী মন খারাপ করা সুরে বিড় বিড় করে।

www.icsbook.info

– এতদিন হইল এই বাসার কাজে জয়েন্ট করছি, কেউ কিছু লইয়া গাইল-মন্দ পাড়ে নাই, হা হা হি হি কইরা হাসেও নাই। ডাইল সম্ভার দিলে হাঁচি-কাশি তো অনবই। যত কাশি ততই মজা হইব ডাইল। হারাদিন তো কামই করি, রেশ তো লই না, লই কও, টুসকি বলে, খালা কথা বলো ক্ষতি নাই কিন্তু ঠিকঠাক করে বলবে তো?

– বেঠিক কি কইলাম কও দেহি।

খেতে খেতে টুলটুল বলে, এই যেমন তুমি কাজে জয়েন্ট করেছ, তুমি জয়েন বললে কেন? আরও বলেছ–সারাদিন কাজ করো রেস্ট নাও না–

গালে হাত দিয়ে সুন্দরী বলে, হাচা কথাই তো কইলাম টুলটুল বাবা। টুসকি বলে, তুমি রেস্ট বলোনি খালা, তুমি বলছ রেশ। ভেরি ব্যাড খালা ভেরি ব্যাড।

রজতকান্তি খুক খুক করে হাসতে থাকেন। কোন রকম সামলে বলেন, –কিপ কোয়াইট।

টুলটুল বলে, আর একটু ডাল আর মাছের ঝোল দাও তো খালা। পাকঘরে ডাইল-তরকারি আছেনি চেক কইরা আহি। ফিরিজে তুলতে হইবো না! কিচেনে বাসন মাজার ঝকঝক আওয়াজ হতে থাকে। এই হলো সুন্দরী, গোটা বাড়ির কাজকর্ম দু'হাত দিয়ে ম্যাজিকের মতো সারে।

ছ'সাত দিন কেটে গেছে।

পাশের ফ্ল্যাটের আলমগীর সাহেবের বউমা নিগার গ্রিলের ফাঁকে মুখ রেখে মিনুকে ডাকে।

– ও বৌদি, বৌদি।

টুলটুলের মা মিনু জানালার কাছে আসেন।

– আরে ভাবী, কী খবর?

–আমি তো ভালই আছি বৌদি। তোমাদের বাড়ি এত চুপচাপ কেন? রান্নাবান্না হচ্ছে না? কদিন থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। চাইনিজ খেয়ে বেড়াচ্ছ নাকি?

মলিন মুখে মিনু বলেন, সুন্দরী দেশে গেছে যে।

– হঠাৎ, কী ব্যাপার?

টুলটুলের মা বলেন, ওদের আবার ব্যাপার! বাড়ির জন্য মন কেমন করেছে তাই ঘুরতে গেছে। কবে ফেরে কে জানে!

নিগার বলে, তাই বলো বৌদি, আমিও তো ভাবছি টুসকিদের বাসায়

www.icsbook.info

হলোটা কি? ডাল-টাল রাঁধা হয় না আজকাল? ঐ যে তোমার সুন্দরী স্পেশাল ডাল রাঁধত, হেঁচে-কেশে আমরা সারা হতাম।

হাসতে হাসতে নিগার বলে, সবাই মিলে ওকে কী বকাবকিই না করেছি।

মিনু মন খারাপ করে বলে, ডাল আর কখন রাঁধব? সকাল হলেই তো টুলটুল-টুসকির স্কুল, ওদের বাবার অফিস যাওয়া, এরপর আমার অফিসের সময় হয়ে যায়। সংসার চলছে কোন রকমে। খিচুড়ি আর ভাতে-ভাত খাচ্ছি।

দু'ভাই বোন স্কুল থেকে ফিরে নিজেরা ভাত বাড়ে।

রজতকান্তি বলে, নিজের কাজ নিজে করতে শেখো।

প্লেট নিয়ে ডেকচির ঢাকনা তুলে টুলটুল চেঁচিয়ে ওঠে।

– আবার খিচুড়ি?

টুসকি বালিশে মুখ গুঁজে বলে, রাত্তিরে ডাল ভাজি চিকেন রাঁধবে মা। নো খিচুড়ি নো ভাতে-ভাত।

মিনুও সারা দিনের অফিস শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে। এক পেয়ালা চা তৈরি করার আর শক্তি থাকে না। ছেলেমেয়ের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, খাও সোনারা, কে রাঁধে বল। সারাদিন অফিস করে তারপর কি আর রাঁধা যায়? কবে যে সুন্দরী ফিরবে।

শুক্রবার, ছুটির দিন। সবাই বাড়িতে। লুচি তরকারি তৈরি করতে করতে হিমশিম খাচ্ছে মিনু।

ঠিক এমনই সময় ধপ করে পুঁটুলি রাখার আওয়াজ হয়। সেই পরিচিত মিষ্টি গলা।

– আইয়া পড়ছে গো তোমাগো রান্ধনের মানুষ।

টুলটুল চেঁচিয়ে বলে, মা, ওমা– রান্নামাসী এসে গেছে। টুসকি ছুটে এসে বলতে থাকে, রান্না চড়াও তো সুন্দরী মাসী। মাছের ঝোল, চিকেন কারি ভালো করে রাঁধো। অনেক দিন খাইনি। তোমার স্পেশাল ডাল রাঁধবে কিন্তু সুন্দরী মাসী।

সুন্দরী ভেজা ভেজা গলায় টুসকিকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

– ও আমার সোনা রে, আমার ময়না রে–

টুলটুল কিচেনে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, ও মাসী তুমি ডাল রাঁধবে না? ও বাড়ির নিগার আন্টি, আলমগীর দাদু, মা-বাবা দাদু আমরা সবাই কাশতে কাশতে একেবারে মরে যাবো।

www.icsbook.info

টুলটুলকে কোলে নিয়ে সুন্দরী বলে, বালাই ষাট, বালাই ষাট।

আজ আবার ড্রয়িংরুমে দাবা খেলতে বসেছেন রজতকান্তি আর আলমগীর। মিনু খুশি মনে টিভির সামনে রিমোট নিয়ে বসেছেন। বাবা নিশ্চিন্ত মনে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছেন।

টুলটুল-টুসকি চেঁচিয়ে বলে, ও সুন্দরী মাসী, ভাত দাও টুলটুলের ঘামে ভেজা মুখ শাড়ি আঁচল দিয়ে মুছে দেয় সুন্দরী, আদুরে গলায় বলে, ভাত হয় নাই সোনা, টনক রইছে টুসকি বলে, ও মাসী আমি টনক টনক ভাত খাবো, ততা ততা ভাত খাবো।

আজ দাদু কিংবা মিনু রাগ করে কেউ বলে না, কী বাজে কথা ওদের শিখিয়েছ সুন্দরী।

আজ সুন্দরী বলে, ও টুলটুল-টুসকি, অমন কথা কইতে হয় না, ঠিক কইরা কথা কও। টনক টনক, ততা ততা ভাত এইগুলান গাঁও গেরামে বলে।

-বলব, একশ বার বলব। আমাকে ডাল আর ভাজি দিয়ে ততা ততা ভাত দাও।

আজ আবার ডাল সম্ভার দিয়েছে সুন্দরী। ছ্যাৎ করে আওয়াজ উঠেছে। ঝাঁঝালো গন্ধে কাশির সাথে মাঝে মাঝে হাঁচিও আসছে।

আলমগীর কাশতে কাশতে হাসতে থাকেন।

– এই তো রজত, তোমার বাড়ি এখন রিদমে চলছে। কাজে বেশ ছন্দ এসেছে।

টুসকির বাবা বলেন, এ কদিন খিচুড়ি আর আলু ভাতে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে।

প্রাণ খুলে হাসে সবাই।

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আলনা ঘেঁটে চকরা বকরা ছাপ দেয়া গেঞ্জি এনে টুলটুলকে পরিয়ে দেয় সুন্দরী।

– পাতলা জামা গায়ে দিয়া পড়তে বইছ ক্যান সোনা! এই পিরান পায়ে দ্যাও।

বাড়িটি ঠিক আগের মতো মায়া মমতা আর খুশিতে ভরে আছে।

রাত ন'টা। ভাত খেতে বসেছে সবাই। টেবিলের ওপর বাটিতে বাটিতে তরকারি। ধোঁয়া ওঠে মনকাড়া গন্ধ ছড়াচ্ছে। টুলটুল খুশিতে আটখানা হয়ে বলে, রান্নামাসী, হিপ হিপ হুররে। দাদু বলেন, এটা কি রেঁধেছিস রে

www.icsbook.info

সুন্দরী।

– টম্যাটো দিয়া চুহা রানছি বড়বাবু।

হাসির হুল্লোড় ওঠে বেশ ক'দিন পর। সুন্দরী বোকার মতো হেসে বলে, খাট্টা রানছি। বাবা বলেন, চুহা নয়, খাট্টাও নয়, বল চাটনি। সুন্দরী বলে, এই হইলো, ঘাড়ের নামই গর্দনা, লেম্বুরে কয় জমির, তেঁতুলের কয় আবুলি, চিরুনির কয় কাঁকই।

কোমরে আঁচল গোঁজা, মাথায় চওড়া লাল কাপড়ের ফেট্টি, এক খুন্তি হাতে সুন্দরীকে দারুণ লাগছে। সবাই অবাক হয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে দেখছে ওকে, মুখে কোনো কথা নেই। শুধু টুলটুল আর টুসকি দু'ভাই-বোন চেঁচিয়ে ওঠে।

–হিপ হিপ হুররে, সুন্দরী খালা দ্যা গ্রেট।

www.icsbook.info

আরিজের ঈদ

মাহবুবুল হক

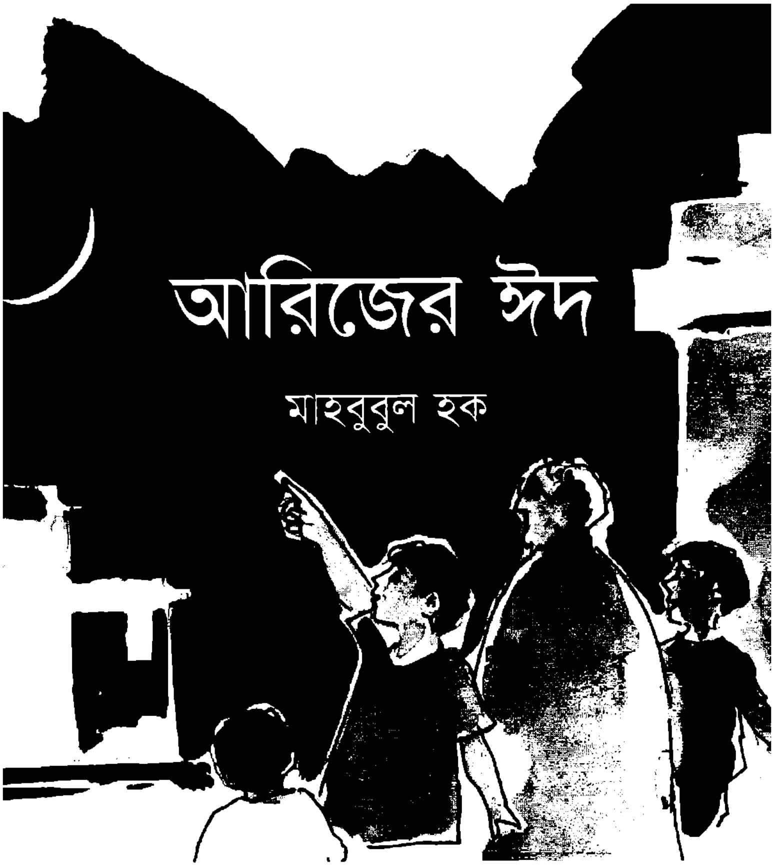

আরিজের বয়স কতো হবে? বড়জোর সাত। এর মধ্যে সে তিন ক্লাস পড়ে ফেলেছে। প্লে গ্রুপ ও নার্সারি শেষ করে এখন সে কেজি ওয়ানে পড়ছে। ওর দাদার সাথে এ নিয়ে তার প্রায় ঝগড়া হয়। ওর দাদা বলেন, ক্লাস ওয়ানে উঠতে উঠতে তুমিতো বুড়া হয়ে যাবে। আর আমিতো কবরে চলে যাবো। আরিজ বলে, তুমিতো গ্রামের পচা স্কুলে পড়েছো আর আমি পড়ছি ঝকঝকে তকতকে সুন্দর স্কুলে। আমরা খেলতে খেলতে পড়ি আর তোমরা মার খেতে খেতে পড়েছো। আমরা তো একদম মার খাই না। শুধু আদর, আদর আর আদর। মিসরা আমাদের কতো আদর করেন। আমরা প্রতিদিন নতুন টিফিন খাই। আর তোমরা ভাত খেয়ে স্কুলে গিয়েছো আবার স্কুল থেকে এসে ভাত খেয়েছো, এ জন্যই তো তোমার পেট এতো মোটা। দাদা চোখ মুছেন।

– তুমি কাঁদছ দাদা!কেন কাঁদছ? ছেলেবেলার কথা বললেই তুমি শুধু

www.icsbook.info

কাঁদ, না তোমার সাথে আর গল্প করা যাবে না।

– যাবে, যাবে দাদাভাই। তোমার বড় আব্বার কথা, অর্থাৎ আমার আব্বার কথা মনে পড়ে যায়। তোমার আব্বা যেমন ডাক্তার, আমার আব্বা ছিলেন স্বাস্থ্য কর্মচারী। অল্প বেতনের চাকুরে ছিলেন। আমরা ছিলাম ৮ ভাই ৩ বোন। সংসারে অভাব না থাকলেও টানাটানি ছিল। আমরা বড়রা কম খেয়ে ছোটদের খাওয়াতাম। ছোটরা বুঝতো না। সকাল ৯টায় ডিম ভাত ঘি, ভাত আলু, ভাত বা ডাল ভাত খেয়ে স্কুলে যেতাম। স্কুল থেকে এসে বিকালে আবার ভাত খেতাম। মাঝে দুপুরে কিছু খেতাম না।

– তোমরা আমাদের মতো মাছ, গোশত খেতে না?

– খেতাম, তবে কিনে নয়। আব্বা অফিস থেকে এসে শীবসাগর, জুলুম সাগর– এসব নামের বড় বড় দিঘিতে ছিপ ফেলতেন। ছিপে মাছ উঠে আসতো। বড় বড় মাছ।

– ছিপ কী দাদা?

– মাছ ধরার ছোট্ট যন্ত্র বা ব্যবস্থা। এতে একটা সরু বা চিকন লাঠি থাকে, একে বলে ছিপ। ছিপের আগায় থাকে শক্ত সুতা। সুতার অগ্রভাগে থাকে বড়শি। এই বড়শিতেই থাকে মাছের জন্য শক্ত ও আঠালো খাবার। খাবারটা গিললেই মাছের গলায় বড়শি আটকে যায়। এভাবেই বড় বড় মাছ আসতো আমাদের বাসায়।

– দাদা, আমাকে ছিপ বা বড়শি দেখাবে?

– অবশ্যই দেখাবো, এইতো আমাদের লেকের পাড়ে গেলেই দেখতে পাবে কতজন ছিপ নিয়ে বসে আছে।

– আচ্ছা দাদা, ছোটকালে তোমাদের কি ফ্রিজ ছিলো?

– না তো দাদা ভাই, ফ্রিজতো কিনলাম আমার আমলে, আমার আব্বার আমলে আমাদের ফ্রিজ ছিলো না।

– তবে বড় বড় মাছগুলো কোথায় রাখতে, কিভাবে রাখতে?

– সে এক মহা কাহিনী।

– বলই না।

– আব্বা মাছ না নিয়ে কোনো দিন বাসায় ফিরতেন না। ছিপে না পেলে দিঘির মালিকরা জাল দিয়ে হলেও একটা রুই মাছ, কাতলা মাছ আব্বার হাতে তুলে দিতেন। ফিরতে ফিরতে কোনো কোনো দিন আব্বার দুপুর রাত হয়ে যেতো। ঐ রাতেই মাছটিকে আব্বা তিন ভাগ করতেন। এক ভাগ পাড়া

www.icsbook.info

প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলি বণ্টন করতেন। রাতে না পারলে সকালে। দুই ভাগের মধ্য থেকে বেশ কিছুটা দিতেন সহকারীদের, যারা আব্বার সাথে মাছ ধরতে যেতেন। আমরা বড়রা, যারা জেগে থাকতাম বা আব্বা এলে জেগে যেতাম, তাদের ভাগ্য ছিলো বড় ভালো। ঐ রাতেই আমরা আম্মার কল্যাণে একটুকরা মাছ ভাজি খেতাম। এটা ছিল আব্বার এক ধরনের শখ। অবশিষ্ট মাছ আম্মা ভাজি করে বা জাল দিয়ে রেখে দিতেন। আম্মা নানাভাবে সেসব মাছ রান্না করে আমাদের খাওয়াতেন।

– তা হলে তো তোমরা ভালোই ছিলে!

গল্প করতে করতেই ইফতারের সময় হয়ে এলো। আজ ২৯ শে রমজান। আরিজ আজ রোজা রেখেছে। ওর মা ও দাদী আরিজের জন্য স্পেশাল ইফতার বানাচ্ছেন। ওর বাবা ডাঃ বান্না নানা রকম ফল নিয়ে মাত্র ঘরে প্রবেশ করেছেন। এই মুহূর্তে ঘরটা যেন আনন্দে থৈ থৈ করছে। নানা রকম খাবারের সুবাসে ঘরটা মৌতাত হয়ে আছে। আরিজের দাদা বললেন, চলো দাদা ভাই টিভি খুলি। টিভিতে ইফতারের অনুষ্ঠান দেখি। 'নব' ঘোরাতে ঘোরাতে এনটিভিতেই থিতু হলেন দাদা। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জয়নুল আবেদিন আজাদই উপস্থাপনা করছেন।

সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন। সবসময় তিনি চমৎকার অনুষ্ঠান উপহার দেন। আজও দরাজ গলায় বলছেন, মহান আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তা নন, মালিক নন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক, তিনি ইলাহ। ইলাহ মানে কি জানো? ইলাহ এর অর্থ আল্লাহ একমাত্র হুকুমদাতা, একমাত্র আদেশদাতা, একমাত্র নিষেধদাতা, একমাত্র উপদেশদাতা, একমাত্র আইনদাতা, একমাত্র বিধানদাতা। দুনিয়া ও আখিরাতে আর কোনো আইন ও বিধানদাতা নেই। অথচ দেখো দুনিয়া, এমনকি আমাদের দেশেও আল্লাহর আইন ও বিধান চালু নেই। আমরা আল্লাহর কথা শুনছি না বা মানছি না আমাদের দেশ এবং আমাদের সমাজ যেসব আইনের দ্বারা চলছে, সেসব আইন ও বিধান আল্লাহর নয়, অন্য দেশের, অন্য জাতির, এমনকি অন্য ধর্মেরও ... । আরিজ মন দিয়ে শোনে। বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু সব কিছু ভালোভাবে বুঝতে পারে না।

হঠাৎ দাদা ভাই আরিজের গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলেন, এই দাদা ভাই, এবার তুমি ক'টা রোজা রেখেছো?

– দাদা ভাই, তুমি না সব ভুলে যাও, তোমাকে না ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খেতে হবে। আরে একবারই তো আমি প্রথম রোজা রেখেছি। এর আগের

www.icsbook.info

বছরতো রেখেছি দিনে ২টা। তখনতো আমি ছোট ছিলাম।

– দাদা হেসে বলেন, এবার বড় হয়েছো না। তা এবার ক'টা রোজা রেখেছো?

– শুরুতে দু'টা, মাঝে একটা আর শেষে রাখবো দু'টা। তার একটাতো আজ হয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল তো শেষ রোজা! কালকের রোজা তো আমি রাখবোই।

– ইনশাআল্লাহ বলো। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া রোজা রাখবে কী করে? কালতো ঈদও হতে পারে।

মনটা খারাপ হয়ে যায় আরিজের। কাল ঈদ হলে আর একটা রোজা রাখা হলো না। রোজা রেখে ইফতার করতে ওর খুব মজা লাগে।

– কী ব্যাপার চুপ করে গেলো সে।

– না, ঈদ হলে আমার যে রোজাটা রাখা হবে না।

– আরে পাগল, ঈদওতো আনন্দের, অনেক আনন্দের, অনেক মজার। ঈদে সবাই মিলে আনন্দ করলে আল্লাহ খুশি হন।

কথার মাঝেই মাগরিবের আজানের ধ্বনি শোনা যায়।

সবাই ঝটপট ডাইনিং টেবিলে বসে পড়ে। ছোট্ট দোয়া সেরে সবাই ইফতার শুরু করে। টেবিলে তিন ধরনের ইফতার। প্রতিবেশীদের পাঠানো ইফতার, বাসায় বানানো ইফতার এবং বাজার থেকে ক্রয় করা ইফতার।

নামাজ শেষ হতেই চারদিক থেকে শোরগোল শোনা যায়। টিভিটা খোলাই ছিল। সেখান থেকে ভেসে আসছে ওমন ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ। সব বাসার সব টিভি থেকে একটি গানই ভেসে আসে। জাতীয় কবি নজরুলের অবিস্মরণীয় গান।

দাদা সবাইকে নিয়ে ছাদে যান। ফ্ল্যাটের ছেলেমেয়ে সবাই ছাদে উঠেছে। ঐ তো, ঐতো বলে পাশের বাসায় বাবুল চিৎকার করে উঠলো। সবাই যার যার মতো বাবুলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে দূর আকাশের দিকে তাকালো। দেখেছ, দেখছি বলে শুধু কিশেরাই হইচই করতে লাগলো। দাদা বললেন, সবাই মিলে আলহামদুলিল্লাহ বলো। সবাই গলা ছেড়ে বললো- আলহামদুলিল্লাহ।

হইচই করতে করতে সবাই যার যার বাসায় চলে গেল। দাদা আরিজের বাবা ডাঃ বান্নাকে ডেকে বললেন : কারো কোনো কেনাকাটা বাকি আছে কি না।

www.icsbook.info

– হ্যাঁ আব্বু, সবার জন্য দুই সেট করে ঈদের কাপড় কেনা হয়েছে। কিন্তু কাজের মেয়েদের জন্য কেনা হয়েছে মাত্র এক সেট করে।

– দাদাভাই দাদাভাই এটা কি ঠিক হলো?

– না, দাদাভাই এটা ঠিক হয়নি। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন তোমরা যা খাবে, গৃহকর্মীদর তা-ই খাওয়াবে। তোমরা যা পরবে, তাদেরকে তাই পরাবে।

– চলো তা হলে এখনই বাজারে খাই, স্বপ্ন ও মমতার জন্য আরেক সেট করে কাপড় কিনে আনি।

– যাবো, অবশ্যই যাবো, তার আগে আমার আম্মা অর্থাৎ তোমার বড় মাকে ঈদের সালাম জানাই। ঈদের সালাম জানাই তোমার সকল দাদা ভাইও দাদুকে।

– এই আরিজের দাদা, আতর লাগবে, সুরমা লাগবে আর লাগবে গোলাপপানি আর মেহেদি– পাশ থেকে আরিজের দাদী কথা বলেন।

– তোমরা জন্য কাজল লাগবে না?

– লাগবে, বিয়ের কাজল দানিটা এখনও আমার কাছে আছে। তুমি বরং বৌমার জন্য এক শিশি আলতা নিয়ে আসবে।

এশার আজান পড়ে। পাশেই ধানমন্ডি-৭ এর বিশাল মসজিদ। আরিজ, আরিজের বাবা ও দাদা মসজিদে যান। নামাজ শেষে ওরা নিউমার্কেটে যান। তালিকা অনুযায়ী সব কিছু কিনেন।

আরিজ বলে, দাদাভাই, এক সেট কাপড় বেশি করে কিনে নাও, যদি আবার কারো লাগে। তোমাদের ঐ গল্পটা মনে নেই? আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) ঈদের দিন রাস্তায় বস্ত্রহীন এক কিশোরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এবার তো দেশে অভাব, হয়তো ঈদের মাঠে বস্ত্রহীন কোনো ছেলেকে পাওয়া যাবে। দাদাভাই আরিজের কপালে বিশাল এক চুমু খেয়ে বললেন, বেঁচে থাকো দাদাভাই, বেঁচে থাকো। তুমি অনেক ভালো কথা বলেছো। চলো আরেক সেট কাপড় আমরা কিনে নিই।

আরেক সেট কাপড় দেখে স্বপ্ন ও মমতার খুশি দেখে কে!

ইবাদত-বন্দেগি, রান্নাবান্না, এসএমএস ও ঈদ মোবারক বলে ফোন করতে করতে রাতটা কেটে যায়। আরিজের চোখে ঘুম নেই। সে একবার কিচেনে বুবুমনি (দাদী) ও মায়ের কাছে, আবার দাদাভাইয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। তার মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক আনন্দ আর অনেক জিজ্ঞাসা।

www.icsbook.info

ক্যাম্পিং

বার্নার্ড ম্যাকটার ॥ অনুবাদ : হোসেন মাহমুদ

বসন্তের সুন্দর সকাল। স্নোমোবাইল নিয়ে বেরিয়েছিল ব্র্যাডলি। কিন্তু কপাল খারাপ। বরফের চোরা গর্তে পড়ে অচল হয়ে গেছে সেটা। এ বরফের রাজ্যে তা ঠিক করার উপায় নেই। একা একা হাঁটছিল ব্র্যাডলি। কোথায় পা ফেলছে সেদিকে লক্ষ রাখছিল আর ভাবছিল কেন সে একা ক্যাম্পিং করতে এলো। আর তখনি সিলের শ্বাস নেয়ার একটা গর্তে পড়ে যায় সে। উপরে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, সহজ নয়। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর সে উঠে আসে ওপরে। এখন তার দুঃখ হচ্ছে যে কেন সে বসন্তের এমন সুন্দর একটা দিনে ক্যাম্পিং করতে এলো।

আগের দিন পরিকল্পনাটি করেছিল ব্র্যাডলি। ছুটির দিন দু'টি ক্যাম্পিং ও সিল শিকারে কাটাবে সে। একা। একা এ জন্য যে সপ্তাহান্তে তার

www.icsbook.info

পরিবারের প্রায় সবাই কাজে ব্যস্ত থাকে বা কোথাও বেড়াতে যায় নয়তো পরের সপ্তাহে দীর্ঘ ক্যাম্পিংয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। তার মা অবশ্য তাকে একা ক্যাম্পিংয়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন। ব্র্যাডলির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি। কারণ স্নোমোবাইল ভেঙে যেতে পারে বা সে খারাপভাবে আহত হতে পারে। তাছাড়া শিকার বা ক্যাম্পিংয়ের অভিজ্ঞতাও তার অল্পই।

তার সম্পর্কে মায়ের এ আস্থার অভাবে খুব অপমানিত বোধ করে ব্র্যাডলি। বলে–

: দেখ মা, আমি একটু একাকী থাকতে চাই। আমার মাথার ভেতরে বহু রকম চিন্তা ঘোরাফেরা করে। গত মাসে যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো নিয়ে ভেবে দেখতে হবে আমাকে। সে জন্য কমপক্ষে তিন দিন সময় চাই।

: ওসব বাদ দে তো বাবা। তার বদলে আগামী সপ্তাহে আমাদের সাথে চল তুই। আমরা ক্যাম্পিংয়ে যাচ্ছি।

: না, তোমাদের সাথে অনেক মানুষ যেতে চাইবে। আমার হৈ-হল্লা ভালো লাগে না। তোমরা যাচ্ছ যাও, আমি আমার মত যাবো।

মা ছেলের একগুঁয়েমির কথা জানেন। তারপরও আরো দু-একবার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। লাভ হলো না। হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন–

: ঠিক আছে, তোমাকে একা যেতে দিতে পারি এ শর্তে যে জরুরি প্রয়োজন এমন সব জিনিস তোমাকে সাথে নিতে হবে। যেমন রেডিও যাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ থাকে, সারভাইভাল ইকুইপমেন্ট ও খাবার।

রাজি হয় ব্র্যাডলি।

স্নোমোবাইলের জন্য তেল আর রান্নার জন্য কোলম্যান স্টোভ কিনতে গিয়ে তার ভাই চার্লির কাছে ধরা খেল সে–

: কী ব্যাপার? কোথায় যাচ্ছিস তুই?

তড়িঘড়ি জবাব দেয় ব্র্যাডলি–

: আমি ইঙ্গনিরতালিক যাচ্ছি, নাত্তিয়াভিনিক (বড় সিল) ও কানগুক (ছোট সিল) শিকার করব।

: কিন্তু তুই একা যাচ্ছিস কেন? জিজ্ঞেস করে ভাই।

: সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো নিজের মত করে ভেবে দেখব বলে একা যাচ্ছি।

চার্লি খানিকক্ষণ তার সাথে তর্ক করে তাকে ব্রাডলি যেতে বলেনি কেন তা নিয়ে। শেষে বলে–

www.icsbook.info

: আচ্ছা, এবার তুই একাই যা। কিন্তু পরের বার অবশ্যই আমাকে বলবি। আমি শিকারের সরঞ্জাম ছাড়া সাথে কিছুই নেবো না।

সম্মতি জানায় ব্রাডলি। তারপর বাড়ির দিকে রওনা হয় সে।

সব গোছগাছ করাই ছিল। মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। স্নোমোবাইল স্টার্ট দেয়। তার ক্যাম্পিং সাইট শহর থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে।

ঘণ্টাখানেক চলার পর একটু বিশ্রাম নেয়া আর এক কাপ চা খাবার জন্য থামে ব্রাডলি। ভালো পথ আর সিল দেখার জন্য চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে। দূরে আরেকটি শিকার পার্টিকে দেখতে পায়। তবে পাত্তা দেয় না। খানিকটা সময় বিশ্রাম নেয়ার পর সে ভাবতে থাকে ইঙ্গনিরতালিকে গিয়ে ক্যাম্প করার পর কিভাবে শিকার করবে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে বড় সিল পাওয়া যায়। তাছাড়া পরিবারের সাথে আগেও সেখানে ক্যাম্প করে থেকেছে সে।

চা খাওয়ার পর জিনিসপত্রগুলো সাপ্লাই বক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে ক্যামোটিকে (স্নোমোবাইলে সাথে জোড়া দেয়া মালামাল রাখার স্লেজ) রাখে ব্রাডলি। রওনা হয় ইঙ্গনিরতালিকের দিকে। তার চোখ সিল ও তাদের শ্বাস নেয়ার গর্ত খুঁজতে থাকে। অনেকগুলো গর্ত চোখে পড়ে তার। ক্যাম্প করে পরে এসে দেখা যাবে এগুলো– ভাবে সে।

ক্যাম্পিং সাইটে পৌঁছে যায় ব্রাডলি। তাঁবু খাটানো হয়ে গেলে আগে পানি ফুটিয়ে চা খায়। ম্যাট্রেস বিছায় তাঁবুর ভেতরে। তারপর মাকে রেডিওতে জানায় যে সে নিরাপদেই ক্যাম্প সাইটে পৌঁছেছে।

খাবার পর্ব সেরে সিল শিকারের জন্য প্রস্তুত হয় সে। কিছু শিকারের সরঞ্জাম ক্যামোটিকে তোলে। স্নোমোবাইলে তেল ভরে নেয়। তারপর যেখানে সিল ও তাদের শ্বাস নেয়ার গর্ত দেখেছিল, সে স্থানের দিকে রওনা হয়। কাছাকাছি পৌঁছতেই একটি সিল দেখতে পায়। সিলটির দিকে এগোয়। এ সময় বাবার কথা মনে পড়ে তার। তিনি তাকে শিখিয়েছিলেন কী করে বিরক্ত না করে ঘুমন্ত সিলের কাছে পৌঁছনো যায়। সে কথা মাথায় রেখে সিলটাকে গুলি করার দূরত্বে পৌঁছে যায় সে। .২২৩ ক্যালিবারের রাইফেল তুলে নেয় হাতে, তারপর গুলি করে সিলের মাথার ডান দিকে। গুলিবিদ্ধ সিলটি কয়েকবার ওলট পালট খেয়ে পড়ে যায় কাছের একটি শ্বাস নেয়ার গর্তে। সেখান থেকে তাকে তুলে এনে নিজের মনেই বলে ব্রাডলি–

www.icsbook.info

: যাক, এ বছরের প্রথম সিলটা শিকার করতে পেরেছি।

সিলটিকে ক্যামোটিকে টেনে তোলে সে। এ সময় তার মনে পড়ে যায় বাবা তাকে সিল ও অন্যান্য প্রাণী শিকারের শিক্ষা দিয়েছেন। সিলটিকে ভালো করে বেঁধে সে রওনা হয় ক্যাম্পের দিকে।

সিলের চামড়া ছাড়ায় ব্রাডলি। সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করতে ছালটি রেখে দেয় ক্যামোটিকের নিচে। সবটা মাংস একটি ব্যাগে ভরে। খানিকটা নিয়ে রান্না করে। পেট ভরে খাওয়ার পর শুয়ে পড়ে সে। অনেক নাত্তিয়াভিনিক ও কানগুক শিকারের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে যায়।

সকালে উঠে প্রথমে কফি খাওয়ার জন্য পানি ফুটিয়ে নেয় ব্রাডলি। তারপর নাশতা সারে। এবার বেরোবে সে। দিনের কী অবস্থা দেখার জন্য বাইরে আসে। শিকারের জন্য খুবই ভালো আবহাওয়া দেখে তার মনও ভালো হয়ে যায়। স্নোমোবাইলে তেল ভরার পর ব্যাকপ্যাকে কিছু খাবার ও গুলি ভরে সেটা কামোটিকে রেখে শক্ত করে বাঁধে। এবার আরেকটি জরুরি কাজ আছে। রেডিওতে মাকে জানায় যে শিকারে যাচ্ছে সে। ফিরতে সন্ধ্যা হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালানোর পর একটি শ্বাস নেয়ার গর্ত দেখতে পায় ব্রাডলি। এখানে নাত্তিয়াভিনিক থাকার লক্ষণ খোঁজে সে। কিছু সাদা পশম। সিলদের চামড়া ঘন ধূসর রঙে পরিবর্তিত হওয়ার আগে শরীরের সব সাদা পশম ঝরে পড়ে। অথবা শ্বাস নেয়ার আরো কিছু গর্ত। আরো গর্ত খুঁজে পায় সে। এখানে নাত্তিয়াভিনিক আছে বলে নিশ্চিত হয়। একটি শ্বাস নেয়ার গর্ত বেছে নিয়ে সিলের আসার অপেক্ষা করতে থাকে। অল্পক্ষণ পরই পানিতে ছলাৎ শব্দ ওঠে। সিল এসে গেছে। হাতে একটি হুক নিয়ে তৈরি হয় ব্রাডলি। সিলটি শ্বাস নেয়ার জন্য পানির ওপরে মাথা তুলতেই সেটিকে হুকে গেঁথে ফেলে। নিয়ে আসে গর্তের বাইরে। ছাল ছাড়িয়ে সব মাংস ব্যাগে ভরে ক্যামোটিকে রাখে। তারপর হাত পরিষ্কার করে আরেকটা সিল শিকারের জন্য তৈরি হয়।

খানিকটা পথ পাড়ি দেয়ার পর হঠাৎ করে থেমে যায় স্নোমোবাইল। সে গাড়িটা স্টার্ট দেয়ার জন্য খানিকক্ষণ চেষ্টা করে, পারে না। টুল বক্স বের করে সে। খুলে ফেলে ইঞ্জিন। দেখে, পিস্টন ভেঙে গেছে। তার কাছে স্পেয়ার নেই। ভীষণ খারাপ হয়ে গেল ব্যাপারটা। স্নোমোবাইল ছাড়া এখানে কারো পক্ষে চলাফেরা করা অসম্ভব। এখন হেঁটে ক্যাম্পে ফেরা ছাড়া

www.icsbook.info

তার উপায় নেই। তাই অচল স্নোমোবাইল রেখে ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করে সে। ক্যাম্পে পৌঁছতে তাকে ৩০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। একে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, তার ওপর পুরো এলাকা বরফের চাদরে ঢাকা। ছোট ক্যামোটিকটা টেনে নিতে হচ্ছে তাকে। এটা এক বাড়তি ঝামেলা। ২০ মিনিট হাঁটার পর সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে ক্যামোটিকটা আর টেনে না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পয়েন্ট ২২৩ রাইফেলটা হাতে নিয়ে হাঁটতে থাকে সে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ব্রাডলি। সিলের শ্বাস নেয়ার এক গর্তে পড়ে যায় সে। ভিজে যায় তার পোশাক। এমনিতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তার ওপর ভেজা কাপড়। তার কোনো ধারণাই ছিল না যে ঠাণ্ডা এত ভয়ঙ্কর হতে পারে। কিছুক্ষণের জন্য থামে ব্রাডলি। ভেজা জামাকাপড় খুলে ফেলে যতটা সম্ভব পানি নিংড়ে ফেলে চেষ্টা করে একটু শুকানোর। তারপর আবার হাঁটতে থাকে সেগুলো পরে। শরীর গরম রাখার জন্য জগিং করে ও মাঝেমধ্যে বিশ্রাম নিয়ে অবশেষে ক্যাম্পে ফেরে সে। বিরাট ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেরি না করে সাহায্য চেয়ে মেসেজ পাঠায় সে রেডিওতে। এখন শুধু সাড়ার অপেক্ষা।

ভোর ৪টা বাজে। পরিবার বা অন্য কারো কাছ থেকেই সাড়া আসেনি। আশঙ্কা চেপে বসে মনে। এক কাপ চায়ের জন্য একটু পানি গরম করা বা একটু সিলের মাংস রাঁধার জন্য কিছু কাঠের জন্য এদিক ওদিক তাকায় সে। পেয়ে যায়। আগুন জ্বালিয়ে এক কাপ চা তৈরি করে খেয়ে নেয়। তারপর সিলের খানিকটা মাংস নিয়ে রান্না বসায়। মাংস রান্না হতে সময় লাগবে। এ সময় সে রেডিওতে তার মা বা শহরের আর কারো সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। ইঙ্গনিরতালিকের কাছাকাছি জায়গায় তার স্নোমোবাইল অচল হয়ে গেছে। তাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু কারো সাড়া মেলে না। মনটা খারাপ হয়ে যায়। মাংসটা রান্না হয়ে গেছে। খেয়ে ঘুমাতে যায় সে। সকালে উঠে ক্যামোটিকটা নিয়ে আসতে হবে।

ঘুম থেকে জেগে আরেকবার সে চেষ্টা করে রেডিওতে যোগাযোগের। পায় না কাউকে। কী আর করা। এখন ক্যামোটিকটা ফিরিয়ে আনতে হবে ক্যাম্পে। কারণ তার ভেতরে জরুরি সব জিনিসপত্র আছে। বহু সময় পর ক্যামোটিকের কাছে পৌঁছে ব্রাডলি। প্রথমেই স্টোভটা বের করে পানি ফুটিয়ে চা বানায়। এ মুহূর্তে ভীষণ ভালো লাগে তার চা-টুকু। এ সময় তার

www.icsbook.info

মাথায় চিন্তা ঢুকে পড়ে। সে যদি রেডিওতে কারো সাথে যোগাযোগ করতে না পারে তাহলে সে বাড়ি ফিরবে কি করে? চা খাওয়া শেষ করে স্টোভ ক্যামোটিকে ঢোকায় স্টোভ। তারপর সেটা নিয়ে ক্যাম্পের ফিরতি পথ ধরে।

একটানা ১৫ কিলোমিটার হেঁটে থামে ব্রাডলি। একটু রেস্ট নেয়া দরকার। ক্যামোটিকের উপর বসে পড়ে সে। সে সময় একটি প্লেনের আওয়াজ কানে আসে তার। খুশিতে লাফিয়ে ওঠে সে। সেটা নিশ্চয়ই তার খোঁজে এসেছে। কিন্তু প্লেনটিকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় তার। তা এত ওপরে যে ধোঁয়া সৃষ্টি করে বা আর কোনোভাবে সেটাকে সঙ্কেত দেয়া সম্ভব নয়। তাই বৃথা চেষ্টা না করে ক্যামোটিকের ওপর বসে আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় সে। ক্যাম্প এখনো ১৫ কিলোমিটার। ব্রাডলি হাঁটতে শুরু করে।

এক সময় একটা মেরু ভল্লুক দেখতে পায় ব্রাডলি। তার দিকেই আসছে ওটা। সে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্যামোটিকের মধ্যে হুক বা হারপুন খুঁজতে থাকে। এ মেরু ভল্লুকগুলো খুবই হিংস্র ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাদের কবলে কোনো মানুষ পড়লে বাঁচা কঠিন। ক্যামোটিকের উপর বসে পড়ে সে। মনে মনে আশা করতে থাকে যে ওটা তার দিকে আসবে না। হঠাৎ তার সিলের মাংসের কথা মনে পড়ে। দ্রুত কিছু মাংস বের করে সে। ক্যামোটিক থেকে বেশ কিছুটা দূরে রেখে দেয়। তারপর অপেক্ষা করতে থাকে কি ঘটে তা দেখার জন্য। মেরু ভল্লুকটি সিলের মাংসের গন্ধ পেয়ে সেদিকে এগিয়ে আসতে থাকে। মংসের দলা দেখতে পেয়ে খেতে শুরু করে তা। ব্রাডলি পাথরের মূর্তির মত ক্যামোটিকের উপর বসে থেকে তা দেখতে থাকে। মাংস খাওয়া শেষ করে ভল্লুকটি নাক উঁচু করে বাতাসে গন্ধ নেয়। তার হয়ত আরো মাংস খাওয়ার ইচ্ছে আছে। ব্রাডলির দিকে নয়, স্নোমোবাইলের দিকে এগোতে থাকে ভয়ঙ্কর জন্তুটা। তার মনে হয়, ভল্লুকটা সম্ভবত তার গন্ধ পায়নি। ব্রাডলি একচুল না নড়ে ঠায় বসে থেকে ভল্লুকটির গতিবিধি লক্ষ করে। অচল স্নোমোবাইলের কাছে গিয়ে প্রাণীটি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আরেক দিকে চলে যেতে থাকে সেটা।

ভল্লুকটি চলে যাচ্ছে। চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ব্রাডলি। তারপর সে আবার হাঁটতে শুরু করে তার ক্যাম্পের দিকে। চলতে চলতে বারবার পেছনে ফিরে তাকায় সে। দেখে ভল্লুকটা পেছন পেছন আসছে কিনা। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর থামে সে। চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। চা

www.icsbook.info

খেতে খেতে সতর্ক চোখে চারদিকে তাকায়। অবাক হয়ে দেখে, তার ক্যাম্প বেশি দূরে নয়। তড়িঘড়ি করে চা শেষ করে সরঞ্জাম ঢোকায় ক্যামোটিকে। তারপর আরো আধ ঘন্টা হেঁটে পৌছে যায় ক্যাম্পে।

ঘড়ি দেখে ব্রাডলি। রোববার রাত ১০টা বেজে ৩৪ মিনিট। শহর বা ক্যাম্পিং করতে বাইরে থাকা কারো সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে সে। একজনের সাড়া পায়। তার চেয়ে শহরের খানিকটা কাছে আছে সে। ব্রাডলি তাকে অনুরোধ করে সে যেন তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে এবং তার স্নোমোবাইল অচল হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে দেয়।

সেই অপরিচিত লোকটি জিজ্ঞেস করে–

: তুমি কি একা?

: হ্যাঁ।

: ঠিক আছে। আমি তোমার পরিবারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করব এবং তাদের জানাব যে তুমি ভালো আছ। এদিকে শহরের সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ পার্টিকেও তোমার কথা জানিয়ে দিচ্ছি।

: ধন্যবাদ। আমি আমার পরিবারের সাথে তোমার যোগাযোগের অপেক্ষায় রইলাম। বলে ব্রাডলি।

একটু স্বস্তি বোধ জেগে ওঠে ব্রাডলির মধ্যে। আরো সিলের মাংস রান্নার ব্যবস্থা করে সে। আর অপেক্ষায় থাকে কখন তার পরিবার তার সাথে যোগাযোগ করে।

বেশি সময় যায়নি। রেডিও জীবন্ত হয়ে ওঠে। মা।

: ব্রাডলি, তুই কেমন আছিস বাবা? মায়ের গলায় প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা।

: আমি ভালো আছি মা। বেশি চিন্তা করো না।

: তুই গত রাতে যোগাযোগ করলি না কেন? তোকে বারবার বলেছি না কিছু হলে সাথে সাথে জানাবি?

: খুব চেষ্টা করেছি মা, তোমাদের কারো সাড়া পাইনি। একটা কথা মা।

ব্রাডলির মনের ভেতর মেরু ভল্লুকের কথাটি মাকে বলার জন্য ঘুরঘুর করছিল।

: কি কথা? বল তো শুনি।

ঘটনাটা বলে সে। মা বলেন–

: বলিস কি! খুব বাঁচা বেঁচে গেছিস। খুব সাবধানে থাকিস বাবা। আর যত তাড়াতাড়ি পারিস ফিরে আয়। আমরা তোর উদ্ধারের জন্য রেসকিউ

www.icsbook.info

পার্টি পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।

ব্রাডলি বেশি করে সিলের মাংস রান্না করতে বসে। রেসকিউ পার্টির যারা আসবে তাদের তো কিছু খেতে দিতে হবে। বাবার শিক্ষার কথা মন পড়ে তার। বৈরী পরিবেশে ও সঙ্কটকালে কিভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হয় তা তিনি শিখিয়েছেন।

সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ টিম আসতে সময় লাগবে। ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়ায় ব্রাডলি। তার সাথে একটি ছোট বাইনোকুলার আছে। তা দিয়ে চারপাশে খুঁটিয়ে দেখে কোনো মেরু ভল্লুক আছে কিনা। না নেই। সে তাঁবুর ভেতরে ঢোকে মাংস রান্নার অবস্থা দেখার জন্য। এ সময় উত্তর দিকে থেকে একটি স্নোমোবাইল আসার আওয়াজ পায় সে। বাইনোকুলার হাতে আবার বেরিয়ে আসে সে বাইরে। একটি স্নোমোবাইল আসছে। এখনো দূরে, এটা তবে রেসকিউ পার্টির নয়। আনন্দিত ব্রাডলি দৌড়াতে শুরু করে সেটার দিকে।

স্নোমোবাইলে দু' জন মানুষ। একজন বয়স্ক। তাকে দেখে চিনতে পারে সে। তার বাবার বন্ধু। কিলুকিশাক। আরেকজনের নাম জর্জ, কিলুকিশাকের নাতি, তার সমবয়সী। তার বাবার কাছ থেকে তাকে উদ্ধার করার অনুরোধ পেয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছেন তার খোঁজে। ব্রাডলিকে ক্যামোটিকে তুলে নিয়ে তার ক্যাম্পে চলে আসেন তারা। সবাই মিলে সিলের মাংস খেতে বসে।

: বা! তোমার রান্না তো বেশ ভালো। আরাম করে খেতে খেতে বলেন কিলুকিশাক।

: আরেকটু দেই?

খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করে ব্রাডলি।

মায়ের সাথে কথা বলে ব্রাডলি। কিলুকিশাকের কথা বলে। খুশি হন মা। বলেন–

: তাকে আমার আর তোর বাবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানা। আর হ্যাঁ, কখন রওনা হচ্ছিস তোরা?

: আজ তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাল সকালে রওনা হওয়াই ভালো হবে মনে হয়। তুমি চিন্তা করো না মা।

কিলুকিশাক তার কথা শুনছিলেন। রেডিও অফ হলে তিনি বললেন–

: ঠিক বলেছ। রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালে রওনা হবো আমরা।

www.icsbook.info

কিলুকিশাক ব্রাডলির কাছে তার গল্প শোনেন মনোযোগ দিয়ে। মেরু ভল্লুকের কথা শোনার পর বলেন, সিলের মাংসটা না দিলে ভয়ঙ্কর বিপদ হতো তোমার। এই প্রাণীগুলো এত হিংস্র যে তাদের সামনে পড়লে সাধারণত মানুষ বাঁচে না। যাক, স্রষ্টাকে ধন্যবাদ তোমার কিছু হয়নি। আর আমরা ফিরে যাওয়ার সময় তোমার অচল স্নোমোবাইলটাকে বেঁধে নিয়ে যাবো।

রাত ন'টার পর ঘুমাতে যায় তারা। গল্পের মধ্যে এক ফাঁকে উঠে গিয়ে তাদের দু'জনের জন্য তাঁবু খাটিয়ে এসেছে জর্জ।

মা-বাবাসহ পরিবারের সবাই ব্রাডলির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সে বাড়ি পৌঁছতেই খুশির রোল ওঠে। মা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান। অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হয় তাকে।

আনন্দের রেশ একটু থিতিয়ে এলে বাবা ও মা তার পাশে এসে বসেন। মা বলেন–

: তোমার জন্য একটা শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

: শাস্তি? একটু যেন ভয় পায় ব্রাডলি।

: হ্যাঁ, এর পরে শহর থেকে ৪০ কি মি-এর বেশি দূরত্বে ক্যাম্পিংয়ে যাওয়া চলবে না তোমার। এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

বাবার দিকে তাকায় সে। মাথা নেড়ে মায়ের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন দেন তিনি।

তার জন্য মা-বাবার উদ্বেগের গভীরতা উপলব্ধি করে সে। আস্তে করে বলে-

: ঠিক আছে মা।

লেখক পরিচিতি:

বার্নার্ড ম্যাকটারের জন্ম কানাডার বরফ ঢাকা অঞ্চল নুনাভুত-এ ১৯৮০ সালে। তিনি ইন্টারনেটে গল্প লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন।

www.icsbook.info

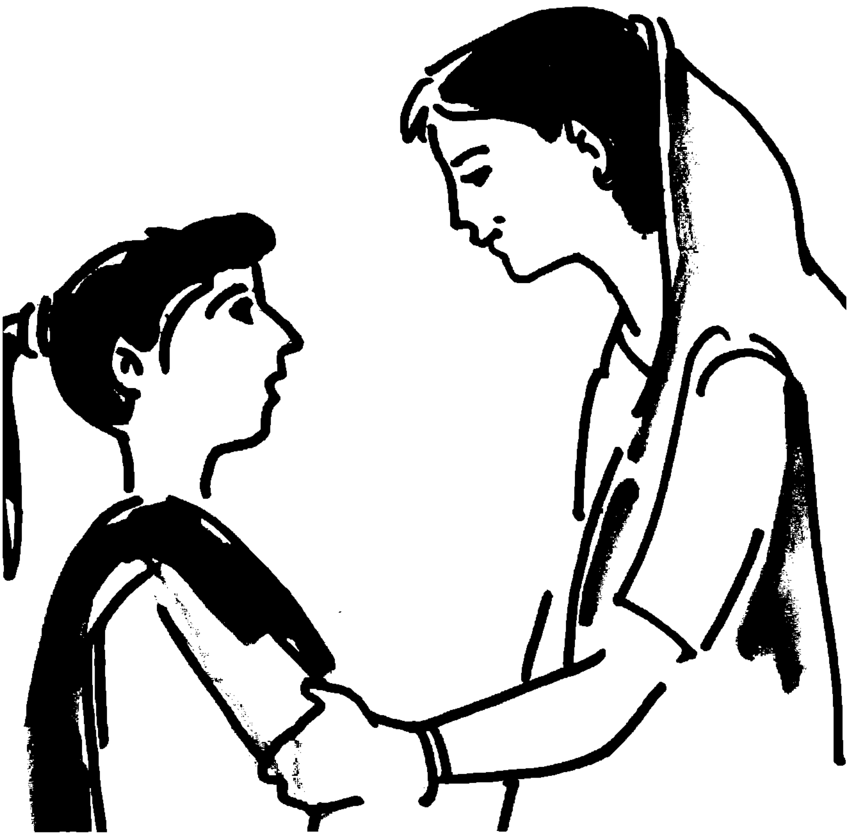

একজন সুখীর কথা

এনায়েত রসুল

নিজের নামটা নিজের কাছে এখন দুঃসহ মনে হয়। সুখীর ভাবতে অবাক লাগে, প্রাচুর্যের সাথে সম্পৃক্ত এ নামটা ওর বাবা রেখেছিলেন। সুখীর নাম আর বাবার আদর্শ– এ দুটোকে কখনো এক সঙ্গে মিলাতে পারে না সুখী। শুধুই মনে হয়, নামটা যেন বাবা নন, অন্য কেউ রেখেছেন। আবার পরক্ষণেই সুখী ভাবে, এমন নাম রাখার পেছনেও হয়তো বাবার একটা উদ্দেশ্য ছিলো। হয়তো তার বিশ্বাস ছিলো এই সুখী শব্দটার কল্যাণে তার মেয়ের জীবন সুখের বন্যায় থই থই করবে।

সুখী শুনেছে, যেদিন ওর পনের দিন বয়স, সেদিন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। আর যেদিন একুশ দিন বয়স সেদিন যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন

www.icsbook.info

বাবা। স্ত্রী আর সদ্যোজাত সন্তানকে নিজের জীবনের চেয়েও ভালো বেসেছিলেন যে মানুষটি, স্ত্রী আর সন্তানের ভালোবাসা ধরে রাখতে পারেনি তাকে। বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

সেই রাতের স্মৃতি আজও চকচকে ছবির মতো জ্বলজ্বল করছে মায়ের মনের কোণে। সুখীর বাবা মুক্তিযুদ্ধে যাবার রাতে মা যখন সুখীকে নিয়ে বাবার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলেন, বাবা তখন বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়েছিলেন মায়ের দিকে। অসহায় কণ্ঠে বলেছিলেন, আমাকে এভাবে বাধা দিও না নীলা। তুমি জানো তো শত্রুরা আজ জেঁকে বসেছে এ দেশের ওপর। এই সঙ্কটে আমি যদি দেশের পাশে গিয়ে না দাঁড়াই, তবে নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে যাবো।

মা বলেছিলেন, তোমার এ কথা যেমন সত্য, তুমি পাশে না থাকলে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবো, সে কথাও তেমন সত্য। আমাদের নিরাপত্তার কথা ভাববে না?

বাবা বলেছিলেন, নিরাপত্তার কথা ভেবেই তো যুদ্ধে যাচ্ছি। শত্রু ধ্বংস করে এক নিরাপদ স্বাধীন দেশ এনে দেবো তোমাকে। এসেই দেশে নতুন করে শুরু করবো আমাদের জীবন। সমস্ত দুঃখ মুছে, পরাধীনতার লজ্জা মুছে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবো আমরা। আমার মেয়ে সুখী হবে এক স্বাধীন দেশের সন্তান।

আকাশছোঁয়া প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন বাবা। আর সত্যি সত্যিই তিনি ফিরে এসেছিলেন এক স্বাধীন দেশ নিয়ে। বড় হয়ে সুখী সে সব কথা শুনেছে মায়ের কাছে। মায়ের মুখে বাবার বীরত্বের কথা শুনে শুনে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো আজ জীবন্ত ছবির মতো অনুভব করে সুখী। গর্বে গর্বে কানায় কানায় ভরে থাকে সুখীর বুক। কিন্তু যাকে নিয়ে সুখীর এতো গর্ব, সেই বাবা কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেননি সুখীকে। বরং সুখী যখন সে কথা শুনতে চেয়েছে, বাবা তখন কৌশলে এড়িয়ে গেছেন প্রসঙ্গটাকে। খুব চেপে ধরলে বলেছেন, দেশের জন্য যুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিলো যুদ্ধ করেছি। হাজারো রকম বৈরি পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছি। এসব তো যে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রেই এক সাধারণ ঘটনা। এর মাঝে বুক ফুলিয়ে বলার মতো কোনো উপাদান আছে, আমার তো তা মনে হয় না।

বাবা যতই বলতেন বুক ফুলিয়ে বলার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি তার মুক্তিযোদ্ধা জীবনে, মা ততই দ্বিমত পোষণ করতেন বাবার এ কথার সঙ্গে।

www.icsbook.info

মা বলতেন, নিজের অবদানকে ছোট করে দেখো না। তুমি যেভাবে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছো, তা বুক ফুলিয়ে বলার মতোই ঘটনা। যা সত্য তা বলতে এতো দ্বিধা কেন বুঝি না।

বাবা ম্লান হাসতেন মায়ের কথা শুনে। বলতেন, দ্বিধা না নীলা প্রবৃত্তির অভাব। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

: কেন?

বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইতেন মা।

বাবা বলতেন, কী করে প্রবৃত্তি হবে? কিছু কিছু মানুষ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে এতো কথা বলছে, আমি তার উৎস খুঁজে পাই না। তবে একটা কথা বুঝতে পারি, আমি কিছু বললে সেসব কথা পানসে হয়ে যাবে। কিছু কথা মিথ্যে হয়ে যাবে। তাই ভাবী, নিজের কথা নিজের কাছেই সঞ্চিত থাক। কী লাভ তা অন্যকে বলে?

মা বলতেন, কী ক্ষতি তাও তো বুঝি না!

বাবা বলতেন, আচ্ছা বুঝিয়ে বলছি। মুক্তিযুদ্ধটা যুদ্ধই ছিলো– রূপকথার মতো অবাস্তব কিছু ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধের যে অংশের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম সে অংশেই যুদ্ধই হয়েছে। কল্পকাহিনীর মতো চমকপ্রদ কিছু ঘটেনি। অথচ আমার সহযোদ্ধারা কতো কিছু বলে বেড়াচ্ছেন! মানুষজনও তা শুনে রোমাঞ্চিত হচ্ছে। গর্ব বোধ করছে। আমি সত্য কথা বললে সেসব মিথ্যে হয়ে যাবে। মুক্তযুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলে যাবে। কী দরকার মানুষের মনে অঙ্কিত সেই রঙিন ছবির গায়ে আঁচড় কেটে?

মা বলতেন, মানুষের কথা বাদ দাও। আমার কথা ছেড়ে দাও। সুখীর কথা ভাবো। সুখীর তো অধিকার রয়েছে বাবার মুখে তার বীরত্বের কথা শোনার। কেন তাকে বঞ্চিত করবে?

বাবা বলতেন, বঞ্চিত করছি বলছো কেন! আমার তেমন কোনো সম্পদ থাকলে তো বঞ্চিত করবো! আচ্ছা, তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও। কে বলেছে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়েছি আমি? না নীলা, কোনো বীরত্ব দেখাইনি! বীরত্বই যদি দেখাতাম তাহলে তো বীরপ্রতীক, বীর উত্তম খেতাবই পেয়ে যেতাম। কিন্তু কেন তা পাইনি জানো?

: কেন?

কৌতূহল ছড়িয়ে মা তাকাতেন বাবার দিকে। বাবা বলতেন, কারণ আমার

www.icsbook.info

জীবনে বীরত্ব বলে কিছু নেই। তোমরা যাকে বীরত্ব ভাবছো, আসলে তা টিকে থাকার প্রচেষ্টা।

: মানে?

এবার বিরক্তি ঝরতো মায়ের কণ্ঠে।

বাবা বলতেন, মানে হলো, শত্রুরা আমার দিকে রাইফেল তাক করেছে– আমিও ওদের দিকে তাক করেছি। ওদের গুলি আমার গায়ে লাগেনি– আমার গুলি ওদের গায়ে লেগেছে। এর মাঝে বীরত্বের ছিটেফোঁটাও ছিলো না। ছিলো লক্ষ্যভেদ আর ভাগ্যের খেলা। তাকে কী করে আমি বীরত্ব বলে চালাবো, বলো?

বাবার এমন কথার পর রণে ভঙ্গ দিতেন মা। অভিমানে ভেঙে পড়ে বলতেন, তোমাকে আর তোমার বীরত্বের কথা বলতে হবে না। সুখীকে যা বলার তা আমিই বলবো।

মুক্তিযুদ্ধ আর বাবার বীরত্ব সম্পর্কে যতোটুকু জানে, তা মায়ের কাছ থেকেই জেনেছে সুখী। শুনেছে, বাবা চিত্তরঞ্জন কটন মিলে কাজ করতেন। সুখী জন্ম নেবার পর ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিলেন। তার পরপরই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। বাবা যোগ দিয়েছিলেন সেই যুদ্ধে। আশপাশ গ্রামের যুবকদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী। তাদের নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতনে বাবা। সে কারণে শত্রু সৈন্যরা খুব ভয় পেতো বাবার বাহিনীকে। এতোটাই ভয় পেতো, যে, সন্ধ্যার পর এ এলাকায় অভিযানে বের হওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলো ওরা। শুধু তাই নয়, বাবার ভয়ে এ অঞ্চলে কেউ রাজাকার বাহিনীতেও যোগ দেয়নি কখনো। দেশ পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হয়েছিলো ষোল ডিসেম্বর– বাবা তার এলাকা মুক্ত করেছিলেন আট ডিসেম্বর। নিজে উদ্যোগ নিয়ে তার বাহিনীর সদস্যদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে তা জমা দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। সেই বাবা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ থেকে খুব সতর্কতার সঙ্গেই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কেন? এ ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বাবা যেসব যুক্তি দেখাতেন, তাই কি প্রকৃত কারণ?নাকি স্বাধীন দেশটির ওপর বাবার কোনো অভিমান ছিলো? আজ বাবা নেই। কে দেবেন সুখীর এ প্রশ্নর জবাব?

সুখীর বয়স বিশ। পাঁচ বছর আগে বাবাকে হারিয়েছে সুখী। উপার্জনক্ষম একমাত্র মানুষটি চিরবিদায় নেয়ার পর অনভ্যস্ত হাতে মা তুলে নিয়েছেন সংসারের দায়িত্ব। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান ভেনে সুখীর পড়ার খরচ জুগিয়েছেন।

www.icsbook.info

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কাজের ক্ষমতাও কমছে। এখন আর আগের মতো কাজ করতে পাররেন না। তবে সে জন্য খুব একটা চিন্তিত নন তিনি। খেয়ে না খেয়ে সুখীকে পড়িয়েছেন। এ বছর গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জন করেছ সুখী। এখন একটা না একটা চাকরি পেয়েই যাবে– তেমনই ধারণা মায়ের।

মায়ের এ ধারণাটা যে একেবারেই বাস্তবসম্মত নয়, চাকরি খুঁজতে গিয়ে দুই দিনেই তা বুঝতে পারে সুখী। চেনা-অচেনা কতজনকে যে চাকরির জন্য ধরেছে, তার হিসাব নেই। শেষমেশ কিছুটা আশ্বাস দিয়েছেন ওদের চেয়ারম্যান সাহেব। সেটাই সুখীর শেষ ভরসা।

দুই.

আজ ঘুম থেকে ওঠার পরপরই মা সুখীকে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটি মনে করিয়ে দিলেন– আজ সোমবার। দিনের প্রথম ভাগে চেয়ারম্যান সাহেব সুখীকে দেখা করার জন্য বলেছেন। যতোই কাজ থাক, সুখী যেনো এ কাজটি অবহেলা না করে, তাই ছিলো মায়ের অনুরোধ। কারণ সুখীর একটা চাকরির ভীষণ দরকার।

চাকরির যে ভীষণ দরকার এ কথাটা মায়ের মতো সুখীও জানে। তাই অনেক আশায় বুক বেঁধে সুখী গেলো চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে। তিনি তখন বারান্দায় বসে পেপার পড়ছিলেন। সুখীকে দেখেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, কে সুখী? এসো মা এসো। মনে মনে তোমার কথাই ভাবছিলাম। সুখী জিজ্ঞেস করলো, আপনি ভালো আছেন চাচা?

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, এ বয়সে যতোটুকু থাকা যায় ততটুকু আছি। তোমার কথা ভাবছিলাম কেন জানো? আমি গিয়াস সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। তোমার ব্যাপারে কথা হয়েছে।

: গিয়াস সাহেব কে? জানতে চাইলো সুখী।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, উনি উপজেলা শিক্ষা অফিসার সহানুভূতিশীল মানুষ। বসো সব বলছি।

বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা মোড়া ছিলো। ওটা এনে সুখী বসলো চেয়ারম্যান সাহেবের মুখোমুখি। চেয়ারম্যান সাহেব ততোক্ষণে কাগজের পাতা মুগ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। তাই সুখীকেই আবার প্রশ্নটা তুলতে হলো– চাচা! গিয়াস সাহেবের কথা কী যেন বলছিলেন?

www.icsbook.info

চেয়ারম্যান সাহেব কাগজটাকে ভাঁজ করে রাখলেন হাঁটুর ওপর।

তারপর বললেন, গতকাল আমি গিয়াস সাহেবের কাছে তোমার চাকরির কথা তুলেছিলাম। এতে তিনি বললেন, চাকরির ব্যাপারে তার কিছু করার নেই। চাকরি পেতে হলে নিজের যোগ্যতায়ই তা পেতে হবে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এখন কোনো পোস্টও ভ্যাকান্ট নেই।

সুখী বললো, পোস্ট ভ্যাকান্ট থাকলেও আজকাল ধরাধরি না করে কারো চাকরি হয় না। আমার খুব ভরসা ছিলো আপনার ওপর। ভরসা অবশ্য এখনো আছে। আমি জানি চেষ্টা করলে অবশ্যই একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারবেন।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, তোমরা ভরসা করো বলেই আমাকে ছোটাছুটি করতে হয়। তোমার বিশ্বাসের মূল্য দেয়ার জন্য গিয়াস সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। তোমার চাকরির কথা বলেছিলাম। তিনি কী বলেছেন তা তো বলেছিই তোমাকে। আমি আর কি করতে পারি মা। সাধ্য সীমিত।

কথা শেষ করে কাগজটাকে আবার মেলে ধরলেন চেয়ারম্যান সাহেব। সুখী বুঝলো, এ প্রসঙ্গে কথা বাড়াতে আগ্রহী নন তিনি।

কিন্তু তার যেমন সাধ্য সীমিত সুখীরও তেমন ভরসাস্থল সীমিত। এতো সহজে সেই ভরসাস্থল থেকে সরে দাঁড়ালে তো চলবে না। তাই মরিয়া হয়েই সুখী বললো, আমাদের অবস্থা তো জানেন চাচা। বাবা কিছুই রেখে যেতে পারেননি। সারা জীবন একটা আদর্শ আঁকড়ে থেকেছেন। অন্যের খেতে কাজ করে সংসার চালিয়েছেন। সম্বল আর সামর্থ্য বলতে কিছুই ছিলো না তার।

: কিন্তু তোমার মা তো কোথায় কোথায় কাজ করেন। তোমার চাচী বলেন, খুব কর্মঠ মহিলা তিনি।

কাগজ থেকে চোখ তুলে চেয়ারম্যান সাহেব তাকালেন সুখীর দিকে। সুখী কী জবাব দেয় তা শোনার জন্য তৈরি হলেন তিনি।

সুখী বললো, বাবা মারা যাবার পর বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান ভেনে মা সংসার চালিয়েছেন। আমাকে পড়িয়েছেন। কিন্তু এখন আর ঘোরাঘুরি করতে পারেন না। একদিন কাজ করলে দু'দিন অসুস্থ থাকেন। এ কারণেই একটা চাকরি ভীষণ প্রয়োজন। কিছু মনে করবেন না চাচা, আমার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। আমি এখন যাই।

: যাবে? আচ্ছা যাও। আমিতো আছিই। দেখি কী করা যায়। ও হ্যাঁ, আসল কথাটাই তো বলা হয়নি। গিয়াস সাহেব জানতে চেয়েছিলেন তোমরা

www.icsbook.info

মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পাচ্ছো কি না। আমি বলেছি পাচ্ছো। না পাওয়ার তো কোনো কারণ নেই, তাই না।

যেনো একটা অতি সত্য কথা বলেছেন সুখীদের সম্পর্কে, এমন মনোভাব নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেব তাকালেন সুখীর দিকে। সুখী সে কথা শুনে বিব্রত বোধ করলো। যে কথা এতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেব বলেছেন, কেমন করে সুখী তার বিরোধিতা করবে? কিন্তু ওকে তো তা করতেই হবে। নইলে একটা মিথ্যা কথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাইবা কী করে মেনে নেবে সুখী?

চেয়ারম্যান সাহেব তখনো জবাবের প্রতীক্ষায় তাকিয়েছিলেন সুখীর দিকে। তাই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবারও উপায় ছিলো না। সুখী বললো, আপনার ধারণা ঠিক নয় চাচা। আমরা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পাই না।

: পাও না মানে? ভাতা পাবে না কেন? তোমার বাবা তো এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় যুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সবাই জানে তার অবদানের কথা। সেই পরিবারের সদস্য হয়ে তোমরা ভাতা পাচ্ছো না এ কেমন কথা!

অবিশ্বাসের সুর ঝরে পড়লো চেয়ারম্যান সাহেবের কণ্ঠে।

সুখী বললো, এটাই সত্য। সরকার থেকে কোনো ভাতা পাচ্ছি না আমরা। চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, ভাতা না পাওয়ার তো কারণ নেই মা। আর পাওয়াটা অসম্মানজনকও কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, এ কথা সত্য, ওই ভাতা পাওয়া আর না পাওয়া একই। ভাতাটার অ্যামাউন্ট এতোই সামান্য যে, তা উচ্চারণ করতেও খারাপ লাগে। ঠিক বলেছি না?

ঠোঁটের কোণে দুর্বোধ্য হাসি নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেব তাকালেন সুখীর দিকে।

সুখী বললো, হয়তো ঠিকই বলেছেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ভাতার অ্যামাউন্টের ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই। বিশ্বাস করুন, আমরা ভাতা পাই না। পেলে মাকে এতো কষ্ট করে রোজগার করতে হতো না।

চমশার কাচ দুটো পরিষ্কার করতে করতে চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, ভাতা পেলেও কষ্ট করে রোজগার করতে হয়। ওই যে বললাম পুউর অ্যামাউন্টের কথা– সে জন্যই রোজগার করে বেঁচে থাকতে হয়। তোমার মা-ও কষ্ট করছেন। সংগ্রাম করে টিকে আছেন, এটা গর্বের কথা। সে যাক, আজ মায়ের কাছে সত্য-মিথ্যাটা জেনে নিও। এতো বড় মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী-কন্যা হয়েও ভাতা পাচ্ছো না, এ কী করে হয়?

www.icsbook.info

সুখী বললো, কেমন করে হচ্ছে জানি না। তবে ভাতা পাচ্ছি না।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, আচ্ছা ধরে নিলাম পাচ্ছো না। সত্যিই যদি ভাতা না পেয়ে থাকো তবে চিন্তার কিছু নেই। ভাতা পাবার ব্যবস্থা করে দেবো। গিয়াস সাহেব বলেছেন, ভাতার ব্যাপারে কোনো সমস্যা থাকলে তিনি তা সলভ করতে পারবেন। এখনো যদি তোমরা ভাতা না পেয়ে থাকো তবে তোমার বাবার মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটটা নিয়ে এসো। ওটার প্রয়োজন হবে।

: আচ্ছা আনবো। তো আমি যাই।

উঠে দাঁড়ালো সুখী।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, হ্যাঁ মা যাও। মনে সাহস রেখো। সমস্যা মানুষের জীবনে সব সময় থাকে না। আর আমি তো আছিই!

তিন.

এলোমেলো ভাবনা নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো সুখী। মা দাওয়ায় বসে পান চিবোচ্ছিলেন। সুখী গিয়ে বসলো মায়ের পাশে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, দেখা হয়েছিলো চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে?

সুখী বললো হ্যাঁ, হয়েছিলো।

: কী বললেন চেয়ারম্যান সাহেব?

: বললেন আপাতত চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবেন না। তবে চেষ্টা করবেন কিছু একটা করার জন্য। আর বললেন, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পাইয়ে দেয়ার কথা। এ জন্য আবার বাবার সার্টিফিকেটটা লাগবে। আচ্ছা মা, আমরা কি কখনো মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পেয়েছি?

মা বললেন, না। কখনো পাইনি। পাবো কেমন করে? ভাতা পাবার জন্য যে চেষ্টাটুকু করতে হয়, তোর বাবা তা করেননি। সবসময় বলতেন, নিজে খাটবো, নিজের সংসার নিজে চালাবো। ভাতা নেবো কেন? হঠাৎ ভাতার কথা জানতে চাইছিস যে?

সুখী বললো, চেয়ারম্যান চাচা জানতে চেয়েছেন। তার ধারণা আমরা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পাচ্ছি। আমি অবশ্য জোরগলায় বলেছি ভাতা পাচ্ছি না। তবে তিনি তা বিশ্বাস করেননি বলে মনে হলো।

: কেন? বিশ্বাস করবেন না কেন?

: কী করে বিশ্বাস করবেন? সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা দিচ্ছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাবাও ভাতা নিচ্ছেন– এটাই তো স্বাভাবিক। অথচ বাবা

www.icsbook.info

নাকি ভাতার জন্য চেষ্টাও করেননি! আসলে বাবার একবারেই বৈষয়িক জ্ঞান ছিলো না। তার ধারণ ছিলো, যে সময়টাতে তিনি বসবাস করেছেন, সেই সময়টা স্থির হয়ে থাকবে অনন্তকাল। কিন্তু সময় তো বয়েই চলে মা। সময় নদীর মতো গতিশীল থেমে থাকে না কারো জন্য। হয়তো বাবা তা মানতেন না।

মা বললেন, কী কঠিন কঠিন কথা বলিস আজকাল! সব কথা বুঝি না। তোর বাবার সব কথাও বুঝতাম না।

সুখী বললো, না বোঝার মতো কঠিন কথা বলিনি মা! একটু ভেবে দেখো, কতো দ্রুত বদলে যাচ্ছে সময়। কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে জীবন। তুমি আর আগের মতো কাজ করতে পারো না। অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। আমিও বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন তো ভাতার কথা ভাবতেই হবে, মা।

: ভাবতে তো হবে। কিন্তু ভাবলেই কি কেউ ঘরে এসে ভাতা দিয়ে যাবে?

নিরাশা ঝরিয়ে বললেন মা। জবাবে সুখী বললো, ঘরে এসে ভাতা পৌঁছে দেবে না সত্য, তবে চেষ্টা করলে ভাতার ব্যবস্থা করা যাবে। এ জন্য শুধু বাবার মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটটা লাগবে। ওটা বের করে রেখো মা।

মা বললেন, সার্টিফিকেট থাকলে তো বের করে রাখবো!

: থাকলে তো মানে? থাকবে না কেন? হারিয়ে ফেলেছো?

জিজ্ঞেস করলো সুখী।

মা বললেন, আমি হারাতে যাবো কেন? কখনো ছিলোই না ওটা। হারাবার প্রশ্নই ওঠে না।

: কখনো ছিলো না ওটা মানে? মা প্লিজ ক্লিয়ার করে বলো।

ব্যাকুলতা প্রকাশ পেলো সুখীর কণ্ঠে।

মা বললেন, তোর বাবার কোনো সার্টিফিকেটই ছিলো না। মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটের ওপর কোনো দুর্বলতা ছিলো না তার।

সুখী বিস্মিত হলো মায়ের কথা শুনে– এ কী বলছো মা? মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বাবার দুর্বলতা ছিলো অথচ মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটের ওপর দুর্বলতা ছিলো না– এ কেমন কথা?

মা বললেন, আমিও একই প্রশ্ন করেছিলাম তোর বাবাকে। জবাবে তিনি কী বলেছিলেন জানিস? বলেছিলেন, দেশ আমাকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করেনি। আমার স্বার্থেই আমি দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি। এক স্বাধীন দেশের নাগরিক

www.icsbook.info

হওয়ার দুর্বার সাধ্য ছিলো, সেই তাগিদ থেকে যুদ্ধ করেছি। স্বার্থটা যখন আমার ছিলো, তখন আর দেশের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেবো কোন মুখে?

: আর কী বলতেন বাবা?

: বলতেন, যুদ্ধে আমি পঙ্গু হইনি। শত্রুরা আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়নি। কোনো আপনজনকে হারাতে হয়নি এ যুদ্ধে। বরং এ দেশ আমাকে অনেক দিয়েছে। অন্তত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দেয়ার অধিকার তো দিয়েছে। যে দেশ আমার জন্য এতো কিছু করেছে, সে দেশের কাছে আমি মুক্তিযুদ্ধের বিনিময় দাবি করবো কোন প্রবৃত্তিতে! সার্টিফিকেট নেবো কেন?

: আশ্চর্য! এসব কথা বলতেন বাবা? তুমি কিছু বলতে না?

: কী বলবো? যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলতেন, মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে যাওয়া ছাড়া তখন আর উপায় থাকতো না– আমার ভাষা হারিয়ে যেতো। মনে হতো বারবার এসব কথা তুলে আমি নিজেই নিজেকে ছোট করছি।

: নিজেকে ছোট মনে হতো তোমার?

: হ্যাঁ রে, ছোটই মনে হতো। তোর বাবার মুখে যদি এসব কথা শুনতিস, তাহলে তোরও তাই মনে হতো। জানিস, একদিন মরিয়া হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট করার জন্য বলেছিলাম। বলেছিলাম, সবাই বলছে ভবিষ্যতে মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটের খুব প্রয়োজন হবে। সুযোগ থাকতেও তুমি ওটা করে নিচ্ছো না কেন বুঝতে পারছি না!

বলেছিলে এ কথা?

: হ্যাঁ, বলেছিলাম। শুনে তোর বাবা বলেছিলেন, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনো মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট কেন নিচ্ছি না জানো? আমার বারবার শুধু মনে হয়– এ দেশ আমার মাতৃভূমি। আমার মা। মা বিপদে পড়েছিলো, আমি তাকে সাহায্য করেছি। সেই সাহায্যের বিনিময়ে মায়ের কাছ থেকে স্বীকৃতিপত্র আদায় করে নেবো, এতটাই কি বিবেকহীন আমি? বিপদের সময় মাকে সাহায্য করে তুমি কি পারতে তোমার মায়ের কাছ থেকে স্বীকৃতিপত্র আদায় করে নিতে? কোনো সুসন্তান তা পারে?

: একেবারেই অন্য রকম কথার তো! তুমি কী বলেছিলে?

: আমি? আমি কোনো জবাবই দিতে পারিনি। আসলে এ কথা তোর বাবা এমন করে বলতেন যে, তা শুনতে শুনতে আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। সার্টিফিকেটের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে আর মনেই থাকতো না। মনে থাকলেও আর প্রবৃত্তি হতো না।

www.icsbook.info

সুখী বললো, তুমি ঠিক কথাই বলেছো মা। বাবা যেসব যুক্তি দেখাতেন, তার ওপর কোনো যুক্তি চলে না। কিন্তু সময়টা এমন যে, একটা অবলম্বন ছাড়া মাথা তুলে দাঁড়ানোও যায় না! এ কারণেই সার্টিফিকেটের ভীষণ প্রয়োজন অনুভব করছি, মা। জানো তো সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের জন্য একটা বড় কোটা ধরা আছে। ওটার সুবিধা নেয়া যেতো।

মা বললেন, ওই সুবিধা নেয়াটাকে অনৈতিক কাজ মনে করতেন তোর বাবা। তোর বাবার ধারণা ছিলো এসব সুবিধা ভোগ করার মানে মায়ের রক্ত নিংড়ে নেয়া। দেশের প্রতি যার সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধ আছে, সে তা পারে না।

: বাবার সঙ্গে আমিও একমত মা। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এতোটা বিবেকহীন হওয়া উচিত নয় আমাদের। কিন্তু আমি এখন কী করবো মা?

অসহায় শোনালো সুখীর শেষের কথাটা। মা বললেন, কী আর করবি। অন্য আর দশটা ছেলেমেয়ে যেভাবে চাকরি খুঁজে বেড়ায়, তুই সেভাবে খুঁজে বেড়াবি। এক সময় একটা না একটা কাজ পেয়েই যাবি।

: তা হয়তো পাবো। কিন্তু সে জন্য তো অপেক্ষা করতে হবে।

মা বললেন, আপাতত একটা কাজ করলে পারিস। দু-চারটা ছেলেমেয়েকে পড়ালে পারিস। তোর মিতা ফুফু জানতে চেয়েছিলেন কণাকে তুই পড়াবি কি না। বলেছি তোর সঙ্গে কথা বলে জানাবো

সুখী বললো, তাই? অবাক কাণ্ড তো! কাল গিতাও ওর ভাইকে পড়াবার জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলো। আর মোনা বলেছে ওর বান্ধবীরা আমার কাছে গান শিখতে চাইছে। আমি কাউকে কথা দিইনি।

: কোনো কথা দিসনি কেন?

মেয়ের এই অপরিপক্বতায় একটু অখুশিই হলেন মা। জবাবে সুখী বললো, কী করে কথা দিই? তোমার কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে কাউকে কথা দেবো, এতই কী অবাধ্য আমি?

সুখীকে কাছে টেনে নিয়ে মা বললেন না, একেবারেই না। তুমি আমার বাধ্য মেয়ে। আমার লক্ষ্মী মেয়ে।

সুখী কণ্ঠে কৃত্রিম অভিমান মিশিয়ে বললো, শুধু বাধ্য মেয়ে? শুধু লক্ষ্মী মেয়ে? না মা, বলো মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে। বলো মা, বলো ...

মা বললেন, হ্যাঁ, তুই এক মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে।

www.icsbook.info

বিড়াল তপস্বী মিলি

সোলায়মান আহসান

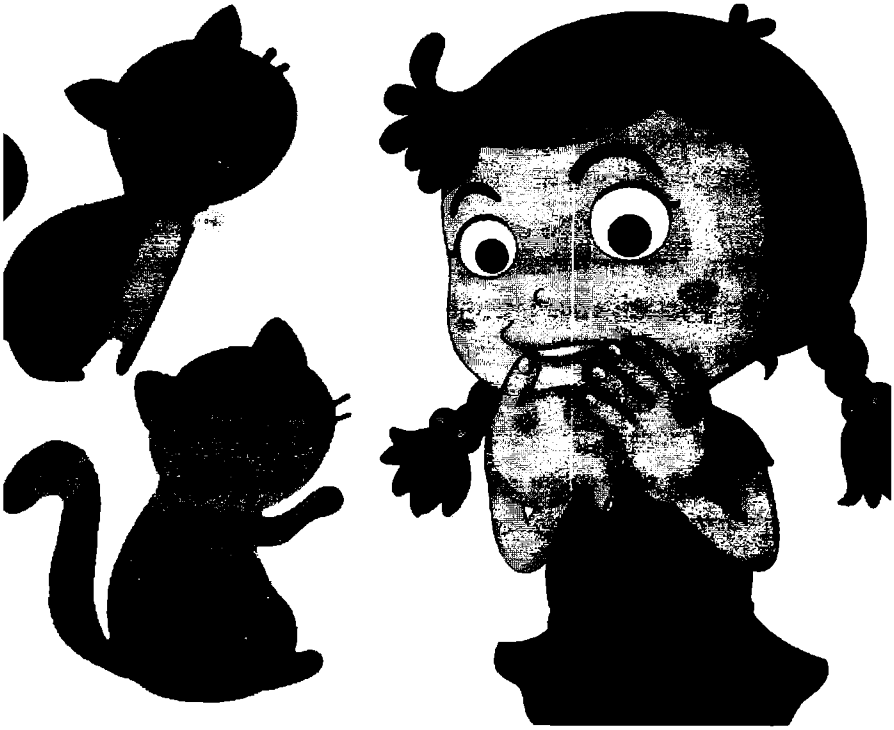

মিলির সঙ্গে বিড়ালের ভাবটা সেই ছোট্টটি থেকে। একটা ছবি তার প্রমাণ দেয়। মিলির যখন বয়স সাত কি আট মাস, তখনকার ঘটনা। মিলির নানুবাড়ি তাদের বাসা থেকে খুব কাছেই। মিলির আম্মু রানু তখনো ছাত্রী। তাই, মিলিকে নানু বাড়ি রেখে রানু প্রায়ই ভার্সিটিতে যায়। মিলি সে সময়টুকু নানু-খালাদের কাছেই থাকতো। একদিন দু'দিন নয় বেশ অনেকদিন ধরেই বিষয়টা চোখে পড়ে সবার। একটা ছাইরঙা বিড়ালের সঙ্গে মিলির ভাব জমে ওঠে। মিলি যখন মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়, বিড়ালটা 'মিউ' বলে কাছে আসে তার। মিলিও ভয় পায় না বিড়ালটাকে। বরং ছোট্ট হাত দিয়ে বিড়ালের গায়ে হাত রাখে। একদিন মিলির সেঝ খালা

www.icsbook.info

মিনু এক অপূর্ব দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করে ফেলে। ছবিটা এমন- মিলি আর বিড়ালটা কাছাকাছি যেন পরস্পর কথা বলছে। মিলির আব্বু সাংবাদিক। তিনি পত্রিকার ছোটদের পাতায় ছেপে দিলেন একটা ক্যাপশন দিয়ে- বন্ধুত্ব। সেই ছবি মিলিকে সাংবাদিক মহলে পরিচিত করে দিলো। দেলওয়ার সাংবাদিক বন্ধুদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন- কি আপনার বিড়ালপ্রেমিক মেয়ের খবর কী। বাধ্য হতেন বিড়ালপ্রেমিক মেয়ে মিলির খবর দিতে।

সেই মিলি দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়েছে। এসএসসি পরীক্ষা দেবে। এর মধ্যে আরেক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে সে। মিলিকে ওর বন্ধুরা এখন বিড়ালপ্রেমিক নয় 'বিড়াল তপস্বী' বলে ডাকে। বিড়াল নিয়ে মিলি কাণ্ড কম ঘটায়নি। একবার বৃষ্টির দিনে স্কুল থেকে ফেরার পথে গলিপথের মোড়ে বৃষ্টিভেজা ছোট্ট বিড়ালছানা নিয়ে এলো মিলি। একেত খুব ছোট্ট তাতে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে বিড়ালছানার অবস্থা খুব নাজুক। মিলির আম্মু-আব্বু, বোনেরা, ভাইয়া জিশান সবারই খুব মায়া হলো। যেভাবেই হোক বিড়ালটাকে বাঁচাতেই হবে। সবাই করল পণ। মিলির ভাইয়া নিয়ে এলো দোকান থেকে মিল্কভিটা দুধ। যে দুধ নিয়ে প্রায়ই ভাইবোনে কাড়াকাড়ি করে আজ বিড়াল ছানার জন্য তারাই দুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলো।

বিড়াল ছানার বসবাসের জন্য বড় সাইজের জুতার বাক্সটা আব্বু দিয়ে দিলেন। জুতোতে ধুলোবালি পড়ুক বিড়াল ছানা তবু বাঁচুক, এমন উদার হলেন আব্বু। পড়াশোনা রেখে বিড়াল ছানার সেবা করাটাও বেশ কয়েকদিন অগোচরে অনুমতি পেলো। বিশেষ করে এ ব্যাপারে মিলির থাকল শিথিল শাসন। মাঝে মধ্যে আম্মু বলেন- মিলি পড়াশোনা রেখে এসব কী হচ্ছে? মিলির নরম গলায় জবাব- পড়া করে এসেছি আম্মু! পড়াশোনায় মিলি বেশ ভালো। মিরপুরের নামকরা স্কুলে পড়ে সে। সেকসন এ-তে। রোল এক দুই তিনের মধ্যেই থাকে। তাই, মিলির পড়া নিয়ে তেমন কেউ অভিযোগ করে না। অভিযোগ বিড়াল নিয়ে বাড়াবাড়ি করার। সেই বিড়ালের কাহিনী গড়ায় অনেক দূর। জিশানের পশুর ডাক্তার খুঁজে বের করা। ঔষুধ-পত্র যত্ন-আত্তি করে বিড়াল ছানার জীবন বাঁচিয়ে দেয়ার কৃতিত্ব শুধু মিলির নয়- ভাইয়া জিশান, ছোট বোন পুটুরানি, বড় আপু কেয়া এবং আম্মু-আব্বুরও কম কিসে! বিড়ালছানাটা শুধুই বেঁচেই গেলো না। ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলো। মিলি শ্যাম্পু দিয়ে গা ধোয়ায়। নিজের মধু মাছ খাওয়ায়, বিছানায় নিয়ে শোয়ায় যা সবার চোখে আপত্তিকর ঠেকে। বিরক্ত হয়ে ওঠে মিলির বিড়াল নিয়ে

www.icsbook.info

আদিখ্যেপনায় একে একে সবাই। কিন্তু মিলিকে বিরত করা যায় না। আব্বু একদিন মিলিকে ডেকে বললেন– অনেক হয়েছে এবার বিড়ালটা বিদায় করে নিজের চরকায় তেল দাও! পড়াশোনায় মন লাগাও! মিলি মিন মিন স্বরে বলে– আব্বু পড়াশোনা করছি তো!

নাহ মিলিকে বিড়াল থেকে আলাদা করা গেল না। এর মধ্যে বিড়ালটা একটা ইঁদুর মেরে দেখাল সে শুধু খাওয়ার গোসাই না, কম্মেরও গোসাই। পেয়ে গেল মিলি যুৎসই পয়েন্ট। নিচ তলার বাসা। দু'একটা ইঁদুরের আনাগোনা থাকেই। রান্নাঘরে ইঁদুরের উপস্থিতি টের পেয়েছে কাজের বুয়া বাতাসীর মা আরো আগে। কথাটা মিলির আম্মুর কানেও তুলেছে দু-একদিন। বলেছে ইঁদুর মারার ঔষুধ নাকি এনে দেবেন। ঐ বলা পর্যন্তই। এবার বিড়ালের হাতে ইঁদুর নিধনের ঘটনা–বিড়ালের উপস্থিতিকে যুক্তিসঙ্গত করল আর কি! থাকুক বিড়ালটা। ইঁদুরের জ্বালাতন থেকে বাঁচা যাবে! বলল আম্মু। যথারীতি আব্বুও সায় দিলো। পাকা হয়ে গেল বিড়ালের থাকার বিষয়।

এভাবে বিড়ালটা বেশ বড় হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে একদিন মিলির আম্মুর চোখেই পড়ল বিষয়টা– বিড়ালটা গর্ভিণী। হায় হায় মনে মনে প্রমাদ গুনলেন রানু। তাহলেতো বাড়ি-ঘর ভরে যাবে বিড়ালে। মিলির আব্বুর সঙ্গে শলাপরামর্শ করেন বিষয়টা নিয়ে।

মিলির আব্বুও কম যান না। রসিকতা করতে ছাড়লেন না– ভালই হবে তুমি নানু হয়ে যাবে। হাসাহাসি হলো দু'জনে। অবশেষে দেলওয়ার মত দিলেন– দূরে কোথাও বিড়ালটাকে রেখে আসতে হবে। মিলি যাতে টের না পায়। কিন্তু অমন নিষ্ঠুর কাজটা করবে কে! মিলির আব্বুতো একটা মুরগি জবেহ করতে পারে না। এ নিষ্ঠুর কাজে এমনিতেই দিয়েছে মৃদু সম্মতি। দারোয়ান কিংবা চেনাজানা মানুষকে দিয়ে কাজটা করালে ফাঁস হয়ে যেতে পারে। মিলি জানতে পারলে যাচ্ছে তাই কাণ্ড বাধতে পারে। এমনিতে মেয়ের রাগ অভিমান খুব বেশি।

এই সমস্যার কথা বাসার কাছে মুদি দোকানি শাহীনকে বলে ফেলেন দেলওয়ার। শাহীন দেলওয়ারকে বেশ সম্মান করে। সাংবাদিক হিসেবে তো বটেই মাসের চাল-ডাল, মসলা-পাতি ইত্যাদি ওর দোকান থেকেই যায়। একটা স্লিপ ফেলে যেতে পারলেই হলো। দোকানের পিচ্চি কর্মচারী মিলন তা যথাসময় বাসায় পৌছে দেয়। সেই শাহীন দেলওয়ারকে আশ্বস্ত করে।

www.icsbook.info

ভাইজান, এর একটা বিহিত করুমনে, চিন্তা কইরেন না। কিভাবে? দেলওয়ার জানতে চায়।

বাইজান, আমার মিলনই পারবে। একটা বস্তায় পুরে ফেলে আসবে দূরে। শাহীন হাসে।

দেলওয়ার খুশি হয়ে বাসায় এসে রানুকে জানাল। শাহীন নিয়েছে বিড়ালটা ফেলে আসার দায়িত্ব। শুনেই রানুর চোখ দিয়ে পানি এসে গেল।

দেলওয়ার তা দেখে তার মনটাও মোচড় দিয়ে উঠল। বেশ অনেকদিন হল বিড়ালটা এ পরিবারে আছে। পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে যেন। সেই পুঁচকে থেকে বছর ঘুরে এলো বিড়ালটা আছে বাসায়। মিলির প্রিয় সাথী বিড়ালটা। মিলির জন্য ভেবে দেলওয়ারের মনটা আরো ভিজে গেল। কেন বিড়ালটা গর্ভিণী হতে গেল।

দেলওয়ার আবার জানতে চায় রানুর কাছে– বিড়ালটার পেটে বাচ্চা আছে তুমি কি নিশ্চিত?

রানু চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল– আমি তো চার চারটে বাচ্চার মা হয়েছি বুঝব না?

তাহলে সাত-পাঁচ ভেবে কি হবে, ওটাকে শাহীনের হাওলায় দিয়ে দিতেই হবে। মনটা শক্ত কর রানু। কত মানুষ কতভাবে মরছে যে দেশে, একটা বিড়ালকে নিয়ে এত দয়ালু হয়ে কাজ নেই আমাদের। পরে পস্তাতে হবে।

সবাই যখন স্কুল-কলেজে এক দুপুরে শাহীনের দোকানের কর্মচারী বালক মিলন এলো একটা সিনথেটিক সাদা রঙের বস্তা নিয়ে। বাসায় দেলওয়ারও নেই। রানুর ওপর পড়ল ওই নিষ্ঠুর কাজটা। ছাড়া বিড়াল। বাসায় সবসময় থাকে না। মিলি এলে কোত্থেকে এসে তৎক্ষণাৎ হাজির। নরম স্বরের ডাক মিঁউ...। মিলি ব্যস্ত হয়ে পড়বে খাবার দিতে।

মিলনের হাতে সিনথেটিক বস্তা দেখে ক্ষেপে গেলেন রানু। এই ছেলে, সিনথেটিক বস্তা কেন, ওতে বাতাস ঢুকতে পারবে? পাটের বস্তা আন! নতুন এবং পরিষ্কার।

অগত্যা ছেলেটি ফিরে যায় পাটের বস্তা আনতে। শাহীন তা শুনে হাসতে হাসতে খুন। বিড়ালের জন্য মায়া কত! অবশেষে সেই বিড়ালকে তুলে দেয়া হলো মিলনের হাতে। কাজটা করার জন্য যাতায়াত বাবদ একশ এবং কাজের বখশিশ একশ মোট দু'শো টাকা গুঁজে দেয় রানু মিলনের বুক পকেটে।

www.icsbook.info

মিলি স্কুল থেকে এসে ডাকাডাকি শুরু করে বিড়ালকে। ভাই-বোনরা মিলে বিড়ালটার নাম দিয়েছিল লেডি মার্জার। ডাকতে থাকে–মার্জার... মার্জার.... মার্জার...। কিন্তু না বিড়াল আর আসে না। মিলিকে বলা হলো হয়তো কোথায় গেছে এসে পড়বে। একটা কালো হুলোর গতিবিধি ভালো ছিল না। মিলির বিড়ালটা সবসময়ে ভয়ে কাতর থাকত ওই হুলোর জন্য। তা ছাড়া কুকুর বড় হিংস্র প্রাণী। এ পাড়ায় কুকুরের উপদ্রবও কম না। কুকুরের দ্বারাও কিছু ঘটতে পারে। এসব নানা কথা বলে মিলিকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন রানু এবং ভাই-বোনেরা। মিলি তাতে বিড়ালের শোক ভুলতে পারে না। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে উদাস হয়ে বসে থাকে ছাদে।

সারাটা দুপুর বিকেল ছাদে মিলি বসে থাকল। খাবার খেলো না। রানু অস্থির হয়ে পড়লেন। পাশের বাসার সমবয়সী চৈতিকে ডেকে আনা হলো মিলিকে ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য। চৈতি ব্যর্থ। চৈতির আম্মু রিনা আন্টিও ব্যর্থ। বাকি আছে মিলির আব্বু। তার আসার কথা রাতে। তার মানে রাত অবধি মেয়ে ছাদে থাকবে! হেমন্তকাল। শীত পড়তে শুরু করে বিকেল থেকে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে না মেয়েটার? রানুর দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে।

ভাগ্য হলো সুপ্রসন্ন। দেলওয়ার সেদিন সন্ধ্যার একটু আগেই এসে হাজির। ঘটনা জেনে সোজা ছাদে দেলওয়ার। আদর করে কাছে টেনে দেলওয়ার বললেন– মামনি, বিড়াল তো ভালো প্রাণী না, তোমাকে সাদা ধবধবে খরগোশ এনে দেবো একজোড়া। খরগোশ দেখতে যেমন সুন্দর স্বভাবও খুব পরিপাটি। মিলির শোক খানিকটা কমলো। ছাদ থেকে নেমে এলো। পরে মিলির পছন্দ গিয়ে ঠেকে টিয়া পাখিতে। দেলওয়ার এক জোড়া টিয়া এনে দেন দিন সাতেকের মধ্যে। কিন্তু মিলির বিড়ালপ্রীতি তাতে গেলই না।

হঠাৎ সেদিন মিলি খাঁচায় দু'টো বিড়াল ছানা এনে হাজির। সঙ্গে তার বন্ধু তমা। তমা আসার কারণ এই বিড়াল দুটো সম্পর্কে বিস্তারিত আম্মুকে জানাবে। এই বিড়াল সাধারণ বিড়াল নয় সে বিষয়টা বুঝিয়ে দেবে।

তমা গিয়ে রানুকে বোঝাল তার সারমর্ম হলো : ওরা একটা সোসাইটির মেম্বার হয়েছে। যারা বিড়ালকে পছন্দ করে, পালে এবং বিড়াল জাতির সেবা করতে আগ্রহী, নাম-বাংলাদেশ ক্যাটস সোসাইটি। এরা উন্নতজাতের বিদেশী বিড়াল সংগ্রহ করে এবং যারা পালতে আগ্রহী তাদেরকে বিনে পয়সায় দেয়। তবে শর্ত হলো– এদেরকে লালন-পালনের জন্য যে ম্যানুয়েল

www.icsbook.info

দেয়া হবে সেটা অনুসরণ করতে হবে। দেশী বিড়ালের সঙ্গে মিশতে দেয়া যাবে না। যদি কেউ বদলি জনিত কিংবা অন্য কোনো কারণে পালতে আগ্রহী না হয়, সেক্ষেত্রে সোসাইটিকে জানাতে হবে। সোসাইটি তার হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেবে। সেক্ষেত্রে পেনালটি গুনতে হবে দশ হাজার টাকা।

সবটা শুনে রানুর চোখ চড়ক গাছ। সামনেই মিলির এসএসসি ফাইনাল। বিড়াল নিয়ে আবার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল? অবশ্য মানতেই হবে। খাঁচার ভেতর থাকা দু'টো বিদেশী তুলতুলে বিড়াল ছানা সত্যিই অপূর্ব সুন্দর! চোখ জোড়া কেমন মায়াবী! রানুর দিকে তাকিয়ে বলছিল–আমাদের বিদায় করো না। আর বিদায় করা কি সম্ভব! মিলি যখন নিয়েই এসেছে তার পছন্দের ভেতর হাত দেবে কে!

মুখে বলল তমাকে– ঠিক আছে, তুমি মাঝে মাঝে এসো। বিড়াল দু'টোকে দেখে যেয়ো। যা যা লাগে দিয়ে যেয়ো। আমিতো আসবই আন্টি, মিলিকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে না! আর হ্যাঁ আন্টি, বিড়াল দু'টোকে ইনজেকশন দেয়া। কোন চিন্তা করবেন না। ভাইরাস ছড়ানোর ভয় নেই একদম।

আমরা প্রতি বছর এক্সিবিশন করি। প্রাইজ দেই। মিলির বিড়ালটাও যাবে এক্সিবিশনে। তখন অনেক প্রচার হবে মিলির। যদি প্রাইজ পায় টাকা এবং ট্রফি দু'টোই পাবে।

দেলওয়ার রাতে বাসায় ফিরে। বারান্দায় তার যাওয়া পড়ে কদাচিৎ। সেদিন গোসল করবে গামছার খোঁজে বারান্দায় গেল। বারান্দার লাইট জ্বেলেই দেখল একটা খাঁচা। খাঁচার ভেতর দু'টো বিড়াল ছানা। ধবধবে সাদা একটা। আরেকটা ছাই রঙ মেশানো। বুঝতে বাকি থাকল না এ মিলির কাজ। মেজাজ চড়ে গেল। ছুটে এলো রানুর কাছে। রান্নাঘরে রানু তখন। দেলওয়ারের খাবার দিচ্ছিল গরম করে।

আবার বিড়াল এনেছে মিলি? দেলওয়ার উত্তেজিত স্বরে বলল। ওগুলো বিদেশী বিড়াল, কোন রোগ ছড়ায় না–

খাঁচার মধ্যে বিড়াল পোষা যায়? এখন আমরা থাকি চারতলায়। ছোট্ট ফ্ল্যাট। এরকম ফ্ল্যাটে কেউ বিড়াল পোষে?

তুমি গোসল সেরে খাও, পরে সব বলছি। ওগুলো নিয়ে যাবে। রানু দেলওয়ারকে তখনকার মত নিবৃত্ত করলেন।

তারপরের ঘটনা বিড়াল দু'টোকে বাসা থেকে স্থানান্তর করা হলো ছাদে। রোদ থেকে বাঁচার জন্য এক সময় পায়রা পোষা হতো ছোট একটা ঘর আছে

www.icsbook.info

সেখানে রাখা হলো ওদের। পুটু জিশান কেয়াপু সবাই প্রথম প্রথম বিড়ালের সেবক বনে গেল। বিড়ালের খাবারের মেনু রাজসিক। রাজসিক তো বটেই। দু'বেলা মাছ। চাট্টিখানি কথা। মানুষেরই জোটে না মাছ। তাও শোল মাছ। মরা পচা খাবে না। তাজা মাছ ফ্রাই করে দিতে হবে। গরুর দুধ। প্রতিদিন হাফ লিটার। জোগান দিতে গিয়ে সবার পাতের মাছ হাওয়া। ফ্রিজ থেকে মাছের পোঁটলা হাওয়া। দুধের প্যাকেট হাওয়া। তাতেও কুলোয় না। চৈতিদের বাসা। এছাড়া বিড়ালের প্যাটেন্ট খাবার আছে তাও দাম দিয়ে কিনে আনে মিলি। টাকা দেন আম্মু। কি করবেন না দিলে কান্নাকাটি। স্ট্রাইক পড়া বন্ধ। এভাবে বিড়াল দুটো বেশ বড় হয়ে ওঠে। আশপাশের ছেলে-মেয়েরা আসে দেখতে। এখন আর খাঁচায় সব সময় রাখা হয় না। ছাড়া হয় ঘরের মধ্যেই। ভীষণ দুষ্টু বিড়াল দুটো। ছোটাছুটি করে। এভাবে ছুটোছুটি করতে গিয়ে সেদিন ড্রয়িং রুমের চাইনিজ ফ্লাওয়ার ভাসটা ভেঙে ফেলে। ফ্লাওয়ার ভাসটা ছিল আব্বুর পছন্দের। ক্রিস্টাল কাচের। সেদিন মিলির বিড়ালের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। দেলওয়ার সোজা বলে দিয়েছিল– বাসায় বিড়াল পোষা যাবে না। রানু কানে কানে বলল তমাকে ডেকে বিদায় করার ব্যবস্থা নেবে। বেশি চটপট করলে পড়াশোনা বন্ধ করে দেবে। পরীক্ষা সামনে।

তমাকে ডাকা হলো। তমা এলো। রানু বুঝিয়ে বলল এমন ছোট্ট বাসায় বিড়াল পোষা সম্ভব নয়। তমা যেন একটা ব্যবস্থা করে। প্যানাল্টির টাকা দিলে সে ব্যবস্থা করতে পারবে। কারণ ও দুটো বিড়ালের ক্রয়মূল্য নাকি দশ হাজার টাকা। রানু গেল চুপসে। এতগুলো টাকা দেয়া কি সম্ভব! তাহলে আরো কিছুদিন থাকুক। ভালো গ্রাহক পেলে হস্তান্তর করে দেবে। ফেসবুকে ছবিসহ বিজ্ঞাপন দেয়া হলো। একদিনের মধ্যে পাঁচজন আগ্রহী ফেসবুকে আগ্রহ দেখালো নেয়ার। কিন্তু মিলি রাজি নয় হাতছাড়া করতে। অগত্যা তমার কিছু করার নেই। রানুও আর তমাকে কিছু বলল না। মনে মনে বললেন– তুমিই নষ্টের মূল। বিড়াল তপস্বী সেজেছো?

বিড়াল দুটোকে ছাদেই রাখা হয় বেশির ভাগ সময়। মিলিও থাকে ছাদে। বই হাতে মোড়ায় বসে ছাদে পড়ে। বিড়াল পাহারা দেয়। খাবার দেয়। পুটুও মিলির সহকারী হয়ে ওসব করে। যাচ্ছিল দিন কেটে ভালোই।

হঠাৎ একদিন দুপুরে মিলি ছাদে উঠে দেখে বিড়াল দুটো নেই। খাঁচার দরোজা খোলা। তালাটা ভাঙা খাঁচার পাশে পড়ে। মিলি কাঁদতে কাঁদতে

www.icsbook.info

বাসায় ছুটে এলো। হ্যা... হ্যা... হ্যা... আমার বিড়াল চুরি গেছে... হ্যা... হ্যা... হ্যা... যে যেখানে ছিল দৌড়ে ছাদে উঠে এলো। সত্যিই বিড়াল নেই। খাঁচার তালা ভাঙা। তার মানে চুরি। তমা এলো ছুটে। বলল– থানায় জিডি করতে। রেজিস্টার্ড বিড়াল। ওদের ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক আছে। পুলিশ জিডি করতে বাধ্য। ইত্যাদি ইত্যাদি।

রানুর চোখেও পানি। পুটুও কাঁদছে। আর মিলি বিছানায় উপুড় হয়ে আছে সেই থেকে।

জিশান বলল– তমা, পুলিশ মানুষ খুঁজে বের করে না, আর বিড়াল খুঁজে বের করবে? এটা কি ইউরোপ?

রানুও বুঝতে পারে তমার কথা ঠিক না। কিন্তু বিড়াল দুটো চুরি করলো কে?

দেলওয়ারকে ফোনে জানিয়েছিল রানু। বিড়াল গেছে সে জন্য তার দুঃখ নেই মিলিকে কিভাবে শোক ভুলিয়ে দেয়া যায় সে কথা ভেবেই অস্থির হলেন তিনি।

চিন্তিত দেখে দেলওয়ারের এক কলিগ সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন– দিলু ভাই, কি চিন্তা করছেন? দেলওয়ার খুলে বলল।

হাসতে হাসতে বললেন– ও আপনার সেই বিড়াল তপস্বী মেয়ের বিড়াল চুরি গেছে? আমি একটি ফিচার করতে চেয়েছিলাম ওকে নিয়ে। চলুন, আজই সে কাজটা করে ফেলি। ফিচার নয় নিউজ। বিড়াল চুরির চাঞ্চল্য নিউজ।

যাবে? দেলওয়ার প্রশ্ন করে কাঞ্চনকে।

কিভাবে খাওয়াতে হয় পাবলিককে কুড়ি বছর সাংবাদিকতায় কম শিখিনি দিলু ভাই। হা... হা... হা... হা...

সাংবাদিক এসেছে শুনে মিলির দুঃখ মুহূর্তে উঠে গেল। ড্রয়িং রুমে এসে লক্ষ্মীমন্ত হয়ে প্রশ্নের জবাব দিলো কাঞ্চনকে। পরের দিনের পরদিন ছাপা হলো বিশাল নিউজ– সংঘবদ্ধ চক্রের দেশ থেকে বিড়াল চুরি করে পাচার। সোসাইটির কথা, বিড়াল পোষার আগ্রহীদের কথা, শীত অঞ্চল থেকে বিড়াল আনার ইতিহাস ইত্যাদি বর্ণনাসহ। নিউজের সঙ্গে মিলির ছবি এবং সাক্ষাৎকার। সেই থেকে মিলির বিড়াল তপস্বী নামটা চাউর হয়ে গেল। মিলি কিন্তু এখনো বিড়ালের সেবা করে বেড়ায়। কিভাবে? ফেসবুকে পাওয়া যাবে।

www.icsbook.info

সেই বৈশাখে

মোশাররফ হোসেন খান

সেও তো অনেক বছর আগের কথা। অথচ মনে হচ্ছে এইতো সেদিনের ঘটনা। ভাইয়াটা বরাবরই এমনি। খুব জেদি। একবার যদি বলে কাজটা করবো, তো আর ঠেকায় কে। সেবার তার নিজের জন্য কী ভয়ঙ্কর কাণ্ডই না ঘটে গেল।

সময়টা ছিল বৈশাখ। দিনে ঝাঁঝালো গরম। মাঠের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শাঁ শাঁ করে ঘামছে মানুষ। গরমের চোটে ছাগল-গরুও গাছের ছায়ায় বসে কেবল হাঁপাচ্ছে।

দুপুরের দিকে সূর্যের তাপ আরও বেড়ে যায়। তখন ঘরের টিন আর গরম বলক ওঠা ভাতের হাঁড়ির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না।

www.icsbook.info

যাদের মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল-তাদের তবুও কিছুটা আরাম আছে। অন্তত ঘর-বারান্দায় তিষ্টিতে পারে। টালি বা টিনের ছাউনি হলে কি আর রক্ষে আছে!

বৈশাখের গরমকালের এই সময়ে স্কুল বন্ধ। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ানোর এইতো মোক্ষম সময়। কিন্তু তা হওয়ার উপায় নেই। আব্বার কড়া নিষেধ, রোদে ঘুরে বেড়ানো যাবে না।

আব্বার নিষেধ বলে কথা। কি আর করা। তাই বলে তো আর আম বাগানের হাতছানি উপেক্ষা করা যায় না। প্রবল বাতাসে টপাটপ ঝরে পড়া টক-মিঠে আম আর নুনের স্বাদ থেকে জিহবাকে বিরত রাখা সহজ কাজ নয়। আমি তো বুদ্ধির ঢেঁকি। ধরনা দিলাম ভাইয়ার কাছে।

তো উপায় একটা বেরিয়ে গেল। ভাইয়া আব্বাকে বুঝালেন। বললেন, আমতলায় গরুর গাড়ি নিয়ে তার ওপর বসে দুই ভাই অংক করবো। তাহলে গরমের কষ্টও থাকবে না। কারণ বৈশাখে যে বাতাস বয় তাতে করে আম বাগানে এক ধরনের আরাম পাওয়া যায়।

আব্বা বারান্দায় শুয়ে শুয়ে তালের পাখার বাতাস খাচ্ছেন আর বই পড়ছেন। তিনি এ সময়ে কোনো রকমের বিরক্তি পছন্দ করনে না। পড়ার সময়টায় এক মনে পড়তে চান। বললেন, ঠিক আছে যাও। তবে সাবধান আম গাছে উঠবে না।

আব্বার অনুমতি পেয়ে আমরা খুশিতে আটখান। বহুদিন পর এই দুর্লভ সুযোগটুকু পাওয়া গেল। আজ আর তার পাশে শুয়ে দুপুরে নাক ডেকে ঘুমুতে হবে না।

দুই ভাই গাড়িটা টেনে নিয়ে আম গাছের ছোট একটা ফাঁকের মধ্যে তার মাথাটা গুঁজে দিলাম। এখন আর উঁচু-নিচু নেই। হাতের অংকের খাতা-কলম পাশে রেখে দুই ভাই বসে গেলাম গাড়ির ওপর। ভারি মজা লাগছে। কী যে বাতাস, তার ওপর ঘন পাতার ফাঁকে পাখির কলরব। বাঁশবাগান থেকে মাঝে মাঝে কানে আসছে কোকিলের ডাক।

আম বাগানের পুবে একটি পুকুর আছে। সেখানে কেউ গোসল করে না। তেমন একটা যাতায়াতও করে না। উঁচু ঢিবি।

পাড়ের চার পাশে লম্বা খোঁয়াড়। গাছ-গাছালিও বেশ। কয়েকটা পুরনো বেলগাছও আছে। পুকুর থেকে দু'একটা মাছরাঙা ঝুপ করে পড়ে মাছ ধরেই আবার উঠে বসছে পাড়ের বাবলা গাছের ডালে। এখান থেকে সবই দেখা

www.icsbook.info

যাচ্ছে। আমার চোখ সেই দিকে।

ভাইয়া আমাকে কনুইয়ের গুঁতা দিয়ে বললো, এই হাঁ করে পুকুরের দিকে তাকিয়ে আছিস কেন, যা-না, গাছতলা থেকে কিছু আম কুড়িয়ে আন।

কাঁচা আমের কথা শুনলে কার না জিভে পানি আসে! সত্যি সত্যি লোভটা চনমন করে উঠলো। গাড়ি থেকে নেমে এগাছ-ওসাছ করে বেশ কিছু আম কুড়িয়ে গাড়ির ওপর এসে বসলাম।

ভাইয়ার মাথায় ঘিলু আছে। সে আম দেখেই কোমরের লুঙ্গির গিঁট থেকে অমনি বার করলো শুকনো ঝাল মেশানো লবণ আর দুটো ঝিনুকের একটা করে অংশ। ঝিনুকের ওপরের পিঠটা ঘষে ঘষে মাঝখানে ফাঁক করেছে। এটা এখন ছুরির কাজ করবে। আমের গায়ে ঝিনুকের ঘষা লাগলেই আম ছুলা যাবে। ভাইয়ার হাতটা মেশিনের মত চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ কিছু আম ছুলা শেষ। এবার ঝাল লবণের গুঁড়া লাগানো আর খাওয়ার পালা। কাজের বেলায় এক আধটু ফাঁকি দিলেও খাবার বেলায় কে-না ঠিক থাকে! বেশ খাচ্ছি। খাচ্ছি আর গুনগুন করে গান গাচ্ছি সেসব গানের কেবল সুর আছে, কথা নেই। ভাইয়ার চোখ দুটো আমতলায়। একটু জোরে বাতাস হলো তো তার ধড়ফড়ানি বাড়লো। কী যে আবেগ! এই যা-না। দেখ ঠিকই এই বাতাসে আম পড়েছে। তাকে বুঝানোই মুশকিল যে কাঁচা আম অত পড়ে না। বাতাস তো দূরে থাক, ঝড়েও সে কেমন বোঁটা আটকে থাকে।

ভাইয়ার দিকে আমার খেয়াল নেই। আমি তাকিয়ে আছি পুবের দিকে। তারপরেই বিশাল মাঠ। মাঠের মধ্যে রোদটা ঝাঁ-ঝাঁ করে নাচছে। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো একটা ঘুড়ি বাতাসে ডিগবাজি খেতে খেতে উড়ে আসছে। আসছে, আসছে... এবং তারপরই আটকে গেল পুকুর পাড়ের সেই পুরনো বেলগাছের মটকায়। আর সাথে সাথেই আমি চিৎকার করে উঠলাম, ঘুড়ি! ঘুড়ি!!...

ঘুড়ির কথা শুনেই ভাইয়া লাফ দিয়ে উঠলো, কইরে! তাকে দেখিয়ে দিলাম বেলগাছটি। সেও দেখলো। সত্যিই ঘুড়িটা কাত হয়ে বেঁধে আছে। তার ভোগের সুতার কিছুটা অংশও ঝুলে আছে লেজের মত।

দুই ভাই ছুটে গেলাম বেল গাছটির কাছে। আহ কী যে বড় ঘুড়ি! বাঁশপাতা কাগজে তৈরি। ঘুড়ির মাথায় আবার বেতের পাতলা অংশ বাঁধা। যাতে বাতাসে বাজে। দারুণ যত্নে কেউ যে এটা তৈরি করেছে। হয়তো বা পাল্লা দিচ্ছিল। কিন্তু বাতাসে কেটে গেছে। কোথা থেকে উড়ে এল এটা!

www.icsbook.info

হদিস বুঝার জন্য আমি ফাঁকা মাঠে গিয়ে চারপাশে তাকালাম। নিশ্চয়ই এর আশ-পাশের আরও দু'একটা ঘুড়ি উড়ছে। কেউ কেউ আবার এ ধরনের বড় সৌখিন ঘুড়ি মাঠে উড়িয়ে তারপর সেইভাবে কৌশলে টেনে আনে বাড়িতে। তারপর উঠোনের সেই খুঁটিতে বেঁধে রাখে। দিন ও রাতভর ওড়ে ঘুড়ি, যতক্ষণ না নামায়। ওড়ে আর ঘুড়ির বেত বাজে। সে যেন তার আমিত্ব আর আভিজাত্যকেই জানান দিয়ে যায়।

অনেক খুঁজলাম। না, কোথাও আর ঘুড়ি পেলাম না। পাশের মাঠেও নেই। নগরের মধ্যে দু-একটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওখান থেকে উল্টো বাতাসে কেটে এখানে আসবে কেমন করে?

ভাইয়া বললো, বাদ দে ওসব খোঁজাখুঁজি। তুই দাঁড়া, আমি গাছে উঠছি। নামিয়ে নিয়ে আসি।

তার কথা বলাও শেষ, কাছা দেয়াও শেষ। ব্যাস! তরতর করে উঠে গেল বেলগাছে। বেলের কাঁটা বড় শক্ত কাঁটা। একবার বিঁধলে খবর হয়ে যায়। ভাইয়ার কিআর সে খেয়াল আছে? বললাম সাবধান, কাঁটা দেখিস।

ভাইয়া কাঠবিড়ালির মত দ্রুতগতিতে উঠে সেই মগডাল থেকে আস্তে করে নামিয়ে দিল ঘুড়িটা। এদিক-সেদিক টাল খেতে খেতে সেটা চষা ক্ষেতে বড় ডেলার ওপর কাত হয়ে পড়লো। গাছে লটকে না ছিঁড়লেও এবার ডেলায় একটু ফুটো হয়ে গেল। আহ কী বড়ঘুড়ি! যাকনা ফুটো হয়ে, তবুও বড় ঘুড়ি তো। বহুদিনের স্বপ্ন ছিল এমন ঘুড়ির।

পরম যত্নের ধন আমি ঘুড়িটা উঠিয়ে মহা খুশিতে ভাইয়ার দিকে তাকালাম। বললাম, ভাইয়া! তোর ডান পাশের ডালে দেখ একটা পাকা বেল। পেড়ে দে তো!

বললেই তো আর হয় না। বেল বলে কথা। আম হলেও হতো। দু-একটা ঝাঁকি দিলে। পড়ে যেত। কিন্তু বেলের ডালটা বাঁকিয়ে এনে ওটা ছিঁড়তে চাইলো। ডালটা ধনুকের মত কিছুটা বাঁকা হলো বটে, কিন্তু বেলটা ধরার আগেই টাল সামলাতে না পেরে ভাইয়া কুপোকাত। ধপাস করে শব্দ হতেই আমার বেহুঁশ হবার যোগাড়। ভাইয়া একটা দম নিয়ে বললো, তোর জন্যই এই ঝামেলা! ইসরে, আমার কোমরে লেগেছে।

আমি ছুটে ভাইয়াকে ধরে উঠালাম। ভাগ্য ভালো বেশি উঁচু থেকে পড়েনি। ভাইয়ার গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিয়ে বললাম, চল, বেলের আর দরকার নেই। জানতো বাঁচলো।

www.icsbook.info

কে শোনে কার কথা। ভাইয়ার জিদ। সে লুঙ্গিটা পরে নিল শক্ত করে। তারপর আবার কাছা এঁটে উঠে গেল গাছে। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল ঘন নিঃশ্বাসের সাথে সুদৃঢ় ঘোষণা, বেল পাড়বো, সেটা খাবো, তারপর বাড়ি যাবো। ভাইয়াকে ঠেকানোর সাধ্য আমার নেই। আমি কেবল কম্পিত, আবার কিনা কি ঘটে যায়?

আল্লাহর শুকরিয়া। না, খারাপ কিছুই ঘটেনি। ভাইয়া বেল পেড়ে নেমে এলো। দুই ভাই বেল এবং ঘুড়ি নিয়ে আবার গাড়ির ওপর চলে এলাম। ভাইয়া বললো, জিরুবো পরে, আগে বেলটা খেয়ে নিই।

আম গাছের গুঁড়ির সাথে চললো বেলের টক্কর। দু' ঘা দিতেই পাকা বেলটি দুই ভাগ হয়ে গেল। দুই ভাই মজা করে গাছ পাকা বেল খাচ্ছি আর ঘুড়িটার দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি।

কোথায় যে ছিল, ওসমান চাচা, একেবারে বেরসিকের মত ছুটে এল। জিজ্ঞেস করলো, এই তোরা আমার ঘুড়িটা উড়ে যেতে দেখেছিস?

আমি তো বলতেই গিয়েছিলাম। তার আগেই ভাইয়া বললো, উড়ে যেতে দেখিনি তো।

ভাইয়া অবশ্য সত্যিই বলেছে। ও ঘুড়িকে উড়তে দেখেনি। আমি কিছুটা দেখেছিলাম।

ওসমান চাচা তীব্র বেগে ছুটতে থাকলো মাঠের দিকে। বুঝলাম, ও ঘুড়িটা উঠোনে বেঁধে হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে ছিল। সেই ফাঁকে বাতাসে ওটা কেটে গেছে। বড়ো শখের এবং কষ্টের ঘুড়ি। খরচও তো কম নয়। আমার খুব কষ্ট হলো। তাকে পিছন থেকে ডেকে বললাম, ওসমান চাচা-আমরা একটা ঘুড়ি পেয়েছি, এই দেখ। তোমার নাকি?

–কই দেখি, দেখি! হ্যাঁ, এই তো। কোথায় পেলিরে?

বললাম, বেল গাছে।

কথা শেষ নাহতেই ছোঁ মেরে ঘুড়িটার কোনা ধরে হাঁটা দিল ওসমান চাচা। কী পাষাণ রে বাব্বা!

ভাইয়া আড় চোখে সেই দিক তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, চল। আমার প্রায় কান্না পাচ্ছিল।

বললাম, কোথায়?

–বেলগাছে।

–কেন?

www.icsbook.info

–বেল পাড়বো। কাঁচা বেল। তারপর আমরাই ঘুড়ি বানাবো সেই আঠা দিয়ে। আজই। সন্ধ্যার আগেই ওড়াবো ঘুড়ি। দেখি এবার কে আসে ঘুড়ি নিতে। ভাইয়া বোধ হয় আমার খবরও জেনে গেছে।

যে কথা, সেই কাজ।

ভাইয়া গাড়ি থেকে নেমে কাছা দিতে দিতে ছুটে চললো বেল গাছের দিকে।

আমি আর কী করবো! অগত্যা তার পিছে পিছে হাঁটা শুরু করলাম।

পেছনে পড়ে থাকলো গাড়ি, তার ওপর কয়েকটি আম, ঝাল মেশানো নুন আর দুটো ঝিনুকের অংশ। আমরা হাঁটছি, বৈশাখের দর্পিত বাতাসকে দুই ভাগ করে, সামনের দিকে।

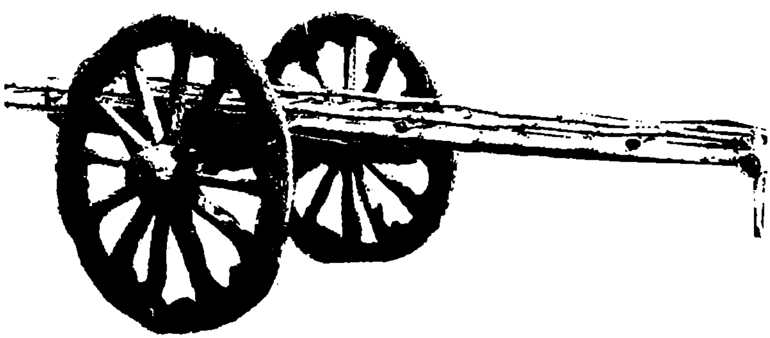

www.icsbook.info

ভূতের মা ডাইনি

নাজিব ওয়াদুদ

অনেক দিন আগের কথা। তখন দেশগুলো ছিল ছোট ছোট। সেই রকম এক ছোট্ট দেশে এক জমিদার ছিল। লোকে তাকে রাজাই বলত। তার ছিল এক রানী। আর ছিল তাদের হীরের টুকরো দু'টি সন্তান। বড়টি মেয়ে, তার নাম সুলতানা। ছোটটি ছেলে, তার নাম শুভ। দুই ভাইবোন যেন মানিকজোড়। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। পরস্পরকে খুব ভালবাসে ওরা। দেখে পিতামাতার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তারা সন্তানদের জন্য ভুল্লাহর কাছে দোয়া করেন- 'হে পরওয়ারদিগার, তুমি আমাদের সন্তানদের হেফাজত করো। ওদের তুমি সুখে-শান্তিতে রেখো।'

দিনকাল ভালই চলছিল ওদের। হঠাৎ একদিন জমিদার-গিন্নির জ্বর

www.icsbook.info

হলো। কয়েকদিনের জ্বরেই তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। রাজ্যের সব কবিরাজ-হেকিম মিলেও কিছু করতে পারল না। সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। মাকে হারিয়ে খুব কাঁদল দুই ভাইবোন। ধীরে ধীরে সে শোকও তারা সামলে নিল। সুলতানা ও শুভ আবার খেলতে লাগল, ওস্তাদের কাছে পড়তে বসল।

একদিন জমিদার শিকারে গেলেন। ফেরার সময় একটা সুন্দরী মেয়েকে সঙ্গে করে আনলেন। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে সুলতানা বলল, 'আব্বু, উনার চোখগুলো কেমন জ্বলজ্বল করে। মনে হয় ডাইনি।'

আব্বু বললেন, 'ছিঃ মা। ওভাবে বলতে নেই। উনি তোমাদের মা হবেন।' মেয়েটির সঙ্গে সুলতানার বয়সী একটি মেয়েও ছিল। সে নাকি ডাইনিটার কন্যা। দেখতে ভারি কুৎসিত। শুভ বলল, 'এই মেয়েটা এত কুৎসিত কেন আব্বু?'

আব্বু বললেন, 'না বাবা, মানুষকে কুৎসিত বলতে নেই। আল্লাহর সৃষ্টি সবই সুন্দর। ও তোমাদের বোন হবে। ওর সঙ্গে খেলবে তোমরা।'

মেয়েটাকে জমিদার বিয়ে করলেন। পিতার কথা শুনে সব কিছু মেনে নিল সুলতানা ও শুভ। না মেনেই বা করবে কী? ওরা যে ছোট, অনেক ছোট। কিন্তু তাদের খুব খারাপ লাগল। তারপর কী যে হলো, তাদের সংসারে নেমে এলো একের পর এক দুর্গতি। নিলামে উঠতে লাগল জমিদারের জমি। এদিকে নতুন স্ত্রী-কন্যার বায়নার শেষ নেই। অসুস্থ হয়ে পড়লেন জমিদার। সুলতানা ও শুভ মিলে পিতার সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগল। তাদের সৎ-মা তার মেয়েকে নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করে বেড়াতে লাগল। জমিদার সুলতানা ও শুভকে ডেকে বললেন, 'আমি ভুল করেছি বাবারা। তোমরা আমাকে মাফ করে দিও।' আর বেশি দিন বাঁচলেন না তিনি।

বাপ-মাকে হারিয়ে পুরোপুরি এতিম হয়ে গেল সুলতানা ও শুভ। সৎ-মা ও তার মেয়ে বাড়ির মোড়ল হয়ে গেল। তারা যখন যা খুশি তখন তাই করে। আর শুধু হম্বি-তম্বি তাদের দু'জনের ওপর। এটা কর, ওটা কর, শুধু হুকুমের ওপর হুকুম। চাকর-চাকরানীর চেয়েও খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ে শুধু কাঁদে তারা। তাদের অত্যাচার-নির্যাতন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। একদিন সইতে না পেরে ছোট্ট ভাইটি বোনটির হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'আম্মা-আব্বা মারা যাবার পর থেকে আমাদের সুখ হারিয়ে গেছে। সৎ-মা ও তার মেয়েটা প্রত্যেকদিন আমাদের মারধর করে। তাদের কাছে গেলে

www.icsbook.info

তারা আমাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়। আমাদের খেতে দেয় শুকনো বাসি রুটি। উঠোনে শুয়ে থাকা কুকুরটা বরং আছে বেশ, কারণ সে মাছ-মাংসের ঝোলমাখা ভাত খেতে পায়। চলো, আমরা এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। খোদার এই বিশাল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আমাদের নিশ্চয় একটা ঠাঁই মিলবে।' সুলতানাও বেশ কিছুদিন থেকে এই কথা ভাবছিল। ছোট্ট প্রিয় ভাইটার দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে উঠল। সেদিনই তারা চুপিচুপি বাড়ি ছেড়ে বের হলো।

সারাটা দিন হাঁটল তারা– শস্যক্ষেত, মাঠ, এবং পাথুরে পথ পাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল অনির্দেশের পথে। একটা মাঠ পাড়ি দেবার সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ছোট্ট ভাইটি বলল, 'আকাশ আমাদের দুঃখে কাঁদছে।'

দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামল। বড্ড ক্লান্ত তারা। সারাদিন এতটুকু দানা-পানি পড়েনি পেটে। পা আর চলতে চায় না। সন্ধ্যায় একটা বড় বনের কাছে পৌঁছল। দুঃখ, ক্ষুধা এবং দীর্ঘ ভ্রমণে তারা এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের চোখ অন্ধকার হয়ে এলো। একটা বিশাল বটগাছের গোড়ায় ওরা বসল, এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন যখন জাগল, সূর্য ততক্ষণে আকাশের ওপরে উঠেছে, গাছের নিচে গরম রোদ ঢালছে। ভাইটি বলল, 'আমার পিপাসা পেয়েছে। কোনো নদী-টদী পেলে সেখানে যেতাম এবং তার পানি পান করতাম।' হঠাৎ কিসের শব্দে কান খাড়া করল সে, বলল, 'কেমন কলকল শব্দ! মনে হচ্ছে পাহাড়ি নদী। বা ঝর্ণা।' শুভ উঠল এবং বোনের হাত ধরে বলল, 'চলো দেখি গিয়ে।'

তারা নদীর খোঁজে ছুটল।

ওদিকে তাদের সৎ-মা তাদেরকে ডেকে ডেকে না পেয়ে তার জাদুর আয়না বের করল। মেয়েটি আসলেই একটা ডাইনি, জাদুকরী। সে আয়নায় দেখতে পেল শুভ ও সুলতানা হাত ধরাধরি করে বনের পথে হেঁটে চলেছে। রাগে তার শরীর কামড়াতে লাগল। তার কুৎসিত মেয়েটি বলল, 'আমাদের কাজ করে দেবে কে? ধরে আনো ওদের।'

সৎ-মা তার আসল রূপ ধারণ করল, এবং গোপনে তাদের পিছু নিল। সেই বড় বনে ছিল ঝর্ণার মত অনেকগুলো ছোট ছোট নদী। ডাইনিটা বনের সব ক'টা নদীকে জাদুর বলে খারাপ করে দিল।

শুভ দেখল একটা নদী পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

www.icsbook.info

সে ছুটে গেল তার কাছে। নদীর স্বচ্ছ পানি দেখে তার পিপাসা আরো বেড়ে গেল। কিন্তু বোনটি হঠাৎ চমকে উঠল। নদীটা কথা বলছে! স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে, নদীটা বলছে–

'করবে যে পান আমার পানি
বাঘ হবে সে নিশ্চয় জানি।'

সুলতানা চিৎকার করে উঠল, 'থামো, শুভ, ভাইটি আমার! ঐ পানি পান করো না, করলে তুমি হিংস্র বাঘ হয়ে যাবে, এবং আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে।'

বোনের কথায় থমকে দাঁড়াল শুভ। উঠে এল নদী থেকে। বলল, 'খুবই তৃষ্ণার্ত আমি। তবু ক্ষান্ত হলাম। পরে আর বারণ করো না।'

আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। সামনে আর একটা নদী পড়ল। তার কাছে ছুটে গেল শুভ। কান খাড়া করল সুলতানা। এবং অবাক হয়ে শুনল নদীটা বলছে–

'করবে যে পান আমার পানি
নেকড়ে হবে সে সত্যি জানি।'

তখন বোনটি চিৎকার করে বলল, 'শুভ! খবরদার না, ঐ পানি পান করো না, করলে তুমি নেকড়ে হয়ে যাবে। তখন আমাকে কামড়ে খেয়ে ফেলবে তুমি!' দারুণ পিপাসায় কাতর ভাইটি, তবু বোনের কথায় থমকে দাঁড়াল। 'তোমার কথা আমি না শুনে পারি না। কিন্তু পিপাসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এরপর আমি আর শুনব না।'

তারপর যখন তারা তৃতীয় ঝরনার কাছে পৌঁছল তখন বোনটি শুনতে পেল, নদীটা বলছে–

'করবে যে পান আমার পানি
হরিণ হবে সে নিশ্চয় জানি।'

বোনটি করুণ কণ্ঠে বলল, 'ওহ, আমি অনুরোধ করছি প্রিয় ভাইটি আমার, আর একবার অন্তত আমার কথা রাখো। এই পানি পান করো না, করলে তুমি হরিণ হয়ে যাবে এবং আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তোমাকে বাঘ-নেকড়েরা ধরে খাবে। না হয় শিকারিরা বন্দুক ছুড়ে মারবে তোমাকে।' কিন্তু ভাইটি শুনল না, পিপাসায় তার প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। সে হাঁটু গেড়ে নদীতে নামল, এবং সামান্য পানি পান করল। যেই না ঠোঁটে পানি ছোঁয়ানো, অমনি সে একটা হরিণছানায় পরিণত হল।

www.icsbook.info

দুঃখে-শোকে হরিণ-ভাইটিকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সুলতানা। ছোট্ট হরিণরূপী শুভও তাদের করুণ পরিণতি দেখে চোখ ভাসিয়ে কাঁদল। শেষে সামলে নিয়ে বোনটি বলল, 'শান্ত হও, প্রিয় ছোট্ট হরিণছানা ভাইটি আমার! আমি কক্ষণো তোমাকে ছেড়ে যাব না। তুমিও আমাকে ছেড়ে যেও না।' হরিণছানা তার গায়ে মুখ ঘষতে লাগল। সুলতানা তার মাথার সোনালি ফিতা খুলে সেটা হরিণের গলায় পেঁচিয়ে পাক দিয়ে দড়ি বানাল। এইভাবে সে ছোট্ট প্রাণিটাকে বাঁধল এবং টেনে নিয়ে চলল বনের গভীরে।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর তারা গিয়ে পৌঁছল একটা কুঁড়েঘরের কাছে। একটু ঠেলা দিতেই ঘরের দরজা খুলে গেল। ভেতরে চোখ বুলিয়ে সুলতানা দেখল ঘরটি একেবারেই ফাঁকা, অনেকদিন কেউ এখানে বাস করে না। সে মনে মনে বলল, 'আমরা এখানে থাকতে পারি।' বন থেকে পাতা ও হোগলা খুঁজে এনে বিছানা পাতল সুলতানা। এখন প্রত্যেক দিন সকালে সে বাইরে যায় এবং নিজের জন্য ফল-মূল, আর হরিণের জন্য নরম ঘাস সংগ্রহ করে আনে। ভাইটিকে হাতে ধরে আদর করে খাওয়ায়। তখন হরিণছানাটি খুশিতে তার চারপাশে ঘোরে, আর খেলে। সন্ধ্যার পর রাত ঘনিয়ে আসে। ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যায় গোটা বন। তখন ক্লান্ত সুলতানা হরিণকে পাশে নিয়ে তার পিঠের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। ভাইটিকে গল্প শোনায় আর ভাবে, ইস! একমাত্র ভাইটা যদি আবার মানুষ হয়ে উঠত! তাহলে কতই না আনন্দের ব্যাপার হতো! কবে যে সে সৌভাগ্য হবে! দোয়া করে সে– 'আল্লাহ, রহম করো মালিক। তুমি আমার ভাইকে আবার মানুষ করে দাও। আমাদের দুর্ভোগ থেকে উদ্ধার করো।'

এইভাবে তাদের দিন যাচ্ছিল। ভালই চলছিল।

এই বনের ওপাশে যে দেশ তার রাজা তরুণ বয়সী। অকালে পিতার মৃত্যুর কারণে তাকে সিংহাসনে বসতে হয়েছে। তা না হলে এই বয়সে তার খেলে বেড়ানোর কথা। খুবই শিকারপ্রিয় মানুষ সে। যখন-তখন শিকারে বেরিয়ে পড়া তার শখ। একদিন সে মন্ত্রীকে ডেকে বলল, 'শিকারে যাব আমি। ব্যবস্থা করুন।' বৃদ্ধ মন্ত্রী একদল পেশাদার শিকারি ও নিরাপত্তারক্ষীসহ এক বিশাল বাহিনী ঠিক করে রাজাকে বলল, 'এবার দিন-ক্ষণ ঠিক করে বেরিয়ে পড়ুন হুজুর।' পরদিনই আল্লাহর জপে নিয়ে রাজা বিশাল বাহিনী নিয়ে শিকারে বের হলেন।

বনে যেন সাড়া পড়ে গেল। এই বনে এত বড় শিকারি বাহিনী এর আগে

www.icsbook.info

কখনো শিকারে আসেনি। হাতির ডাক, কুকুরের চিৎকার এবং শিকারিদের চেঁচামেচিতে গোটা বন সরগরম হয়ে উঠল। ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল সুলতানা। তার আসল ভয় হরিণ ভাইটিকে নিয়ে। সত্যিকার হরিণ মনে করে শিকারিরা যদি তাকে মেরে ফেলে! কিন্তু খোদ হরিণরূপী শুভই চঞ্চল হয়ে উঠল। এমন জমজমাট শিকার-অভিযান রেখে ঘরে বন্দী হয়ে থাকা তার কাছে কষ্টকর হয়ে উঠল। 'ওহ,' সে বোনকে বলল, 'আমাকে ওদের কাছে যেতে দাও, আমি আর তিষ্ঠাতে পারছি না।' সে এমনই কাকুতি-মিনতি করতে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত ভাই-অন্তপ্রাণ বোনটির মন গলে গেল। 'কিন্তু,' সে তাকে বলল, 'সন্ধ্যায় ফিরে আসবে। বর্বর শিকারিদের ভয়ে আমাকে ঘর বন্ধ করে রাখতে হবে, সুতরাং দরজায় কড়া নাড়বে, আর বলবে, 'প্রিয় বোন আমার, আমাকে ভেতরে আসতে দাও।' এটা তোমার পাসওয়ার্ড। এটা শুনে আমি বুঝব তুমি এসেছ, অন্য কেউ নয়। আর যদি তা না বলো তাহলে আমি দরজা খুলব না।' ঘাড় নেড়ে তরুণ হরিণছানাটি লাফাতে লাফাতে চলে গেল। খুব খুশি সে, মুক্ত বাতাসে তার আনন্দের শেষ নেই।

রাজা এবং তার শিকারিদের আশপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল হরিণরূপী শুভ। রাজার বিশাল বাহিনী, শিকারিদের বন্দুক, হাতি আর কুকুর দেখে ভয় পেয়েছে সে। তাই কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না। কিন্তু বিকেলের দিকে সুন্দর প্রাণিটার ওপর নজর পড়ল তাদের। তার পিছু নিল কয়েকজন শিকারি, কিন্তু ধরতে পারল না। এই ভাবে পাওয়া গেছে নাগালের মধ্যে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে হরিণটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড় লাগায়, তাকে আর দেখা যায় না। এক সময় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনাল, এবং বন ছাপিয়ে রাত নামল। তখন সে কুটিরের কাছে গিয়ে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, 'প্রিয় বোন আমার, আমাকে ভেতরে আসতে দাও।' তখন দরজা খুলে গেল এবং সে লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল। বোনকে তার সারা দিনের হইচই আর আনন্দের কথা শোনাতে শোনাতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে সুলতানা ভাবতে লাগল, হরিণ না হয়ে যদি ভাইটি আমার মানুষ হয়েই থাকত, তাহলে শিকারিদের সঙ্গে শিকারে যোগ দিতে পারত। তখন তারও এত ভয় করত না। হায় আল্লাহ, কবে যে আবার সেই সৌভাগ্য হবে!

পরদিন নতুন করে শিকার শুরু হল, আর যখন হরিণছানা বিউগলের আওয়াজ এবং শিকারিদের হইহই চিৎকার শুনতে পেল তখন তার মনের

www.icsbook.info

শান্তি উবে গেল। সে ছটফট করতে লাগল। তারপর তিষ্ঠাতে না পেরে বোনকে বলল, 'আমাকে যেতে দাও। তা না হলে আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।' নানান ভয়-ভীতি ও আশঙ্কার কথা বলেও ভাইটিকে বশ করতে না পেরে অগত্যা বোনটি দরজা খুলে দিল, এবং বলল, 'ওদের কাছে ঘেঁষবে না। আর অবশ্যই সন্ধ্যায় এখানে ফিরে আসবে এবং পাসওয়ার্ডটি বলবে।'

গলায় সোনালি ফিতাওয়ালা বাচ্চা হরিণটা আবার রাজা এবং তার শিকারিদের নজরে পড়ল। এবার তারা সবাই মিলে তাকে তাড়া করল। কিন্তু সে দ্রুত, ক্ষিপ্রগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। সারাদিন ধরে চলল এই রকম, যেন লুকোচুরি খেলা। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে শিকারিরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল, এবং একজনের একটা গুলি তার ছোট্ট পা ছুঁয়ে চলে গেল। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়াল। সেই শিকারি তার পিছু নিয়ে কুটির পর্যন্ত এল, এবং দেখল হরিণটা কথা বলছে। সে অবাক হয়ে শুনল তার কথা– 'প্রিয় বোন আমার, আমাকে ভেতরে আসতে দাও।' তারপর আরো অবাক হয়ে দেখল, কুঁড়েঘরের দরজা খুলে গেল। সে দ্রুত ভেতরে ঢুকল এবং তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অবাক শিকারি রাজার কাছে গিয়ে সব খুলে বলল।

ছোট্ট ভাইটিকে আহত দেখে বোনটি খুব ভয় পেয়ে গেল। সে তার পায়ের রক্ত ধুয়ে দিল, এবং লতাপাতা দিয়ে ক্ষতটা বেঁধে দিয়ে বলল, 'এখন শুয়ে পড়, প্রিয় হরিণছানা ভাইটি আমার! আল্লাহর রহমতে তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।' আঘাতটা ছিল সত্যিই সামান্য, পরদিন ভোরে শুভর অনুভব হলো সে ভাল হয়ে গেছে। একটু পরেই আবার শিকারিদের শোরগোল শুরু হলো। শুভ বলল, 'আমি আর বসে থাকতে পারছি না, আমাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে। তুমি ভেব না, ওরা সহজে আমাকে ধরতে পারবে না।' বোনটি চিৎকার করে বলল, 'এবার ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। এই বনে আমি একা হয়ে যাব। দুনিয়ায় আমার আর আপন বলতে কেউ থাকবে না। আমি তোমাকে বাইরে যেতে দেব না।' ভাইটিও জেদ ধরল, 'তাহলে আমি দুঃখে মরে যাব।' সে বলল, 'যখন আমি বিউগলের শব্দ শুনি তখন মনে হয় আমার হৃৎপিণ্ডটা ছুটে বেরিয়ে যাবে শরীর থেকে। দোহাই তোমার, আমাকে যেতে দাও।' দরজা খুলে দেয়া ছাড়া দুঃখ ও উদ্বেগে কাতর বোনটির গত্যন্তর রইল না। হরিণছানা আনন্দে লাফাতে লাফাতে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

রাজা আজ হরিণটাকেই খুঁজছিলেন। দুপুরের দিকে তার দেখা মিলল। রাজা তার শিকারিদের বললেন, 'ওকে সারাদিন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াও

www.icsbook.info

যতক্ষণ না রাত নামে। কিন্তু সাবধান, তার যেন কোনো ক্ষতি না হয়।'

শিকারিরা হরিণ নিয়ে মেতে উঠল। এক সময় সূর্য অস্ত গেল। তখন রাজা শিকারিকে বললেন, 'এবার চলো, আমাকে কুটিরের কাছে নিয়ে চলো।'

কুটিরের দরজায় করাঘাত করে রাজা বললেন, 'প্রিয় বোন আমার, আমাকে ভেতরে আসতে দাও।'

দরজা খুলে গেল। রাজা ভেতরে ঢুকলেন এবং দেখলেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে। সুলতানা যখন দেখল হরিণ নয়, তার বদলে ঢুকেছে মাথায় সোনার মুকুটপরা একটা মানুষ, তখন সে ভয় পেল। রাজা তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন, বললেন, 'ভয় নেই, আমি এই দেশের রাজা।' তাকে সালাম জানাল সুলতানা। তার আচরণে খুব খুশি হলেন রাজা। তক্ষুণি মনস্থির করে ফেললেন তিনি। হাত বাড়িয়ে বললেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে আমার রাজপ্রাসাদে যাবে? আমি তোমাকে আমার রানী বানাতে চাই।'

'তার জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কী হতে পারে?' মনে মনে ভাবল সুলতানা। কিন্তু ভাইটির কী হবে? সে বলল, 'জাঁহাপনা চাইলে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু...!'

রাজা বললেন, 'তোমার কোনো শর্ত আছে? থাকলে বলে ফেলো। আমি তা পূরণ করব।'

'না, তেমন কিছু নয়,' মেয়েটি উত্তর করল, 'ছোট্ট হরিণটা আমার সাথে যাবে, আমি তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

'ও! বেশ,' রাজা বললেন, 'তুমি যতদিন বাঁচবে ততদিন সে তোমার সঙ্গে থাকবে। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

ঠিক সেই মুহূর্তে হরিণটা দৌড়ে এসে বোনের কোলে লাফিয়ে পড়ল। তারপর শিকারিদের নেতাকে দেখে ভারি অবাক হলো সে। আরো অবাক হলো যখন জানতে পারল লোকটা পার্শ্ববর্তী দেশের রাজা এবং তার বোনকে রানী বানাতে চায়। সে আনন্দে পেছনের পা তুলে ঘরের মধ্যেই তাদেরকে ঘিরে কয়েকটা পাক খেল। কিন্তু তাতে না মজে অভিজ্ঞ গৃহিণীর মত সুলতানা লতায় পাকানো দড়ি দিয়ে বাঁধল তাকে। তারপর তাকে নিয়ে রাজার সঙ্গে কুটির ছেড়ে গেল।

রাজা সুন্দরী মেয়েটিকে ঘোড়ায় তুলে তার রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন এবং মহা ধুমধামে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। হতভাগ্য সুলতানা এখন

www.icsbook.info

রানী, এবং তারা সুখে বসবাস করতে লাগল। হরিণটিও যত্ন পেতে থাকল, সে সারাদিন রাজপ্রাসাদের বাগানে দৌড়ে বেড়ায়।

ডাইনি সৎ-মা ভেবেছিল মেয়েটাকে বনের পশুরা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে, আর হরিণরূপী ছেলেটা মরবে শিকারিদের গুলিতে। কিন্তু যখন দেখল তা না হয়ে তারা পেয়ে গেল আনন্দময় রাজকীয় জীবন, তখন হিংসা ও ঘৃণায় তার অন্তর জ্বলে উঠল। তার মনের শান্তি উধাও হয়ে গেল এবং সে একটা কথাই শুধু ভাবতে লাগল কী করে তাদেরকে আবার বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলা যায়। আর তার হিংসুটে মেয়েটাও তার কানের কাছে অনবরত বিড়বিড় করতে লাগল– 'রানী! সেটা তো আমার হওয়ার কথা।'

'শান্ত হ' বাছা,' বৃদ্ধা ডাইনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'শুধু সময়ের জন্য অপেক্ষা। আমি প্রস্তুত হয়েই আছি।'

সময় এগিয়ে চলল এবং রানীর একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হলো। তখন রাজা বাইরে শিকারে ছিলেন। বৃদ্ধা ডাইনি চাকরানীর রূপ নিয়ে রানীর ঘরে ঢুকে বলল, 'আসুন, গোসলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোসল করলে ভাল লাগবে, এবং শরীরে শক্তি ফিরে পাবেন। চলুন, পানি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

তার কন্যাটিও কাছেই ছিল, তারা দু'জনে মিলে দুর্বল রানীকে গোসল-ঘরে নিয়ে গেল, এবং সেখানে তাকে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। গোসল-ঘরে তারা আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল, তার এতটাই তাপ যে খুব দ্রুত তরুণী রানীর দম বন্ধ হয়ে এল।

এদিকে বৃদ্ধা ডাইনি তার কন্যাকে রানী সাজিয়ে রানীর বিছানায় শুইয়ে দিল। তার আকার-আকৃতি ও চেহারাও রানীর মত করে দিল। কেবল তার নষ্ট চোখটা ঠিক করতে পারল না। তাতে অসুবিধা নেই, কারণ যেদিকের চোখ নষ্ট সেদিকে কাত হয়ে শুবে সে, রাজা সেটা দেখতে পাবে না।

সন্ধ্যায় প্রাসাদে ফিরে রাজা শুনলেন যে তার একটা ছেলে হয়েছে। তিনি ভীষণ খুশি হলেন, এবং ছুটে গেলেন স্ত্রীকে দেখতে। কিন্তু বৃদ্ধা মেয়েটি দ্রুত তাকে ডাকল, 'থামুন, জাহাঁপনা, তাকে বাঁচাতে চাইলে পর্দা টেনে দিন, রানীর এখনো আলো দেখা উচিত হবে না। তাকে বিশ্রামে থাকতে দিন।' হতাশ হয়ে রাজা চলে গেলেন। তিনি হতাশ হলেন, কিন্তু রানীর কল্যাণ চিন্তা করে মেনে নিলেন।

সেদিন মাঝ রাতে রাজপ্রাসাদের নিচে প্রহরীরা ছাড়া আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওপরে দোলনার পাশে একমাত্র জেগে রয়েছে একজন নার্স। তার

www.icsbook.info

প্রায় তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। হঠাৎ সে দেখল ঘরের দরজা খুলে গেল। ভারি অবাক কাণ্ড! সে-ও যে রানী! অথচ বিছানায় শুয়ে আছে আরেক রানী। সে কৌতূহল চাপতে না পেরে চুপিচুপি তার পিছু নিল। আগন্তুক মেয়েটি ভেতরে ঢুকল। সে দোলনা থেকে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল এবং বুকের দুধ খাওয়াল। তারপর শিশুটার বালিশটা ঝেড়ে গুছিয়ে পুনরায় তাকে শুইয়ে তার গায়ে কম্বল টেনে দিল। সে হরিণের কথাও ভুলল না, তার কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর নীরবে আবার দরজা ঠেলে চলে গেল। পরদিন সকালে উঠে নার্স দারোয়ানদের জিজ্ঞেস করল, রাতে রাজপ্রাসাদে কেউ ঢুকেছে কি-না। তারা বলল, 'না, কাউকে ঢুকতে বা বেরতে দেখা যায়নি।'

এভাবে সে প্রত্যেক রাতে আসতে লাগল, কিন্তু একটি শব্দও কখনো উচ্চারণ করে না। নার্স সব সময় তাকে দেখে, কিন্তু কাউকে বলার সাহস হয় না তার।

এভাবে বেশ কয়েকদিন যাওয়ার পর একদিন রাতে রানী কথা বলা শুরু করল। সে বলে–

'বিদায় আমার সোনার ছেলে,
বিদায় সোনার হরিণ,
আর কখনো আসব না রে,
আর মাত্র দু'দিন।'

নার্স কোনো সাড়া-শব্দ করল না। আগন্তুক মেয়েটি চলে গেল।

এবার রাজার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলল নার্স।

'হায় খোদা! কী ঘটছে এসব? কী শুনছি আমি!' তারপর তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আগামীকাল রাতে আমি নিজে ছেলের পাশে থেকে দেখব।' সন্ধ্যায় তিনি ছেলের ঘরে গিয়ে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকলেন। মাঝরাতে যথারীতি রানী হাজির হলো এবং বলতে লাগল–

'বিদায় আমার সোনার ছেলে,
বিদায় সোনার হরিণ,
আর কখনো আসব না রে,
মাত্র আর একদিন।'

তারপর সে ছেলেকে কোলে নিয়ে বুকের দুধ খাওয়াল, আদর করল। রাজা দম বন্ধ করে ঠোঁট চেপে বসে রইলেন, একটি কথাও বললেন না, একটু

www.icsbook.info

টুঁ শব্দও করলেন না।

পরদিন রাতে আবার একই ঘটনা। রানী বলল–

'বিদায় আমার সোনার ছেলে,
বিদায় সোনার হরিণ,
আর কখনো আসব না রে,
আজকেই শেষ দিন।'

তখন রাজা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, লাফ দিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবং বললেন, 'আমার প্রিয় স্ত্রী ছাড়া তুমি আর কেউ নও।'

সুলতানা বলল, 'হ্যাঁ জাহাঁপনা, আমিই আপনার প্রিয় স্ত্রী।'

রাজা তার কাঁধে হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসল রানী আবার জীবন ফিরে পেল, এবং খোদার রহমতে তরতাজা, টগবগে, সুন্দরী, এবং পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী তরুণী হয়ে উঠল।

তখন সে বদমাশ ডাইনি ও তার মেয়ের সব অত্যাচার-নির্যাতন ও দুষ্কৃতির কথা রাজাকে খুলে বলল। রাজা ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। মনে হলো, এখনই তরবারির কোপে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন ডাইনি ও তার মেয়েকে। কিন্তু রাজা হিসেবে দায়িত্ব আছে তার। ক্ষমতা আছে বলেই যখন-তখন যা-ইচ্ছা-তাই করতে পারেন না। দেশে আইন বলে একটা ব্যাপার আছে। তিনি নিজেই তার রক্ষাকর্তা। সে আইন নিজেই ভাঙেন কী করে! তিনি ডাইনি ও তার মেয়েকে আদালতে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। সব কিছু শুনে বিচারক ডাইনির কন্যাকে বনবাসে পাঠালেন, সেখানে বন্য পশুরা তাকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলল। আর ডাইনিকে আগুনে পুড়িয়ে মারার হুকুম দিলেন। যে মুহূর্ত থেকে ডাইনি পুড়তে শুরু করল সেই মুহূর্ত থেকে হরিণটার রূপবদল ঘটতে লাগল, এবং পুনরায় সে পুরোপুরি মানুষের চেহারা ফিরে পেল।

পরস্পরকে আবার ফিরে পেয়ে সুলতানা ও শুভ, দুই ভাইবোন, জড়াজড়ি করে কাঁদল। আনন্দের কান্না। রাজপুত্রের মত সুন্দর ও সুঠামদেহী এক কিশোর শ্যালক পেয়ে রাজাও খুব খুশি। তাদেরকে ফিরে পেয়ে রাজ্যের সব প্রজাকে দাওয়াত করে খাওয়ালেন তিনি। সারা দেশজুড়ে আনন্দের বন্যা বইতে লাগল।

[বিদেশী উপকথা অবলম্বনে]

www.icsbook.info

তাদের কি নাম

বুলবুল সরওয়ার

হঠাৎ করেই একটি বোয়াল ঢুকে পড়ল দিঘিতে। বোয়ালটার সাইজ খুব বড় নয়। কিন্তু বোয়াল তো! আতঙ্ক নেমে এলো সব মাছের মধ্যে। কিন্তু ভয়ে কেউ কথা বলে না। অথচ ঘুম নেই কারো চোখে।

প্রথম দু'একদিন বোয়াল এমন ভাব করল যেন সে সবার বন্ধু। কৈ মাছ সবাইকে সতর্ক করল : বিশ্বাস কর না ওর মিষ্টি কথায়। ও শুধু অপেক্ষায় আছে শিকারের।

কৈ মাছের সাহস এমনিতেই বেশি। তারপরও সে জানে, বোয়াল তাকে খেতে পারবে না। সে হল পানির সজারু। তার কাঁটাকে বোয়ালও সমঝে চলে।

পুঁটির দেমাগ বেশি। আরে কৈ, তোর না আছে রূপ, না আছে গুণ। চোয়াল উঁচিয়ে বলল পুঁটি : না-না, আমি তো বোয়ালের সাথে কথা বললাম।

www.icsbook.info

খুব মিষ্টি ব্যবহার তার। ও-তো আমাদেরই লোক! ওকে এত ভয় পাবার কী আছে?

না-না, পুঁটি। তুমি জানো না। আমরা তো বহুকাল থেকে দেখে আসছি। ও আমাদের বন্ধু হতে পারে না।

না, কৈ, না। এ তোমার হিংসের কথা। আমার তো তাকে খারাপ লাগল না।

তুমি-ই ঠিক বলেছ, পুঁটি। সুর মেলালো পাবদা, কৈ শুধু শুধু ভয় পাচ্ছে। আমার মনে হয় না, এই দিঘিতে কারো সাথে কারোর কখনো বিবাদ করা উচিত।

কৈ মাছ চুপ করে থাকল। শুধু কচ্ছপ তাকে ডেকে বলল, তোমার কথাই ঠিক কৈ। আমি দিঘির সবচেয়ে পুরনো মানুষ! আমি চিনি বোয়ালদের। ওদের চরিত্র বদলাতে দেখিনি কখনো। সাবধানে থাকাই ভালো।

বুড়ো-ভাম, তুমি মাছদের মধ্যে নাক গলাও কেন? পাবদা তার অহঙ্কারী লেজে দোলা দিয়ে বলল, আমরা যদি বোয়ালের সাথে ভাব করে চলি, তোমার কী? যাও, যাও এখান থেকে!

মুখটাকে খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে কচ্ছপ ডাঙায় উঠে গেল।

মাত্র তিনি দিনের মাথায় হৈ-হৈ রব উঠল দিঘিতে। কি হয়েছে, কেউ জানে না। হঠাৎ করেই নেই-হয়ে-গেছে টাকি মাছ। কোথায় গেল সে?

অনেক দিন আগে একবার এই নেই-হয়ে-যাওয়া শুরু হয়েছিল– কচ্ছপ আস্তে বলল কৈ মাছকে। তখনও এমন চিৎকার চেঁচামেচি হয়েছিল। সেবার বোকা সরপুঁটি পক্ষ নিয়েছিল গজারের। খুব ভাব হয়েছিল তাদের। সেবারও শিং মাছ সাবধান করেছিল সরপুঁটিকে। কিন্তু সে শোনেনি।

তারপর?

তারপর ঘটতে শুরু করল আরো নেই-হয়ে-যাওয়া। সবাই ঘরে খিল দিয়ে থাকল। কিন্তু নেই-হয়ে-যাওয়া থামল না। শেষে দিঘির মালিক রাগ করে সব মাছ বেঁচে দিলেন। পানি সেঁচা হলো। মাছ চলে গেল জেলেদের জালে আর খাঁচায়। খুব কষ্ট করে শিঙ মাছ বেঁচে গিয়েছিল, কাদার গভীরে ঢুকে।

পরে কি হল?

আবার দিঘিতে পানি দেয়া হল। তদ্দিনে শিঙের প্রাণ যায় যায়। আমি আর কতটুকু তাকে সাহায্য করতে পারি, বলো? দিনে দু'তিন বার দু'চার ফোঁটা পানি আর দুর্বার কয়েকটা কচি পাতাই শুধু দিয়ে আসতে পারতাম। ঐ

www.icsbook.info

দিয়ে কি প্রাণ বাঁচে?

মানে, শিংটা মরে গেল?

না, মরল না। তবে নতুন পানি তার সহ্য হলো না। বেশ কয়েক সপ্তাহ শ্বাসকষ্ট আর পেটের পীড়ায় ভুগে মারা গেল সে।

হায়, খোদা। আর গজার?

গজারটাও কাঁদায় ঢুকে বাঁচার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জেলেদের কয়েকজন ছিল জাত শিকারি। পায়ে লেজের ছোঁয়া লাগতেই কোচ মেরে দিল। তাতেই গজার আটকা পড়ল।

কোঁচ কি?

কোঁচ হল চিকন-সরু বল্লমের আঁটি। খুবই ভয়ঙ্কর। পনেরো- বিশটা এক সাথে থাকে বলে বড় মাছেরা পালাতে পারে না; একটা না একটা শরীরে গাঁথেই।

সর্বনাশ!

না-না, কৈ, তোমার ওতে ভয় নেই। কোঁচ তোমাকে বিঁধতে পারবে না। তোমার বিপদ হবে পলো।

মানে, ঐ-যে বাঁশের খাঁচা!

ঠিক ধরেছ।

পলো থেকে পালাতে জানি আমি।

কিভাবে?

নেহাতই যদি আটকে পড়ি, কাঁদায় ডুব দেই। শিকারির হাত খুব লম্বা না হলে কাঁদার নিচ পর্যন্ত হাত যায় না। ধরতেও পারে না। তাই বেঁচে যাই।

ভালো বুদ্ধি তো!

কচ্ছপের প্রশংসায় খুশি হল কৈ। তারপর বলল, আচ্ছা, যাক এসব। ভাই কচ্ছপ, বলো তো তোমার কি মনে হচ্ছে? কী হচ্ছে এসব?

আশপাশে আরো মাছ ঘোরাফেরা করছে। বুদ্ধিমান কচ্ছপ সেদিকে চেয়ে মুখটা খোলের ভেতর ঢুকিয়ে নিলো। কৈ বুঝল, আর কথা বলবে না কচ্ছপ। তবে তার নীরবতায় কৈ টের পেল, তার সন্দেহের সাথে দ্বিমত নেই কচ্ছপের। এটুকুই তার জন্য যথেষ্ট।

মাছেরা গুজবে কান না দিলেও খানিকটা চিন্তিত হলো। কিন্তু পাবদার আশ্বাসে আবার সবাই ভুলে গেল টাকি মাছের নিখোঁজ হবার কথা। কিন্তু কৈ মাছ সাবধানই থাকল।

www.icsbook.info

আরো দু'নি পর নেই হয়ে গেল রয়না।

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল আবার।

কৈ মাছকে ডেকে বলল কচ্ছপ, চোখ-কান খোলা রাখো। কিন্তু দিন না পেরোতেই নিখোঁজ হলো বাঁশ-পাতা মাছ।

শুনেই পুঁটিকে সাবধান করার জন্য ছুটল কৈ। কিন্তু তার বাড়ি পৌঁছার আগে সে শুধু রূপালী একটা ঝিলিক দেখতে পেল। ঝড়ের মত এগিয়ে আসা পানির স্রোত সরে যেতেই দেখল পুঁটি নেই। শুধু চোখে পড়ল একজোড়া লাল-চোখ এদিক তাকিয়ে হাসছে। ও-চোখ বোয়াল ছাড়া কারুর নয়।

প্রাণপণে কৈ ছুটলো পাবদার বাড়ি।

যথারীতি পাবদা পাত্তা দিল না কৈ-কে। খালি খালি শত্রুতা করা তোমার স্বভাব, কৈ। আমিও তো বোয়ালের মতোই দেখতে, শুধু একটু ছোট। আমি কখনো তোমাদের শত্রুতা করি?

আমিও তো তাই বলি। এসব কি বলছে কৈ আমার বিরুদ্ধে? বলতে বলতে এগিয়ে এলো বোয়াল। তারচেয়ে দোস্ত, চলো– একটু বাগানে ঘুরে আসি। বোয়াল এ কথা বলেই পাবদার কাঁধে হাত রেখে ঘুরে দাঁড়াল। পাবদা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সবাইকে শুনিয়ে কৈ-কে বলল, হিংসুটে!

ততক্ষণে আরো অনেক মাছ জড় হয়েছে চারপাশে। পাবদার অহঙ্কার তাতে আরও বেড়ে গেল। উঁচু গলায় বলল, বন্ধুত্ব হয় রূপে-গুণে মিল থাকলে, বুঝলে? যেমন দেখ, আমি। বোয়াল আমার বন্ধু বলে কৈয়ের হিংসে হচ্ছে। দেখ সবাই–

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই বোয়াল হাঁ করল। পাবদা শুধু দেখল, বিরাট সেই গহবরের ভেতর শুধুই অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের ভেতরে লকলক করছে কাঁটাওয়ালা জিভ।

গপাৎ-গপ! গপ-গপাগপ!!

ছোট মাছেরা দিগ্বিদিক ছুটল। কৈ তার সব কাঁটা খাড়া করল লড়াইয়ের জন্য। কিন্তু বোয়াল কিছুই বলল না থাকে। আরাম করে পাবদাকে খেয়ে হাই তুলে বলল, আগামী আট চল্লিশ ঘণ্টা সবাই নিরাপদ। আমি এখন ঘুমাব।

কচ্ছপ কৈ-কে বলল, এরপর আর রাখঢাক চলে না। সব মাছকে ডেকে এক করো।

ছোট আর মাঝারি মাছেরা মিটিংয়ে বসল। কিন্তু পাবদার মত বোকা অনেকেই আছে। তাদের বাদ-প্রতিবাদে কোন সিদ্ধান্তই নেয়া গেল না।

www.icsbook.info

কেটে গেল তিন দিন।

এর মধ্যেই বোয়ালের পেটে গেছে পুঁটি, বাতাসি, ঘাটপোনা, চিৎপুঁটি, বুইচা, খলিশা, মলা-ঢেলা। এখন আর তার কোন রাখঢাক নেই। সে শোলকেও ডেকে বলেছে : যদি আমার সাথে লাগতে আসিস, তুই-ও থাকবি লিস্টিতে। বুঝলি?

আর মিটিং করার সাহস হল না ছোট আর মাঝারি মাছদের। কিন্তু কচ্ছপ বলল, এভাবে বসে থাকলে তো বাঁচতে পারবে না কেউ। শত্রু যত বড়ই হোক, রুখে দাঁড়াতে হবে।

তদ্দিনে বোয়াল আরো বড় হয়েছে। একমাত্র চিতল ছাড়া এখন কাউকেই সে তোয়াক্কা করে না।

শেষে সভা বসল রাত্রে। কেউ কিছু বলছে না দেখে কৈ-ই এগিয়ে এলো। এত বড় শত্রুকে সাধারণভাবে রোখা যাবে না। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এর জন্য। তোমরা সবাই যেহেতু ভয় পাচ্ছ- আমিই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। আমরা রিস্ক নেব। আমরা মানে কৈয়েরা। যদি তোমরা আমাদেরকে সাহায্য কর।

কী রিস্ক?

জীবন বাজি রাখার রিস্ক।

কিভাবে?

কৈ আগেই কচ্ছপকে শুনিয়েছে তার পরিকল্পনার কথা। শুনে কচ্ছপ বলেছে, অনেক বেশি বিপদ ঘাড়ে নিচ্ছ তুমি, কৈ। কিন্তু এছাড়া তো কোন উপায়ও দেখছি না। শেষে কচ্ছপের সাথে বসে কৈ তার প্ল্যান সাজিয়েছে। বন্ধুদেরকেও রাজি করিয়েছে সে।

শোন, সবাই। দু'এক দিনেই বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করলেই আমরা পাড়ে উঠে যাবো।

পালাবে তোমরা? ছোট মাছেরা আঁতকে উঠল। আর আমরা মরব এখানে থেকে?

আরে না-না, আগে শোন। কয়েকবার করে পাড়ে উঠব আর গড়িয়ে নেমে আসব। ব্যাপারটা অবশ্যই মালিকের চোখে পড়বে। তখনই তিনি জেলে ডাকবেন। জাল ফেলা হবে। ধরা পড়বে বোয়াল।

তাহলে তো সবারই মরণ? আমরা কি জালে জড়িয়ে মরব না?

সবাই না; কেউ কেউ মরব। কিন্তু এই মরণ মানতেই হবে। যদি এটা

www.icsbook.info

আমরা না করি, তাহলে সবংশে সবাই হয় বোয়ালের পেটে যাব, নাহয় জেলের খাঁচায়। বলো, তোমরা কি করবে?

না-না, অত ভয় পেও না– বলল কচ্ছপ। তেমন কেউ মরবেও না; কারণ, আমি সাহায্য করব। আমি আগে-আগে জালে ধরা দেব। আমার পিঠ তো বড়। সেই পিঠের তলা দিয়ে ছোট আর মাঝারি মাছেরা পালিয়ে যাবে। ঠিক আছে?

সবাই খুশি মনে প্রস্তাব মেনে নিল।

পরদিন থেকেই বৃষ্টি নামল। পালা করে কৈয়েরা পাড়ে উঠতে লাগল। মালিকের বাচ্চা-কাচ্চারা কেউ ধরতে এলেই লাফিয়ে দিঘিতে ফেরে তারা। যেন মজার খেলা একটা।

বাচ্চাদের মাধ্যমেই খবর পেল মালিক। জেলে ডাকা হল পরদিন।

ধরা পড়ল বোয়াল। তার লাফালাফিতে জালে টান পড়ল খুব। তাতে বেঁধে গেল কচ্ছপের পা। সেই পা ছাড়াতে গেল কৈ। মুক্তি পেল কচ্ছপ। কিন্তু আটকা পড়ল কৈ।

দিঘির পানিতে আবার শান্তি ফিরল।

শ্রাবণের বৃষ্টির স্রোতে পাশের ডোবা উপচিয়ে এলো পাবদা-পুঁটি-ঘাটপোনাসহ আরো অনেকে। হাসি আনন্দে আবার ভরে গেল পুরনো দিঘি।

শুধু কচ্ছপই হাসে না। নীরবে বসে থাকে সে; কখনো আবার পাড়েও উঠে যায়। সেখানে সে পা দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটে। এখানেই কৈয়েরা উঠে এসেছিল বৃষ্টিতে। কী অদ্ভুত পরিকল্পনায় বাঁচিয়ে দিয়েছে সে দিঘির ছোট মাছদের।

এরপরও বোয়াল-গজারদের আক্রমণ হয়েছে। প্রতিবারই কচ্ছপ কৈয়ের আত্মত্যাগের গল্প শুনিয়েছে নতুনদেরকে। অনেকেই তারা নাক সিঁটকেছে কিংবা হতে চেয়েছে বোয়াল-গজারদের বন্ধু। তারপর আগের মতই যা ঘটার ঘটেছে।

কচ্ছপ গল্পটা বলে যায় এবং প্রতিবারই বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ না-কেউ। কখনো কৈ, কখনো শিং, কখনো আর কেউ।

আমরা তাদের কী নামে ডাকতে পারি, জ্ঞানী কচ্ছপ? সাহস করে জানতে চায় মাগুরছানা।

এটা নির্ভর করে তোমার মানসিকতার ওপর, বাছা। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাইনে।

www.icsbook.info

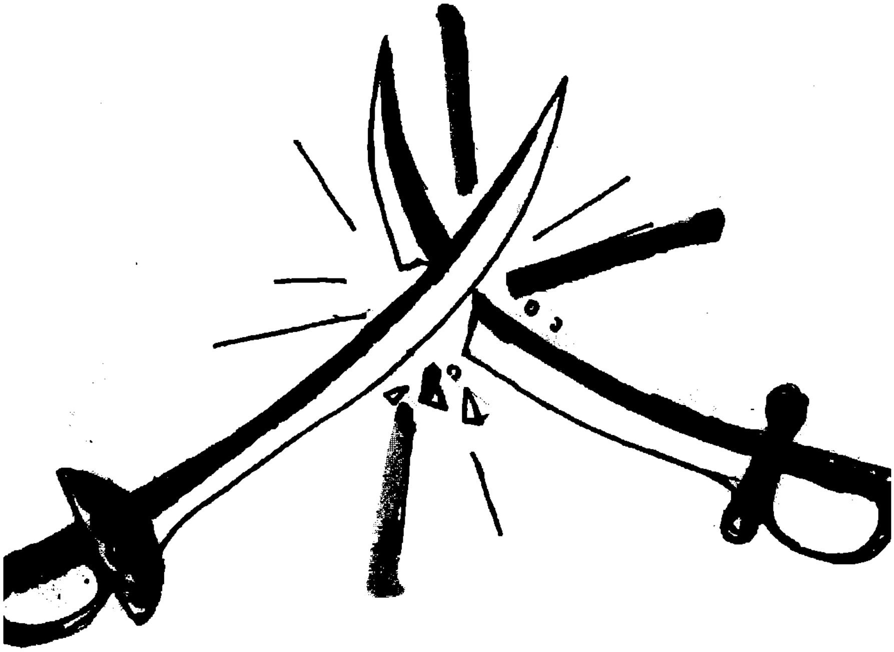

এই নাও জুলফিকার

আবদুল হালীম খাঁ

নারোয়ান রণাঙ্গন! একদিকে শের এ-খোদা হযরত আলী (রা) অন্যদিকে তাঁর প্রতিপক্ষে এক যুবক। তুমুল বেগে যুদ্ধ চলছে। তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে আগুন জ্বলছে। এক সময় হযরত আলীর আঘাতে যুবকের তলোয়ার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আলী (রা) পুনরায় আঘাতের জন্য তলোয়ার উত্তোলন করে দেখেন যুবক অস্ত্রহীন। অসহায়। ভয়ে ভীষণ কাঁপছে। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করলেন না। উত্তোলিত তলোয়ার সংবরণ করে বললেন : হে যুবক ভয় নেই। তুমি চলে যাও। দ্রুত চলে যাও তোমার দলে।

হযরত আলীর এ অদ্ভুত ব্যবহার দেখে যুবক প্রশ্ন না করে পারলো না।

www.icsbook.info

বললো : এতক্ষণ যুদ্ধ করলেন আমাকে হত্যা করার জন্য। এখন আমি অস্ত্রহীন। আমাকে হত্যা করার পরম সুযোগ। অথচ আমাকে হত্যা না করে নির্ভয়ে চলে যেতে বললেন কেন?

হযরত আলী জবাব দিলেন : আত্মরক্ষায় সমর্থ যে নয়, যে ভীত কম্পিত, তাকে হত্যা করা বীরের ধর্ম নয়।

তাই না কি?

হ্যাঁ তাই। একমাত্র ভীরুরাই অসহায়কে হত্যা করে। এমন মহানুভবতার কথা শুনে যুবক মুগ্ধ হয়ে গেল। সে আবার প্রশ্ন করলো, শুনেছি আপনি বড়ই উদার এবং দানশীল। কোনো প্রার্থীকেই কখনো বিমুখ করেন না।

তাই আরেকটি প্রার্থনা এখন আপনার কাছে।

কী প্রার্থনা, বলো।

আমি এখন আপনার হাতের তলোয়ারটি চাই।

নির্ভীক এবং উদার হৃদয়ের অধিকারী হযরত আলী (রা) ক্ষণকাল নির্বিকার রইলেন। অতঃপর বললেন : এই নাও জুলফিকার। বলেই যুবকের হাতে তলোয়ারটি তুলে দিলেন এবং বললেন : মনে রেখো যুবক, তলোয়ারে মৃত্যু নেই। জীবন ও মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। তাঁর হুকুমেই সব হয়।

শের-এ-খোদার এ প্রত্যয়দীপ্ত বাক্য শুনে যুবক বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে গেল। তার বুকের ভেতর যেনো বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে জ্বলে উঠলো।

আর মুহূর্তে তার মনের অন্ধকার দূর হয়ে গেল। সে বিমোহিত ও পুলকিত হয়ে শের-এ-খোদার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে আবেগে আপ্লুত হয়ে চুম্বন করলো এবং বললো :

আপনার মহত্ত্ব ও উদারতার কথা এতো দিন লোকমুখে শুনেছি। আজ প্রত্যক্ষ করলাম। আপনি সত্যিই বিরাট মহান। আমাকে আপনার গোলাম হিসেবে গ্রহণ করে ধন্য করুন। আপনার দেহরক্ষী হওয়ার গৌরব দান করুন।

শের-এ-খোদা হযরত আলী (রা) বললেন : ভাই, কোনো ব্যক্তির গোলাম হয়ো না। গোলাম হও একমাত্র আল্লাহর। এবং মনে রেখো সত্যের জন্য জিহাদ করাতেই প্রকৃত গৌরব।

www.icsbook.info

মৃত্যু বিভীষি

আহমদ মতিউ

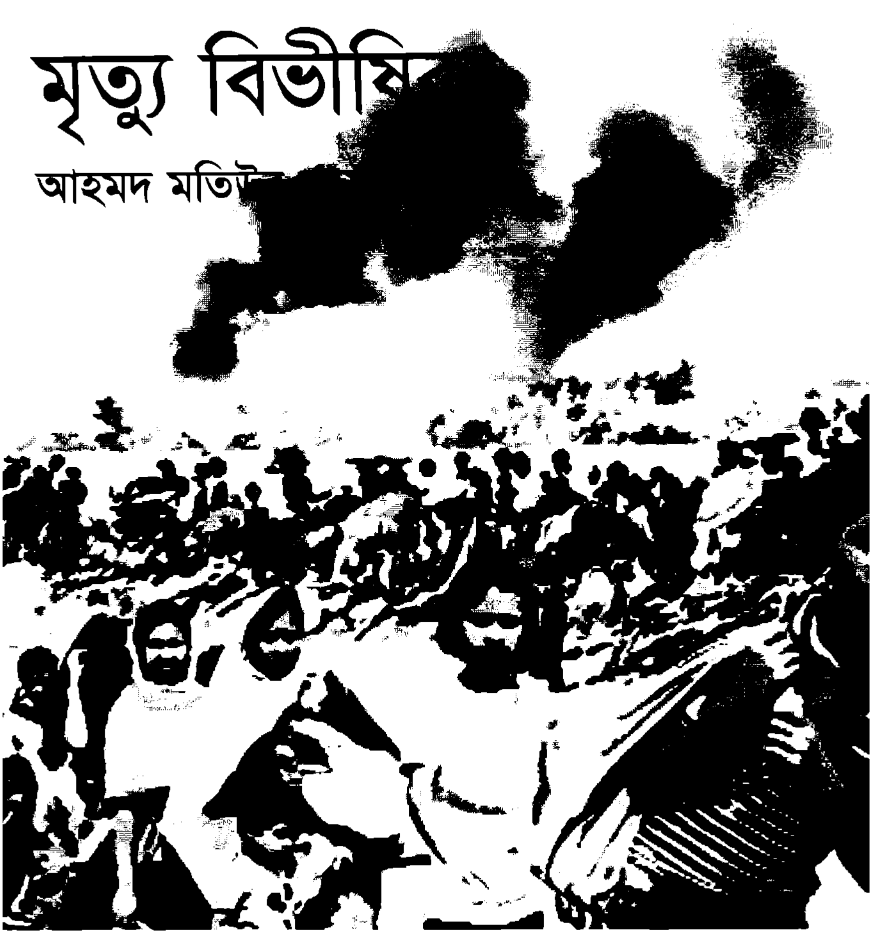

আকিয়াব শহরে সোনাঝরা বিকেল নেমে এসেছে। সময়টা না গরম না ঠাণ্ডা। সাগরের তীরে একদিকে যেমন মিয়ানমারের আরাকান, অন্যদিকে বাংলাদেশ। মাঝখানে নাফ নদী। নদীর এপার ওপার বলতে গেলে জীবনযাত্রা একই রকম। বহু মানুষেরই পেশা সমুদ্রে আর নাফ নদীতে মাছ ধরা। কারো কারো পেশা শুঁটকি তৈরি করা। কেউ নৌকা বা সাম্পান গড়ার কারিগর। আবার অনেকেই আছে নানা জিনিসের দোকানপাট নিয়ে। তারা এসব করে জীবন চালায়। দুই এলাকার মানুষের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল না। মংডু থেকে মালামাল যেত, এখনো কমবেশি যায়, বিনিময়ে টেকনাফ থেকেও আসতো বাণিজ্যিক পণ্যের

www.icsbook.info

চালান। দুই তরফের লোকদের আনাগোনা তো ছিলই। এক সময়ে আরাকান ছিল স্বাধীন রাজ্য। আরাকানের রাজসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছিল দাপট। মহাকবি আলাওল তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এবার কি যে হয়ে গেল। আগের সেই ভাব আর নেই। আরাকানের মুসলমানরা শত শত বছর ধরে সেখানে বসবাস করে আসছে। এখন বলা হচ্ছে তারা ভূমিপুত্র নয়। তারা নাকি বিদেশী। অতএব তাড়াও তাদেরকে।

আকিয়াবে বিকেল নেমে এলে স্বস্তি। গরমে দিনে রোদের তাপ অথবা শীতকালে ঠান্ডার তীব্রতা কম থাকায় এ সময়টা সবাই যার যার কাজে বের হয়।

আকিয়াব শহরটা আগে অনেক প্রাণবন্ত ছিল। আরাকানে বৌদ্ধ ও মুসলমানরা শত শত বছর ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছিল। এমনকি তৎকালীন বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনেও রাখাইন বা বৌদ্ধদের পাশাপাশি অবদান রেখে এসেছে মুসলমানরা। এখন কিসের থেকে যে কী হয়ে গেল। মুসলমানদের মধ্যে আগের মতো শান্তি নেই আনন্দ নেই। তাদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে বর্মি সামরিক জান্তা।

১৯৮২ সাল। এ সময় হঠাৎ করে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়া হলো। শত শত বছর ধরে তারা আছে, আছে তাদের বাপ-দাদার ভিটে তবু সোহরাব, বদি আলম, রোখসানা, মোহাম্মদ হোসেনের মতো হাজারো মুসলিম নর-নারী হয়ে পড়লো অধিকারহারা।

২.

মোহাম্মদ হারেস উদ্দিনকে এতসব ভাবনা চিন্তা সত্ত্বেও কাজে বের হতে হবে। তা না হলে খাবে কী? শুধু সে একা নয়, তার পরিবার, তার আব্বা আম্মা। বাপ-দাদার আমল থেকে আকিয়াবের একটি মার্কেটে কাঠের কারবারি তারা। বার্মাটিক, লোহাকাঠ, গজারি, গামারি, কড়ই, শিল কড়ই নানা জাতের কাঠের আড়ৎ। আছে কাঠ চেরাইয়ের করাতকল।

দোকানে দু'বেলা পালা করে বাপ বেটা বসেন। হারেস উদ্দিনের বাবা মোহাম্মদ বাহাউদ্দিনের বয়স হয়েছে। ষাটোর্ধ্ব। তবে এই বয়সেও তিনি বেশ কর্মঠ। সকালে বা বিকেলে পালা করে দোকানে বসতে তার কোনো কার্পণ্য নেই। তার স্ত্রী মালেকা বেগমও বয়সের ভারে কিছুটা কাবু। সংসার তুলে দিয়েছেন বৌমা জরিনার হাতে। নামাজ পড়েন কুরআন শরিফ

www.icsbook.info

পড়েন। নাতি নাতনিদের দ্বীনের তালিম দেন, পয়গম্বরদের কেচ্ছা বলেন। এভাবেই দিন কেটে যায়।

দুপুরে থমথমে মুখে বাড়ি ফিরেছেন বাহাউদ্দিন। ২০১৭ সালের আগস্ট মাস। কোথায় জানি কী হয়েছে। তাই ক্ষেপেছে আর্মি। সব ছারখার করে দিচ্ছে। রোহিঙ্গারা এতদিন যে স্বপ্ন দেখে এসেছিল তা সব উবে গেছে। তারা আশায় বুক বেঁধেছিল, সু চি একবার ক্ষমতায় এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সু চি প্রেসিডেন্ট না হোক সর্বময় অধিকারী তো হয়েছে। কিন্তু তাদের ভাগ্যের বদল হলো কই। বরং উল্টোটাই হচ্ছে। সবাই নানা কথা বলাবলি করছে। লাখ লাখ লোক প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে। তাও ভালো বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে। তা না হলে সমুদ্রে ডুবে মরা ছাড়া পথ ছিল না।

: কিছুটি হবে না। জান্তা যেভাবে চালাবে মিয়ানমার সেভাবে চলবে। মুসলমানদের কপালে দুর্গতি আছে। সে দিন কে যেন বলছিল কথাটা।

: আমরা কি এ মাটির সন্তান নই? আমাদের কয়েক পুরুষের ভিটে এই আরাকান। আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতেই হবে। বলেছিলেন আরেকজন।

: অধিকার না ছাই! বাড়া ভাতে ছাই পাবে তোমরা। বলেছিলেন এ তল্লাটের প্রবীণ ব্যক্তি জায়েদুল হক। বয়স প্রায় নব্বই।

মিয়ানমার আর তার শাসকদের ভালো করে চেনা আছে তার। সারা জীবনই ছিল এ দেশ বার্মা। হালে হয়েছে মিয়ানমার। বার্মা নামের মাঝে ঐতিহ্য আছে। সেনারা তার বুঝবে কি। আরো কত কথা বলেন তিনি। তরুণরা অবশ্য তার কথা গায়ে মাখেনি। এখন তার কথাই সত্য হতে চলেছে। কি না করেছে বর্মি জান্তা? বার্মা তো পাল্টেছেই আরাকান নাম পাল্টে করেছে রাখাইন। আরাকানের ঐতিহাসিক রাজধানী তাদের প্রাণের শহর আকিয়াবের নাম দিয়েছে সিত্তুই। রাজধানী রেঙ্গুন হয়ে গেছে ইয়াঙ্গুন। আর এটা এখন রাজধানীও নেই। রাজধানী করা হয়েছে নেইপিডো। নামে কিবা আসে যায়? অধিকারটুকু পেলেও তো হতো। তাও তো পাচ্ছে না মুসলমানেরা।

www.icsbook.info

৩.

বিকেল থেকে দোকানে বসে আছে হারেস উদ্দিন। সামান্য কিছু বেচা বিক্রি হয়েছে। মনটা এমনিতেই ভালো নেই। এর মধ্যে এক রাখাইন নেতা কিসের যেন চাঁদার কথা বলে নিয়ে গেল কয়েক হাজার টাকা। হাতে ভোজালি নিয়ে হাটে সেই নেতা। খিন ইউ মিন। মাত্র কয়েক ক্লাস লেখা পড়া করেছে। এখন সে ছড়ি ঘোরায়। বর্মি সেনা আর লুণ্ঠক বাহিনী তার পকেটে। তাকে ভয় পায় না এমন কেউ নেই এ তল্লাটে। তাই বলতে গেলে তহবিল শূন্য করেই তাকে টাকা দিতে হয়েছে। কি আর করা। এ ছাড়া কোন উপায় নেই।

আরো খারাপ খবর অপেক্ষা করছিল হারেসের জন্য। কে একজন এসে বলে গেল-

: ব্যাপার স্যাপার ভালো ঠেকছে না, হারেস। চারদিকে কী ফিসফাস, শুনেছ কিছু?

: কী ফিসফাস? অবাক হয় হারেস।

: রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর বর্মিদের নজর পড়েছে। বদ নজর।

: এর মানে কী চাচা? বলেন তো।

: বুঝলা না। তোমাগ ঘরবাড়ি দোকানপাট ব্যবসাপাতি সব কাইড়া নিব ওরা। বললেন সত্তরোর্ধ্ব মোকাম ফকির। এ তল্লাটের অন্যতম প্রবীণ বাসিন্দা।

: কন কী? এত সোজা? আল্লাহর দুনিয়াত কি বিচার নাই?

: ওরা শক্তিশালী। ধর্মীয় নেতারা আছে ওদের পাশে, বর্মি জান্তা আছে। তোমাদের তো কিছুই নাই।

: আছে আছে। আমরাও এক লগে আছি সবাই। ঐক্যবদ্ধ আছি। প্রতিরোধ করতে চাই।

: এত বড় শক্তির লগে পারবা? অস্ত্র কই? ট্রেনিং দিব কেডা?

: লড়াই তো করুম চাচা। বিনা যুদ্ধে আমরা হার মাই না নিমু না।

এর পর বুড়ো হাহাহা করে হেসে ওঠেন। বিদায় নেন। সত্যি তো ঐক্য কই? অস্ত্র কই? ট্রেনিং কই? সহযোগী দেশ কই। তার কথা ধরলে অনেক কিছু, না ধরলে অর্থহীন হেঁয়ালি।

www.icsbook.info

৪.

হারেসের মুখ ভার দেখে স্ত্রী জরিনা প্রশ্ন করেন

: কী হৈল আপনার? মুখ ভার, কী চিন্তা করেন? কোন খারাপ খবর?

: হ্যাঁ, সোলেমানের মা, মনটা বড়ই খারাপ। দোকানে বেচা বিক্রি নাই। তার মাঝে হার্মাদের দল এতগুলা টাকা নিয়া গেল। পোলাপানেরে খাওয়ামু কী নিজেরাই কী খামু কেমনে বাচুম। পোলাপানের স্কুল মক্তব বন্ধ, মসজিদ জ্বালাইয়া দিতে চায় ওরা।

: কন কী?

: শুধু কি তাই। আমাগো তাড়ায়া দিবো– নাগরিকত্বের কথা ধোঁকাবাজি। কোন দিনই দিব না।

: সু চির কী মত? এত দিনতো সু চি সু চি করলেন।

: তার কথা আর বলবা না। সেনারাও যা করে নাই, এই মহিলা তার চেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ।

: কী রকম?

: আরাকানে কোন মুসলমানের চিহ্ন ওরা রাখবো না, এই তার সিদ্ধান্ত। দেখছো না সব দলে দলে পালাচ্ছে। কেউ বাংলাদেশ কেউ থাইল্যান্ড কেউবা সাগরে ভেসে মালয়েশিয়া। আমরা এতদিন ভুল করছি, তোমারে বলতে দ্বিধা নাই।

: হায় আল্লাহ্! আমাদের কী হবে? এবার ভয়ার্ত শোনায় জরিনার কণ্ঠ।

: নিজেরা কিছু না করলে কি আল্লায় করবে?

: কী কন। আল্লাহ্‌র রহমত কি আমরা পামু না।

: শোন জরিনা। আমরা পনেরো লাখের মতো মানুষ কোন কার্যকর কৌশল করতে পারলাম না, কোন প্রতিরোধ তো নয়ই।

: তাতো তলে তলে কিছু হচ্ছেই।

: ওতে হবে না, মার খাওয়া ছাড়া গতি নাই।

কথা আর এগোল না। গম্ভীর মুখে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন হারেসের স্ত্রী। প্রস্থান করলেন হারেসও।

৫.

বেশি দূর যেতে হলো না। দূর থেকে কামান না জানি রকেটের গোলা আঘাত হানলো বুচিডং-এর একটি মহল্লায়। তারপর দাউ দাউ আগুন, মৃত্যু

www.icsbook.info

বিভীষিকা। নিজের চোখে দেখতে পেল হারেস। যার পরনে যা ছিল আর হাতের কাছে যা পেয়েছে তা নিয়েই দল বেঁধে বের হয়ে পড়েছে পরিবারগুলো।

সন্ধ্যার আগ মুহূর্ত বলে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। কুন্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠছে। নিচে লাল আগুন। আগুনে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর জ্বলছে। রাত্রি নেমে এলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর দেখা যাবে না।

হারেস উদ্দিনের মনে হতে থাকলো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে যেন অং সান সু চির একটা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। মুখে পৈশাচিক হাসি। এমনিতে মহিলা গোমড়ামুখী। এত পৈশাচিক হাসি হাসতে পারেন তিনি! আগে তো কোন কালেই তা মনে হয়নি। এত দিনে ভুল ভাঙে হারেস উদ্দিনের। আসলে কথায় বলে না বড়র পিরিতি বালির বাঁধ।

৬.

রাত দশটা। সারা আকিয়াব শহর সুনসান। অন্যান্য দিন আরো কিছু সময় জেগে থাকে শহরটা। আজ যে কি হলো। সবাই পড়ি মরি বাড়ি ছুটছে।

আকিয়াব নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের সামনে মিলিটারির কয়েকটা লরি দাঁড়ানো। স্কুলটা তালাবদ্ধ দীর্ঘ দিন। ক্লাস হয় না। কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে রেখেছে। হারেস উদ্দিনের দুই ছেলে-মেয়ে সোলেমান আর আমিনা এই স্কুলে পড়ে। অন্যান্য রোহিঙ্গা ও রাখাইন শিশুরা তাদের সহপাঠী।

স্কুলের দুই দিকে দুটো রাস্তা। দুটোতেই যানবাহনের চলাচল কম। কয়েকটা ব্যাটারি চালিত টুকটুক চলছে। কেউ আসা যাওয়া করছে ত্রস্ত পায়ে, বলা বলি করছে, এখানে বুঝি মিলিটারি ক্যাম্প হবে।

: ক্যাম্প না ছাই। সব মানুষ মারার কল। রোহিঙ্গাদের ধরে ধরে এনে জবাই। মেয়েদের বেআব্রু করে নির্যাতন। এরই নাম ক্যাম্প। বুঝলা মিয়ারা।

: চাচা ঠিকই কইছেন। ততক্ষণে সেনারা স্কুলের মাঠে কয়েকটা তাঁবু করেছে। তালা ভেঙে ভেঙে স্কুলের ক্লাসরুমগুলোর বেঞ্চ বাইরে ছুঁড়ে ফেলে থাকার জায়গা করেছে। তার মানে তারা এখানে থাকবে অনেক দিন।

দিনে দিনে অভিযান চালায় যে সব কনভয় তারা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সন্দেহজনক লোকদের ধরে নিয়ে সরে পড়ে।

ভাগ্য ভালো থাকলে আটক লোকটা ছাড়া পায়। তা না হলে গুলিতে বুক

www.icsbook.info

ঝাঁজরা করে দক্ষিণের পাহাড়ের ঢালে লাশ ফেলে দেয়। পঞ্চাশ ষাট ফুট নিচে নালা। কেউ কোন দিন জানতেও পারে কোন দুর্ভাগা অকালে প্রাণ হারিয়ে কংকাল হয়ে পড়ে আছে ওখানে। সেখান থেকে কোন লাশ তুলে এনে দাফন করা সৎকার করা অসম্ভব।

রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ স্কুলের সামনে জড়ো হয় আরো কয়েকটি সাঁজোয়া যান। যুদ্ধ সন্নিকটে। শত্রু কোন দেশ নয়, কোন বহিঃরাষ্ট্র নয়। এ দেশের হতভাগা মুসলিম রোহিঙ্গা। ওদেরকে ঝাড়ে বংশে শেষ করার পরোয়ানা জারি হয়েছে। আর পরোয়া কী।

মাঠে প্যারেড করাচ্ছে কোয়ার্টার মাস্টার হ্লা মিন্ট থান। ভয়ঙ্কর এ অফিসার। তালে তালে প্যারেড করতে না পারলে সৈনিক কর্পোরালদের বেতের ঘা লাগাতে মোটেও কসুর করেন না।

: ফোর্সেস। অ্যাটেনশন। উই আর রেডি টু অপারেশন ফোর ফরটি ফোর। ৪৪৪। সবাই জানে এটা একটা কোড মাত্র।

: ইয়েস স্যার। উপস্থিত সৈনিকদের থেকে একজন জবাব দেয়।

: ফোর্সেস। যা যা বলা হয়েছে তেমন তেমন করা চাই। ডেস্ট্রয় অর কিল দেম অল। অর ড্রিভেন আউট ফ্রম আওয়ার টেরিটরি। ওভার।

এর অর্থ সৈনিকরা বোঝে। রোহিঙ্গাদের হয় মেরে ফেলতে হবে না হয় তাড়িয়ে দিতে হবে সীমান্তের ওপারে। তারা পুলকিতও। এবার বুঝি আর্মি ট্রেনিংটা কাজে লাগবে। লোককে অত্যাচার করেই আর্মির আনন্দ। আর্মি ট্রেনিংয়ের আসল কথা তো তাই।

: ফোর্সেস। আর একটা কথা। আবার শোনা গেল মিন্ট থানের কমান্ড। আওয়ার বুডিস্ট লিডারস আর অ্যাকোম্পেনি উইথ আস। বৌদ্ধ নেতারা আমাদের সাথে থাকবে। পরের কাজটি তারা করবে। ওভার।

মুহূর্তে বেরিয়ে গেল আটটি সামরিক যানের একটি কনভয়। এই কনভয়কে আরাকানে রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে বড় ভয়। শেষ যানটাতে আছে কিছু সিভিলিয়ান, বৌদ্ধ নেতারা। সেনাদের সহযোগী। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি স্থানে থামে সামরিক বহর। এই এলাকাটা রোহিঙ্গাদের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। অদূরে বাহাউদ্দিন হারেস উদ্দিনের বাড়ি। আরো বহু বাড়ি। এক সঙ্গে গর্জে ওঠে অসংখ্য মেশিনগান। ঠাঠা ঠাঠা। যেন ঘুমন্ত এলাকাবসীর সঙ্গে ঠাট্টা করছে, মরণ ঠাট্টা। এই ঠাট্টা মরণ যন্ত্রণার নাম।

আহতদের আর্ত চিৎকারে রাতের পরিবেশ ভয়ার্ত হয়ে উঠলো। যে

www.icsbook.info

পারলো পরনের কাপড় পরে দৌড়াতে লাগালো জঙ্গল আর নদীর ঘাটের দিকে। দেখতে দেখতে জনস্রোত। অসহায় নারী পুরুষের মিছিল। যারা দৌড়াতে পারেনি, মরে পড়ে আছে বাড়ির উঠানে, ঘরে। কোন দিন কোন জাতিসংঘ এ সবের খোঁজ রাখে না। একটা দল রাতের অন্ধকারে ধান ক্ষেতের আল বেয়ে বেয়ে চলেছে– কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ছে।

বাড়িঘরে আগুন দেয়া শুরু করলো আরেক দল। অনেক লাশ পড়ে আছে তাদের সামনে। পায়ের নিচে পড়ছে। যার প্রাণ বায়ু এখনো আছে সে কাতরাচ্ছে পানি পানি করে।

হারেস উদ্দিন তারেকের দাদী, তাহমিনা আর তারেককে নিয়ে নদীর ঘাটে দৌড়াতে লাগালেও পেছনে পড়ে গুলি খেয়ে পড়ে রয়েছে তার বাবা। না, পেছনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

তাহমিনার মাকে পাওয়া যাচ্ছে না। জানা গেছে কয়েকজন নারীর সঙ্গে তাকে ধরে নিয়ে গেছে হায়েনার দল।

না এরপর আর ভাবতে পারছে না হারেস উদ্দিন।

: হায় আল্লাহ। এও কপালে ছিল!

ওদিকে হাউ মাউ করে কেঁদে চলেছে তাহমিনা ও তারেক। আর সামনে অনিশ্চিত এক ভবিষ্যৎ। কোথাও আশ্রয়মিলবে না। বেঘোরে মৃত্যু তা একমাত্র আল্লাই জানেন, আর জানে ভবিতব্য।

www.icsbook.info

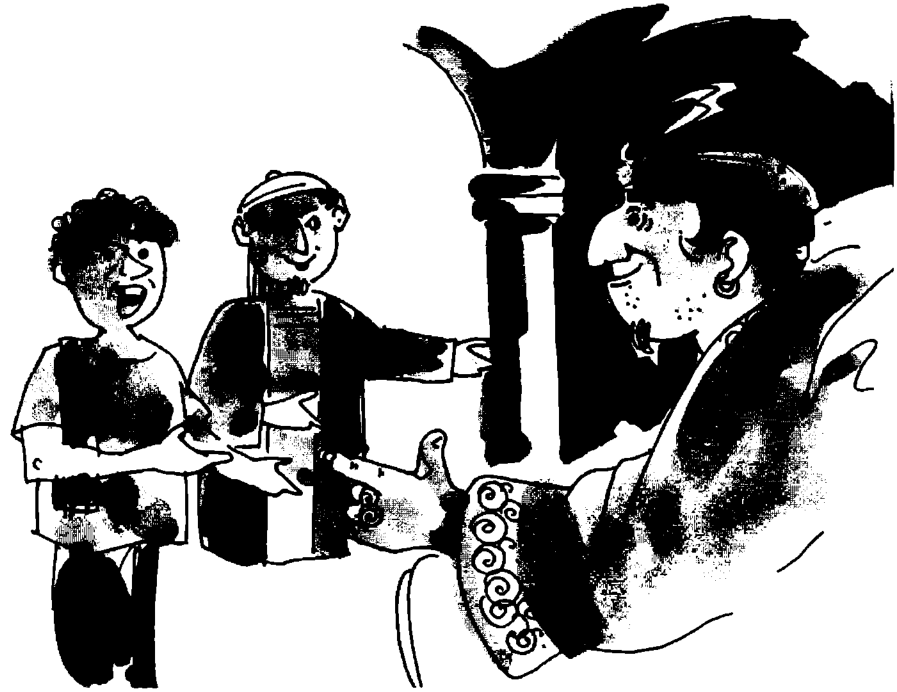

সততা ও ধূর্ততার লড়াই

রূপান্তর : হাসান হাফিজ

এক যে ছিলেন রাজা। তার দেশ ছোট হলে কী হবে। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য খুব বিখ্যাত। অন্যান্য দেশ থেকে নিয়মিত ব্যবসায়ীরা আসেন। পণ্য আমদানি রফতানি করেন। এ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক অনেক লাভ। সে জন্য ভিনদেশী ব্যবসায়ীদের ভিড়ভাট্টা এ দেশে লেগেই থাকে।

একবার হয়েছে কী, লোভী এক বণিক এসেছেন এই দেশে। আসবার দু-একদিন পরই বিশ্রী ঘটনার শিকার হলেন তিনি। ও এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। সেই কাণ্ড নিয়ে তুলকালাম। পথ চলার সময় ধূর্ত লোকটা কোনও কারণে অসাবধান ছিল। এক ফাঁকে ঘটলো সেই দুর্ঘটনা। হারিয়ে গেল তার টাকার ব্যাগ। ব্যবসায়ী যখন সেটা টের পেলেন, হায় রে হায়! তখন সে কী

www.icsbook.info

আর্তচিৎকার তার! চেঁচামেচি, কান্নাকাটিতে পাড়া মাথায় তুলে ফেললেন তিনি। ওই ব্যাগে ছিল অনেক টাকা-পয়সা। সঙ্গে এক হাজার সোনার মোহর। সবই লোপাট। চোখের পলকে কিভাবে হাওয়া গেল! আস্ত একটা জলজ্যান্ত ব্যাগ। আহ হা রে! টাকা পয়সা গেছে যাক। সে না হয় ধীরে সুস্থে রোজগার করে নেয়া যাবে। কিন্তু এতোগুলো সোনার মোহর? সে সব কোথায় মিলবে?যতই তিনি এ কথা ভাবেন, ততই তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। কোনোমতেই তিনি নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

রাস্তার মোড়ে যত লোকের সঙ্গে দেখা হলো, হড়বড় করে সবাইকে ব্যাগ হারানোর কথা জানালেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ মুখ ফুলে গেছে। এতগুলো সোনার মোহর হারানোর শোক তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্য! কেউই কোন হদিস দিতে পারে না তার ব্যাগের।

হারানো মোহর ফিরে পাওয়ার জন্য একটা কৌশল বের করলেন তিনি। লোভনীয় একটা পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। ব্যাগটা যে খুঁজে বের করে দিতে পারবে, সে পাবে এক শ' সোনার মোহর।

এক চাষি ব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়েছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় তার পায়ে ঠেকেছিল। সে সরল সোজা মানুষ। লোভী না। তার সততার জুড়ি নেই এ তল্লাটে। কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই তার মনের মধ্যে। ব্যাগ পেয়ে সে দেরি করলো না একটুও। ঝটপট ছুটে গেল ভিনদেশী সেই বণিকের কাছে। গিয়ে জানালো বৃত্তান্ত। নিজের বাড়ির কাছে মাছবাজারের পেছনে যে কেমন করে ব্যাগ পাওয়া গেল তার সবিস্তার বৃত্তান্ত।

বণিক লোকটি খুবই ধূর্ত। দুনিয়ার কাউকেই তিনি বিশ্বাস করেন না। এমনকি নিজের আত্মীয়স্বজকেও না। প্রথমটায় তিনি চাষিকে বিশ্বাস করছিলেন না যথারীতি। ব্যাগ হাতে পেয়ে তর সয় না তার। ঝটিতি সে গুনে গেঁথে দেখলো ভেতরে সব ঠিকঠাক আছে কি না। আশ্চর্য ব্যাপার! কোনো হেরফের নেই। সে যেভাবে রেখেছিল টাকা পয়সা, সোনার মোহর সব ঠিক আছে। কোনো নড়চড় হয়নি। একচুলও না। অবাক ব্যাপার। সে নিজে হলে ফেরত দিতো না। লোকটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত বোকা। না হলে সে এমন উল্টোপাল্টা কাজ করতে যাবে কেন? আনমনা হয়ে এসব কথা ভাবছিলেন তিনি। ব্যাগ ফিরে পেয়ে তিনি মহা আনন্দিত। কিন্তু একটুক্ষণ পর তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। কারণ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এক শ' মোহর

www.icsbook.info

তাকে পুরস্কার হিসেবে দিয়ে দিতে হবে। সে রকমই কথা। বিরাট লোকসানের ব্যাপার। তাই তো। অহেতুক এই গচ্চা দেয়ার ব্যাপারটি মেনে নেয়া যায় না। সেটা দারুণ বোকামি হবে। কী করা যায়, কী করা যায়! ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে ওঠে।

হঠাৎই একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে যায় তার মাথায়। তিনি ঠিক করেন, এই বেকুব চাষিটাকে কোনো মোহর টোহর দেয়া যাবে না। ভুলিয়ে ভালিয়ে ব্যাটাকে বিদায় করতে হবে কোনোমতে।

প্ল্যান মোতাবেক তিনি গলাটাকে সাধ্যমত মোলায়েম করেন। অভিনয় ছাড়া এই মামলা জেতা যাবে না। বিদেশ বিভুঁই বলে কথা। একটু অসাবধান হলেই মহা বিপদ! কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না। বরং ফাঁসিয়ে দেবে। মিষ্টি হাসি হেসে চাষিকে তিনি বলেন,

– ভাই চাষি, তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই। কী উপকার যে তুমি করেছো আমার। তার কোনো তুলনা নেই। এমন উপকার একই মায়ের পেটের আপন ভাইও আজকাল করে না। এই ঋণ কোনোভাবেই শোধ করতে পারবো না আমি। তোমাকে কী পুরস্কার দেবো আর। ব্যাগে আমি পেয়েছি নয় শ' সোনার মোহর। ছিল মোট এক হাজার। এইমাত্র গুনেগেঁথে দেখলাম। অর্থাৎ তুমি তোমার প্রাপ্য একশ সোনার মোহর আগেভাগেই নিয়ে নিয়েছো। এখন তুমি মানে মানে বাড়ি ফিরে যেতে পারো।

চাষি এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করে। সে ভাবতেই পারেনি এ ধরনের কথা লোকটা বলতে পারে। চিৎকার করে চাষি জানায়,

– এটা তুমি কী বলছো?আমি এই ব্যাগ খুলে পর্যন্ত দেখিনি। আমি সে করম লোকই না। সুতরাং এখান থেকে মোহর নেয়ার কোনোও প্রশ্নই ওঠে না। তুমি যা বলছো, ভেবেচিন্তে বলছো তো?

চাষির প্রতিবাদ গায়ে মাখেন না লোভী বণিক। আপন মনে তিনি বলে যান,

– আশা করি, পুরস্কারের এই একশ সোনার মোহর তোমার অনেক অনেক কাজে লাগবে। নিশ্চয়ই তোমার ভাগ্য বদলে দেবে। আমি তোমার শুভ কামনা করি। তুমি খুবই ভালো মানুষ। ভাই, তোমাকে আবারও অজস্র ধন্যবাদ জানাই। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে বিদায়ও জানাতে চাই তোমাকে।

সরলমনা চাষি তো হতবাক। ঘটনার আকস্মিকতায় তার বোবা বনে

www.icsbook.info

যাওয়ার জোগাড়। কী বলবে, সে বুঝে উঠতে পারছে না। এ কেমন ধারা লোকের পাল্লায় সে পড়েছে, তাই ভাবছে গালে হাত দিয়ে। পুরস্কার কপালে জুটলো না। ভাগ্যে না থাকলে নেই। এ নিয়ে তার মনে দুঃখ নেই কোনো। আফসোস হচ্ছে এই যে, মোহর না নিয়েও বিনা অনুমতিতে সেটা নিয়ে ফেলার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হলো তাকে। এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। সে ঠিক করলো, রাজার কাছে এই অন্যায়ের বিচার চাইবে। ন্যায়বিচারক হিসেবে এই রাজার সুনাম রয়েছে। তিনি নিশ্চয়ই চাষিকে বঞ্চিত করবেন না।

যেই ভাবা সেই কাজ। সে ছুটে গেল রাজপ্রাসাদে। মহারাজার কাছে সবিনয়ে পুরো ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললো। রাজা বুদ্ধিমান লোক। মানুষ চিনতে তিনি ভুল করেন না কখনও। সে অভিজ্ঞতা চটজলদি কাজে লাগালেন। তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিলেন যে এই চাষি লোকটা সত্যি কথা বলছে। কাউকে ঠকানো ওর মতো লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

মহারাজ বণিককে ডেকে পাঠালেন লোকমারফত। এও বলে পাঠালেন যে বণিক যেন তার সোনার মোহরওয়ালা ব্যাগটা সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

খবর পেয়ে বণিক এলেন দরবারে। বণিক তার পক্ষ থেকে রাজাকে জানালেন কী কী ঘটেছে। চাষিও তার বক্তব্য জানালো রাজাকে। রাজা মন দিয়ে দু'জনের কথাই শুনলেন। জটিল সমস্যা। একজন যা বলছে, অন্যজন বলছে তার বিপরীত কথা। এবার বিচার করবার পালা।

গম্ভীর হয়ে রাজা বলেন বণিককে,

– শোনো ভিনদেশী। তোমার যে ব্যাগ হারিয়ে গিয়েছিল, তাতে এক হাজার সোনার মোহর ছিল। তাই তো?

বণিক মাথা চুলকে বলেন,

– আপনি ঠিক কথা বলেছেন মহারাজ।

রাজা কী যেন ভাবেন। চিন্তা ভাবনা করার পর বলেন,

– তুমি হয়তো সত্যি কথাই বলেছো। খাঁটি সত্যক খুঁজে বের করা আসলেই কঠিন একটা কাজ। কারও প্রতি কোনো অবিচার করতে চাই না আমি। সেটা আমার স্বভাবেই নেই। দেখি তো ব্যাগটা।

ব্যাগটা মামুলি ধরনের। অন্য পাঁচ দশটা চামড়ার ব্যাগ যে রকম হয় ঠিক তেমনই। আলাদা কোনও বিশেষত্ব নেই। একই ধরনের আর একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে রাজা বলেন,

www.icsbook.info

– এটা যে তোমারই ব্যাগ, তার প্রমাণ কী? তুমি বলেছো, তোমার ব্যাগে এক হাজার সোনার মোহর ছিল। দুটো ব্যাগের মধ্যে থেকে তোমারটা কি তুমি বেছে নিতে পারবে?

বণিক পড়লেন মহা ফাঁপরে। তিনি তোতলাতে থাকেন। এ ধরনের বাজে অবস্থায় পড়তে হবে, তিনি ঘুণাক্ষরেও এ কথা ভাবেননি। তোতলাতে তোতলাতে কোনো কথা জোগায় না তার মুখে।

রাজার মুখে মুচকি হাসি। তিনি বললেন,

– আমি নিশ্চিত যে, এটা তোমার ব্যাগ নয়। কারণ তুমি অকাট্য কোনো প্রমাণ দিতে পারছো না। আমার পরামর্শ হলো, তুমি রাস্তাঘাটে তোমার ব্যাগ খোঁজার কাজে লেগে পড়ো আবার।

এরপর তিনি তাকালেন চাষির দিকে। হাসতে হাসতে বললেন,

– এই ব্যাগে যে নয় শ' সোনার মোহর আছে, আমি তার হেফাজতের দায়িত্ব দিচ্ছি তোমাকে। এর সত্যিকারের মালিক যতদিন না আসবে, ততদিন পর্যন্ত তুমি এর দেখভাল করবে। যত্ন করে রাখবে। যদি তিন মাসের মধ্যে কোনো দাবিদার না পাওয়া যায়, তাহলে এই ব্যাগ তোমার হয়ে যাবে।

চিরকালের জন্য। সেটা হবে তোমার সততার পুরস্কার।

বণিক স্তম্ভিত। রাজার রায় শুনে তার অজ্ঞান হয়ে পড়ার দশা। তার কোনো কথা রইল না বলার।

রাজার আদেশ মানতেই হবে। অমান্য করার কোনো সুযোগ অবশিষ্ট নেই। সেই চেষ্টা করতে গেলে মহাবিপদে পড়তে হবে। সেটা বণিক এখন টের পাচ্ছেন হাড়ে হাড়ে। চেঁচামেচি করে কোনো লাভ নেই আর। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। অতি লোভে হারাতে হয়েছে সবই।

চাষি ও বণিক এরপর রাজদরবার ত্যাগ করেন। যে যার ঠিকানায় রওনা হন।

একজন মহা খুশি। অপর জনের মুখচোখ ভীষণ ভীষণ কালো। তাকানো যায় না এমনই অবস্থা।

www.icsbook.info

ঐতিহাসিক বিজয়

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্

এন্তাকিয়ায় রোমীয় সম্রাটের রাজ দরবার। দরবারে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি, পণ্ডিত, সেনাধ্যক্ষ, গোত্রপতিদের সমাবেশ। সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিংহাসন ছেড়ে রাগান্বিত স্বরে সভাসদকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, "মুসলমানদের শক্তি এমন কী? অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকেও তোমাদের তুলনায় দুর্বল, তবুও তাদের সামনে তোমরা কেন দাঁড়াতে পারছ না? কেনইবা দামেশ্‌ক, ফাহাল, হেম্‌স-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ নগরী, জনপদ মুসলমানদের দ্বারা পদানত হলো?"

পুরো দরবারে নীরবতা নেমে এলো। কারো মুখে একটু টুঁ শব্দও নেই। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সবাই। কী করে সম্রাটের প্রশ্নের উত্তর দেবে। অনেকের কাছে অনেক উত্তর জানা থাকলেও বুকে বল পাচ্ছে না। একজন

www.icsbook.info

অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তি বহু কষ্টে সঞ্চিত সাহস নিয়ে সম্রাটের কাছে নিবেদন করলো, "জাঁহাপনা, মুসলমানদের চরিত্র আমাদের চাইতে অনেক উন্নত। তারা দিনে রোজা রেখে আমাদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে, আবার সমস্ত রাত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকে। তারা একে অন্যের হক নষ্ট করে না, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় না, কারো প্রতি অন্যায়-অবিচার করে না, পরস্পর ভাইয়ের মতো বসবাস করে। অন্যদিকে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত। আমরা মদ্যপান করি, খারাপ কাজ করি, ওয়াদা খেলাপ করি, একে অন্যের ওপর জুলুম করি। এ কারণেই মুসলমানদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই তেজোবীর্য ও সাহসিকতা পরিলক্ষিত হয়। আর আমাদের প্রত্যেকটি কাজেই সাহস ও দৃঢ়তার অভাব থাকে।"

হিরাক্লিয়াস অভিজ্ঞ বৃদ্ধের কথা শুনে নিজেই লজ্জিত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, মুসলমানদের শেষ আক্রমণের লক্ষ্য রাজধানী এন্তাকিয়ায়ও নিরাপদে থাকা যাবে না। তিনি গোপনে সিরিয়া রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু জনগণের চরম চাপের মুখে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। শপথ গ্রহণ করলেন, পালানো যখন যাবে না, তখন শেষ লড়াই করেই যাবেন। এ লড়াইয়ে হয় জয়, নয় মৃত্যু। ঘোষণা করলেন– পুরো রোম সাম্রাজ্যের সব বীর সেনানী যেন রাজধানী এন্তাকিয়ায় দ্রুত এসে হাজির হয়। মুসলমানদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, "রোমীয়রা বীরের জাতি, তারা কখনো অন্য কাউকে তাদের ওপর কর্তৃত্বের ভার দিতে রাজি নয়।"

সম্রাটের নির্দেশ পেয়ে পঙ্গপালের মতো সৈন্যবাহিনী এসে এন্তাকিয়ার মাঠ-ঘাট ভরে গেল। মুসলিম সেনাপতি আবু উবায়দা (রা) রোমীয়দের ব্যাপক যুদ্ধপ্রস্তুতির খবর পেলেন। তিনি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য হেম্‌স ত্যাগ করে দামেশক পৌঁছলেন। সেখানে অন্যান্য বিজিত অঞ্চলের সেনাপতিদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। বৈঠকে অংশ নিলেন বিশিষ্ট সেনাপতি ইয়াজিদ ইবনে-আবু সুফিয়ান, শরজিদ ইবনে হাছান, মাআজ ইবনে জাবল (রা) প্রমুখ। বৈঠকের পরামর্শমত জর্ডানের নিকটবর্তী প্রশস্ত এবং যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থান দেখে ইয়ারমুক নামক স্থানে রোমীয়দের গতিরোধ করতে শিবির রচনা করলেন। ইতঃপূর্বেই মহাবীর খালেদ (রা) সৈন্য নিয়ে সেনাপতি আবু উবায়দার সাথে মিলিত হলেন। আবু উবায়দা আমিরুল মু'মিনিন হযরত উমর (রা)-এর কাছে যুদ্ধ পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে নিজেদের

www.icsbook.info

প্রস্তুতির কথা জানালেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে দূত পাঠালেন।

হযরত উমর (রা)-এর দরবার। জরুরি প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের ডেকে পাঠালেন। সবারই মনে উৎকণ্ঠা, খলিফার পক্ষ থেকে হঠাৎ কোন্ নির্দেশ এসে পড়ে। কোন সুসংবাদ না দুঃসংবাদ? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন সাহাবীদের মনে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগলো। খলিফা সেনাপতির পত্রখানি বের করে পড়তে শুরু করলেন : রোমীয়গণ চারদিক প্রকম্পিত করে ছুটে আসছে। তাদের বিপুল সৈন্যবাহিনীর সাথে সংসার ত্যাগী পাদ্রিগণ পর্যন্ত গির্জা ছেড়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

পত্রসংবাদ শুনে সমবেত সকলে অশ্রু সংবরণ করতে পারলো না। তাঁরা চিৎকার করে বলে উঠলেন : আমিরুল মু'মিনিন! আমাদের যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিন; আমরা আমাদের বিপন্ন ভাইদের রক্ষার জন্য জীবন কোরবানি করবো। আল্লাহ্ না করুন, যদি তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে আমাদের বেঁচে আর লাভ কী? হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) দাঁড়িয়ে আবেগের সাথে বললেন : "আমিরুল মু'মিনিন! আপনি সেনাপতি হউন, আমরা আপনার সহযাত্রী হয়ে আমাদের ভাইদের রক্ষা করবো জালিম রোমীয়দের হাত থেকে।" বিভিন্ন প্রস্তাবের পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, খলিফার প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে দূত ইয়ারমুক যাবে। আরো রসদ-সৈন্যসহ সাহায্য পাঠানো হবে।

ইয়ারমুকে সত্য আর মিথ্যার সম্মুখ লড়াই। মুসলিম সেনাপতি হযরত আবু উবায়দা (রা), রোমীয় সেনাপতি বাহানা। মুসলিম পক্ষে সহস্রাধিক মুজাহিদসহ ৩৫ হাজার সৈন্য। পক্ষান্তরে রোমীয়দের দুই লক্ষ সৈন্য। যুদ্ধপ্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। এ মুহূর্তে আমর-বিন-সাইদ এক হাজার মুজাহিদ নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাজির হলেন। এদের দেখে মুসলমানরা নতুন প্রেরণা লাভ করলেন। ঠিক সে সময় কাসেদ (দূত) যুদ্ধ ময়দানের প্রতিটি সারিতে গিয়ে উচ্চস্বরে খলিফার বাণী পড়ে শুনালেন। খলিফা লিখেছেন, "হে মুসলিম মুজাহিদগণ! তোমরা বীরবিক্রমে শত্রুর সম্মুখীন হও, মরণপণ যুদ্ধ করে তাদের চরম শিক্ষা দাও। আমি সুনিশ্চিত যে, ইনশাআল্লাহ্ তোমরাই বিজয়ী হবে।" মুজাহিদদের মনে খলিফার বাণী নবোদ্দীপনায় শত্রু মোকাবেলার উৎসাহ জোগালো।

প্রথমে বীর কেশরী খালেদ (রা) পদাতিক বাহিনীর একটি দল নিয়ে

www.icsbook.info

শত্রুর সম্মুখীন হলেন। রোমীয়দের এক বিশালদেহী পাদ্রি হাতির পিঠ থেকে মুসলমানদের মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানালো। পাদ্রির আহ্বানে বৃদ্ধ সাবরা ইবনে মসরুক্ অগ্রসর হলেন। কিন্তু খালেদ তাঁকে নিষেধ করে কায়েসের প্রতি নির্দেশ দিলেন। নির্দেশপ্রাপ্তির সাথে সাথে কায়েস ক্ষিপ্রগতিতে পাদ্রির মস্তক ভূতলে নিপতিত করলো। পাদ্রির অস্ত্র কোষমুক্ত করার সুযোগও পেলো না। প্রথম জয়ে ৩৫ হাজার মুজাহিদের আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো। যুদ্ধের শুভ সূচনায় মুসলমানরা উৎসাহ বোধ করলো। সারাদিন একক, দ্বৈত, জোটভুক্ত যুদ্ধ হলো। রোমীয়রা চরমভাবে পরাজিত হয়ে সন্ধ্যায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলো।

রোমীয় সেনাপতি বাহানা বুঝতে পারলেন, যুদ্ধ করে মুসলমানদের ঠেকানো যাবে না। তাই মুসলমানদের অসচ্ছলতার প্রতি লক্ষ রেখে প্রচুর অর্থ দিয়ে যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টা চালালেন। জর্জ নামক এক দূত দ্বারা আবু উবায়দার প্রতি সন্ধির আলোচনার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণের আমন্ত্রণ জানালেন। জর্জ মুসলিম শিবিরে গিয়ে দেখলো, সমস্ত মুসলমানরা এক কাতারে মাগরিবের নামাজ আদায় করছেন। তাঁদের মনে নেই কোনো শঙ্কা, নেই কোনো ব্যস্ততা এক ইমামের নেতৃত্বে একাগ্রচিত্তে সুশৃঙ্খলভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করছেন। এ দৃশ্য জর্জের মনেও তোলপাড় সৃষ্টি করলো। নামাজ শেষে সাধারণ বেশে সেনাপতি আবু উবায়দা (রা)-কে দেখে আরো আশ্চর্য হলো। জর্জ উবায়দার হাতে বাহানার পত্র দিয়ে জানতে চাইলো হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধে, তাঁর ধর্মের মত কী? আবু উবায়দা (রা) কুরআনের আয়াত দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলেন। সাথে সাথে জর্জ আবু উবায়দা (রা)-এর হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করলেন। সে আর রোমান শিবিরে ফিরে যেতে চাইলো না। আবু উবায়দা বুঝালেন, "তুমি যদি ফিরে না যাও তবে রোমীয়রা আমাদের বিশ্বাসঘাতক মনে করবে। এখন তুমি ফিরে যাও আপন শিবিরে। কাল সন্ধির আলোচনার জন্য আমাদের দূত গেলে তার সাথে চলে এসো। সেনাপতির পরামর্শ অনুযায়ী জর্জ ফিরে গেল।

পরদিন যুদ্ধ হলো না। সন্ধির আলোচনার জন্য মহাবীর খালেদ (রা) রোমীয় শিবিরে বাহানার সাথে দেখা করলেন। বাহানা নানা কথা শেষে প্রস্তাব দিলেন, "তোমরা যাযাবর বেদুইন গরিব জাতি। অর্থের লোভে আমাদের সাথে শুধু শুধু যুদ্ধ করছ। তোমাদের মুসলিম সেনাধ্যক্ষকে দশ

www.icsbook.info

হাজার, তাঁর অধীন সেনাপতিদেরকে এক হাজার এবং সাধারণ সৈন্যদের প্রতিজনকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দান করা হবে। তারা যেন যুদ্ধ না করে আরবে ফিরে যায়।"

মহাবীর খালেদও দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, "মুসলমানরা গরিব হতে পারে, তাঁদের আল্লাহ্ ও রাসূল (সা) গরিব নয় যে, তাঁরা অর্থের বিনিময়ে নিজের ঈমানকে বিক্রি করে দেবে। তোমাদের সাথে যুদ্ধ হবে কী হবে না সে জন্য আমাদের তিনটি শর্ত রয়েছে– এক. আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনো; দুই. মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া কর আদায় করো, আর ঐ দু'টি শর্ত না মানলে; তিন. তোমাদের বিরুদ্ধে ইসলামের শাণিত তলোয়ার প্রস্তুত রয়েছে। ময়দানই তার ফয়সালা দেবে।"

আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। খালেদ (রা) নিজ শিবিরে ফিরে এসে বাহানার প্রস্তাব শুনালেন মুজাহিদদের। প্রস্তাব শোনামাত্র মুজাহিদবৃন্দ ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিলেন, "আমরা আল্লাহ্‌র পথে হাসিমুখে জীবন দেবো কিন্তু কোনো প্রকার অপমান সহ্য করবো না।"

তৃতীয় দিন হক আর বাতিলের চূড়ান্ত যুদ্ধ। সাইফুল্লাহ খালেদ (রা) ৩৫ হাজার সৈন্যকে ৩৫ সারিতে ভাগ করে সম্মুখে-পেছনে, ডানে-বামে বিভিন্ন বীরসেনানীকে দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন। অস্ত্র এবং সৈন্যের শ্রেণি অনুযায়ী নতুন কৌশল অবলম্বনে আক্রমণের পরামর্শ দিলেন।

সাহসী বক্তা, কবি গায়কদেরকে নিযুক্ত করলেন উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা, কবিতা ও গান দিয়ে মুজাহিদদের উৎসাহ প্রদানের। অনেকে সূরা আনফালের যুদ্ধের আয়াত পড়ে মুজাহিদদের প্রেরণা দান করতে লাগলেন। মহিলা মুজাহিদরা সেবা ছাড়াও কোষমুক্ত তরবারি, তাঁবুর খুঁটি নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় তৎপর থাকলেন।

রোমীয়রা মুসলমানদের ওপর মরণ কামড় হানার জন্য দুই লক্ষ সৈন্যের পুরো বাহিনী নিয়ে ময়দানে হাজির হলো। তারা সম্মুখে ৩০ হাজার পায়ে শেকল বাঁধা সৈন্য মোতায়েন করলো। যারা মারবে, নয় মরবে কিন্তু পালাতে পারবে না। হস্তী, অশ্ব, তীরন্দাজ, পদাতিক নানা সুসজ্জিত বাহিনীর সমারোহ ঘটলো অভূতপূর্ব কৌশলে।

যুদ্ধের শুরুতে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করতে মুসলমানদের দারুণ কষ্ট স্বীকার করতে হলো। শহীদ হলেন অনেকে। কিছু সৈন্য ক্ষণিকের জন্য পশ্চাৎপদ হলেন। কিন্তু খালেদ বিন ওয়ালিদ, সাঈদ-ইবনে-যায়েদ, ইয়াজিদ-ইবনে-

www.icsbook.info

সুফিয়ান, আমর-ইবনে-আস, শুরাহ্বিল-ইবনে-হাসান প্রমুখ জিন্দাদিল মুজাহিদের মরণপণ লড়াইয়ে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। তাঁরা বারবার শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে কচুকাটার মতো রোমীয়দের লাশের স্তূপ সৃষ্টি করলো। স্বয়ং সেনাপতি বাহানা রুমালে মুখ ঢেকে প্রাণ বাঁচালো।

ভেঙে পড়লো রোমীয়দের মনোবল। শত্রুরা জীবন নিয়ে পালাতে লাগলো। যুদ্ধ-ময়দানের পাশে ছিল বিশাল পানির স্থল। মুজাহিদরা শত্রুদের সমতলে পালানোর গতিপথ রোধ করে সেদিকে দিকে ধাবিত করলো। এক নিমেষে শত্রুর লাশে সেটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। শত্রুমুক্ত হলো ইয়ারমুক ময়দান। যুদ্ধে প্রায় তিন হাজার মুজাহিদ শহীদ হলেন, শত্রু পক্ষ মারা গেলো সত্তর হাজার থেকে এক লক্ষ। ইসলামের বিজয় নিশান পতপত করে মরু বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকলো। সেনাপতি আবু উবায়দা (রা) দ্রুত বিজয় সংবাদ নিয়ে দূত পাঠালেন খলিফার দরবারে।

এন্তাকিয়ায় অবস্থানকারী সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বুকে যুদ্ধ পরাজয়ের শেল বিঁধলো। নিজের জান বাঁচানোর জন্য দ্রুত কনস্টান্টিনোপলের দিকে পা বাড়ালো। বিদায় বেলায় হিরাক্লিয়াস পরাজয়ের গ্লানিতে অশ্রুসিক্ত নয়নে সিরিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো : বিদায় সিরিয়া, বিদায়...।

www.icsbook.info

তানিজিং গ্রহের আগন্তুক

মহিউদ্দিন আকবর

আবির বিস্ময়ভরা চোখে অদ্ভুত পোশাক পরা দুইজন অচেনা আগন্তুককে নীরবে পা ফেলে ফেলে ওদের বাড়ির পাশের বিশাল বাগিচা চষে বেড়াতে দেখছে। সে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হলো। হাজার হাজার ফল-ফলারি আর কাঠের গাছে ঘেরা এই বাগিচা। প্রায় দুই শ' বছরের পুরনো। আবিরের পূর্ব পুরুষেরা নিজেদের প্রয়োজনেই প্রায় তিন একর জমির ওপর তৈরি করে গেছেন এই বাগিচা। বর্ষার মওসুমে সহজে কেউ বাগিচায় ঢুকতে চায় না। কারণ, এ সময় নানা জাতের বিষধর সাপ এসে আশ্রয় নেয় গাছের শাখা, কোটর আর ঝোপ-ঝাড়ে। তবে শীত ও বসন্তে এই বাগিচা থাকে বেশ সুনসান। বিশেষ করে বসন্তকালে ঝকঝকে

www.icsbook.info

নতুন পাতার সাথে বিভিন্ন গাছের বাহারি ফুলে বাগিচা সেজে ওঠে অপরূপ সুন্দর হয়ে। তারপর যখন গ্রীষ্মকাল এসে হাজির হয়, তখন তো কথাই নেই। হরেক ফলের মিষ্টি মধুর ঘ্রাণে পুরোটা বাগিচা যেন মৌ মৌ করতে থাকে। আর সে সুযোগে কেবল আবিরদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই নয়, আশপাশের বাড়ির– মানে, পাড়া পরশি ছেলেরাও এসে জম্পেশ আড্ডা গড়ে তোলে বাগিচার ফাঁক-ফোকরে। আর সে সুবাদে সুযোগ মতো আম, জাম, লিচুও পেড়ে খেয়ে নেয়। তাতে অবশ্য আবিরের আব্বু হাঁক-ডাক করেন না। তিনি বলেন, বছরে একবারই তো ছেলেরা অমন দুষ্টুমি করে। সব ফল পেড়ে বাগান উজাড় করে তো আর নিয়ে যায় না।

আর যেদিন ঘটা করে বিভিন্ন গাছের ফল পেড়ে বস্তা ভরা হয়– সেদিন তো কথাই নেই। সবার ঘরে ঘরে কিছু ফল পাঠানো হয়। কেবল নিজেরাই না খেয়ে পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধুদের নিয়ে খাওয়ার আনন্দই আলাদা। আবিরের আব্বু বলেন, আমার বাপ-দাদার আমল থেকেই এই নিয়মটা হয়ে আসছে। তাতে সবার আশীর্বাদ পাওয়া যায়।

কিন্তু এই বর্ষাকালে যেখানে বাগানের ত্রিসীমানায় যেতেই সবাই ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে, সেখানে ওরা দুইজন এতো সময় ধরে বাগান চষে বেড়াচ্ছে কোন্ সাহসে! ওরাইবা কারা? ওদের পোশাকও কেমন অদ্ভুত! যেন কোন অভিযাত্রী দলের সদস্য। মাথায়ও হেলমেট আঁটা।

আবির অন্য কাউকে যে ডেকে এ দৃশ্য দেখাবে সে সুযোগও নেই। চারদিকে থৈ থৈ পানি। পুরো গ্রামটাই পানির ওপর ভাসছে। তার মাঝে উঁচু উঁচু ভিটিতে চরের মতো জেগে আছে গ্রামের বাড়ি-ঘরগুলো। আর আবিরদের বাড়ি তো অন্যান্য বাড়ি থেকে একটু উঁচু জমিতেই। তবু নৌকা ছাড়া বের হওয়ার উপায় নেই। বাড়ির চারদিক জুড়ে থৈ থৈ পানি। আবার মাঝে মাঝেই বৃষ্টি নামছে। এরই মাঝে স্কুলপড়ুয়ারা চলে গেছে যার যার স্কুলে। কেবল শরীরটা গরম গরম বলে আবিরই রয়ে গেছে বাড়িতে। পড়ারঘর থেকে সোজা নজর ফেলতেই আবির চমকে ওঠে লোক দুটোকে বাগিচায় হাঁটাহাঁটি করতে দেখে। তাই প্রথম থেকেই চুপচাপ ওদের গতিবিধির ওপর নজরটা ধরে রেখেছে।

ওর কখনো মনে হয়েছে আসলে লোকগুলো সাপুড়ে। হয়তো সাপের সন্ধানে বাগিচায় ঢুকেছে। কিন্তু একটু পরেই আবির নিজের ভুল বুঝতে পারে। জীবনে ও অনেক সাপুড়ে দেখেছে। তাদের পোশাক তো অমন নয়।

www.icsbook.info

তা ছাড়া সাপুড়ে হলে তো সাথে থাকবে সাপ ধরার ঝাঁপি, নাগিন বাঁশি আর লাঠি। ওদের সাথে ওসব নেই। তবে হাতে লাঠির মতোই কী একটা যেন রয়েছে। সেই জিনিসটি দিয়ে ওরা মাঝে মাঝে বড় বড় গাছের গোড়ায় খোঁচা মেরে কিছু একটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে।

হঠাৎই ওদের মাথায় আঁটা হেলমেট থেকে একটা লাল আলোকরশ্মি বেরিয়ে একটা বৃত্তের মতো ওদের চারদিকে চওড়া রিং বলয়ের সৃষ্টি করে ঘুরপাক খেতে শুরু করে। দৃশ্যটা দেখে আবিরের মাথাটাও ঝিমঝিম করতে থাকে। দুই মিনিটের মধ্যেই আবির বুঝতে পারে, ওর পুরো শরীরটা একটা বাতাসে ভরা বেলুনের মতো হালকা হয়ে গেছে। আবির শক্ত হয়ে চেয়ার আঁকড়ে বসতে চায়। কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ও পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ও অনেকটা গ্যাসভরা বেলুনের মতোই শূন্যে উঠে যাচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে শূন্যে ভেসে ভেসে ছুটে যেতে থাকে লোক দু'টির দিকে। আবির প্রাণপণে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আকাশ-বাতাস তোলপাড় করে চিৎকার দেয়।

কিন্তু একি! ওর মুখ থেকে একটা শব্দও বের হয় না। আবির ভীষণ ভড়কে যায়। শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থির থির করে ওর সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। আর এভাবেই ওর পুরো শরীরটা আগন্তুকদের লাল আলোর বলয়ের ভেতরে চলে যায়। আলোর বলয়ের সাথে সাথে আবিরও ঘুরতে থাকে আগন্তুকদের চারপাশে। আর সে অবস্থায়ই ওরা আস্তে আস্তে বাগিচা থেকে বের হয়ে শূন্যে ভাসতে ভাসতে চলে যায় দূরদিগন্তে। আবির আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ও সেন্স হারিয়ে ফেলে।

আবিরের যখন সেন্স ফিরে পেলো, তখন আবির আর গ্রামীণ পরিবেশে নেই। আলো ঝলমলে একটা গোলাকার ঘরের মাঝে চমৎকার আয়েশে সোফায় বসে আছে। ওর মাথায় হেলমেট লাগানো হয়েছে আর ওর মুখোমুখি হয়ে বসে আছে সেই আগন্তুকরা।

আবির ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, আমি এখানে কেন? তোমরাইবা কারা? আর আমাকেইবা ধরে এনেছো কেন? আমার কী অপরাধ?

একসাথে এতোগুলো প্রশ্ন শুনে আগন্তুকদের একজন রিদেমিক কণ্ঠে বলে, ভয় পেয়ো না আবির। আমরা তোমার বন্ধু। আমরা চাই তুমি বায়োনিক ক্ষমতা নিয়ে বেড়ে ওঠো। তাই তোমার মাথায় আমরা এনার্জি বারমেট স্থাপন করেছি। একটু পরই ওতে চার্জ করে তোমাকে বায়োনিক

www.icsbook.info

ক্ষমতার অধিকারী করে ছেড়ে দেবো। তখন তুমি একা একাই বাড়িতে চলে যেতে পারবে। সময় লাগবে মাত্র পনের মিনিট। তবে বাড়িতে পৌঁছেই তুমি বারমেটটা লুকিয়ে ফেলবে। এই বারমেটই হবে তোমার চলাচলের বাহন। যখনই মাথায় পরে রিমোট চার্জ করবে, সাথে সাথে প্রতি মিনিটে চলে যেতে পারবে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। কেউ টেরও পাবে না। যখন খুশি তখনি তুমি আমাদের এই বায়োনিক স্পেসে চলে আসতে পারবে। তারপর মন চাইলে আমাদের সাথে সাথে আমাদের তানিজিং গ্রহেও ঘুরে আসতে পারবে। তবে এখনই আমরা তোমাকে আমাদের গ্রহে নিয়ে যেতে চাই না। আমরা পৃথিবীতে আমাদের একজন প্রতিনিধি হিসেবে তোমাকে পেতে চাই বলেই তোমার সাথে এই বন্ধুত্ব। তোমাকেই– শুধু তোমাকেই আমাদের পছন্দ। আমরা তোমাদের পৃথিবীতে আরো কিছু স্পেস পাঠিয়েছিলাম। সেগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে জানি না। আমাদের বিশ্বাস, সেই স্পেসগুলোকে খুঁজে বের করতে তুমিই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। কারণ পৃথিবীর অধিবাসী মানুষ হিসেবে তোমার জন্য ওই কাজটা যতো সহজ হবে, আমাদের জন্য তা ততোটাই ঝুঁকিপূর্ণ। তুমি শুধু কথা দাও বন্ধু– তুমি কখনো আমাদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। আমরাও কখনো তোমার কোন ক্ষতি করবো না। কি বলো আবির? তুমি রাজি তো?

আবির মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব শুনে একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললো, রাজি মানে! একশ বার রাজি। তবে তোমরা আর প্রকাশ্যে আমার কাছে আসবে না।

আগন্তুকরা মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, ঠিক আছে।

অমনি আবিরকে ধাক্কা লাগায় ওর বড় ভাই নিবিড়। –এই আবির, কি সব রাজি রাজি বলছিস? তোর তো রীতিমত জ্বর উঠে গেছে অ্যাঁ! আরে সত্যি সত্যি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে দেখছি। এভাবে ঠাণ্ডা হাওয়ায় উদোম গায়ে বসে বসে ঝিমোচ্ছিস আর আবোল তাবোল বকছিস। ওঠ ওঠ ঘরের ভেতরে চল।

ভাইয়ার কথা শুনে আবির চোখ মেলে নিবিড়ের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

www.icsbook.info

অঙ্গীকার

ইকবাল কবীর মোহন

ইউরোপের নামকরা দেশ স্পেন। এক সময় এখানে ছিল মুসলিম শাসন। স্পেনের এক বিখ্যাত শহরের নাম কর্ডোভা। সেই শহরে বাস করতেন একজন আরবীয় শেখ। তিনি বিপুল ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। লোকেরা তাকে সরদার বলে মান্য করত। তার বাসভবনের সামনে ছিল সাজানো গুছানো বাগান। একদিন তিনি বাগানে আপনমনে পায়চারি করছিলেন। এমন সময় ঘটল এক অবাক কাণ্ড! অপরিচিত এক যুবক হন্তদন্ত হয়ে শেখের বাগানে ঢুকে পড়ল। হাঁফাতে হাঁফাতে যুবকটি শেখের দু'পা জড়িয়ে ধরে বলল,

'আমাকে বাঁচান হুজুর! আমি মহাবিপদে পড়েছি, আমাকে বাঁচান।'

যুবকের আকস্মিক আবদারে শেখ সাহেব খানিকটা থতমত খেয়ে গেলেন। তিনি এবার যুবককে টেনে তুলে বললেন,

'কী হয়েছে তোমার? তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?'

www.icsbook.info

প্রচণ্ড ভয়ে যুবক কোনো কথাই বলতে পারছিল না। সে হাঁফাচ্ছে আর পেছনে রাস্তার দিকে বারবার তাকিয়ে কাঁপছে।

এর মধ্যেই সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,

'জনাব, আমি বিপদে পড়েছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। না হয় ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।'

শেখ যুবকের কথার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন,

'আচ্ছা বুঝলাম তুমি বিপদে পড়েছ। তবে বলবে তো কী তোমার বিপদ। কে তোমাকে মারতে চায়-খুলে বল।'

যুবক এতক্ষণে খানিকটা স্থির হলো। সে রাস্তার দিকে বারবার তাকাল আর বলল,

'আমি ভুল করেছি। আমার সাথে এক যুবকের ঝগড়া হয়েছে। রাগের মাথায় আমি তাকে আঘাত করেছি। আর অমনি যুবকটি মারা গিয়েছে। ওর সঙ্গীরা আমাকে ধাওয়া করেছে। ঐ যে ওরা মনে হয় আসছে। ওরা আমাকে এখনই ধরে ফেলবে। আমাকে ওরা মেরে ফেলবে।'

এ কথা বলেই যুবকটি আবারও শেখের দু'পা জড়িয়ে ধরল।

মহানুভব শেখ আবার যুবকটিকে টেনে তুললেন। বললেন,

'তোমার ভয় নেই। আমি ওদের সামলাব। তুমি ভয় পেও না। আমি সব দেখছি।'

এবার শেখ যুবকটিকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে একটি গোপন কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখলেন।

এর পর শেখ বাইরে বেরিয়ে বাগানে এসে দাঁড়ালেন। এরই মধ্যে তিনি দেখলেন এক ভয়ানক দৃশ্য। কয়েকটা যুবক সুঠামদেহী এক যুবকের লাশ নিয়ে বাগানে ঢুকছে। এগিয়ে গিয়ে লাশ দেখেই শেখ চিৎকার করে উঠলেন। এ যে তারই স্নেহের একমাত্র পুত্রের লাশ।

উত্তেজিত যুবকরা বলল,

'সরদার! একটা বখাটে যুবক এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আমরা দেখলাম সে আপনারই বাগানে ঢুকেছে। আমরা তাকে ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওকে পাচ্ছি না।'

যুবকদের কথা শুনে শেখ খানিকটা বিব্রত হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তার কাছে যে যুবক ধরা দিয়েছে সে-ই তার ছেলের ঘাতক। অথচ

www.icsbook.info

এখন সে তার আশ্রয়ে রয়েছে। তিনি তাদেরকে বলতেও পারছেন না যুবকের কথা। কেননা, তিনি যে যুবকটিকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শেখের বুক ফেটে যাচ্ছে। অথচ তিনি নীরব থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না।

এদিকে যুবকরা বাগানটির পুরোটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু বখাটে যুবকটিকে ধরতে পারল না। তাই তারা হতাশ হলো। তারপর লাশটি দাফনের ব্যবস্থা করে সঙ্গীরা যার যার মতো চলে গেল। কিন্তু শেখের বাড়িতে চলল শোকের মাতম। দিন গড়িয়ে রাত এলো। ধীরে ধীরে রাত গভীর হলো। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু শেখের চোখে ঘুম নেই। তিনি জেগে রইলেন। এক সময় সবার অগোচরে শেখ তালা খুলে ঘাতক যুবকের কক্ষে ঢুকলেন।

এতক্ষণ সবকিছু দেখছিল ও শুনছিল ওই যুবক। এতে যুবকের ভয় আরও বেড়ে গেল। শেখের ছেলেকে মেরেছে সে। আর এখন সে শেখের কাছেই ধরা পড়েছে! সে বুঝতে পারছিল, মৃত্যু ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছু নেই।

তবে কয়েক মিনিট পরেই যুবকের সব ভয় দূর হয়ে গেল। শেখের কথা শুনে যুবক যেন জীবন ফিরে পেল। শেখ বললেন,

'শোন যুবক! তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিয়েছি। তাই তোমার ভয় নেই। তুমি আমার মেহমান। আর আমি একজন মুসলমান। আমি আগেই তোমাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। মুসলমান কোনোভাবেই তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। তুমি আমার ছেলেকে হত্যা করেছ। তবে এই নাও এই পুঁটলি। এখানে কিছু খাবার আছে। এটা ক্ষিধের সময় তোমার কাজে লাগবে। আর এই নাও ঘোড়া। এটাতে চড়ে তুমি দ্রুত এখান থেকে চলে যাও। শয়তান যে কোন সময় আমাকে খারাপ মন্ত্রণা দিতে পারে। আর শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আমি তোমার ওপর প্রতিশোধও নিতে পারি। তাই তুমি আমার চক্ষুর আড়ালে চলে যাও। বিলম্ব করো না। যাও, এক্ষুনি চলে যাও।'

যুবক আর কী করবে। একজন মহানুভব শেখের আচরণ ও অঙ্গীকার রক্ষার মহত্ত্ব দেখে যারপরনাই অভিভূত হলো সে। কৃতজ্ঞতায় যুবকের মন বিগলিত হলো। কিন্তু শেখের সীমাহীন শোকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা তার ছিল না। তাই সে শেখকে সালাম জানিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসল। তারপর ঘোড়া দ্রুত হাঁকিয়ে যুবক তার গন্তব্যের পথে ছুটে চলল।

www.icsbook.info

বেজি ও গুপ্তধনের গল্প

দেলোয়ার হোসেন

সাবু দর্জিকে এলাকার সবাই চেনে। তার হাতের কাজ চমৎকার। সে একটা বেজি পালে এ কথাও কারো অজানা নয়। যা আয় হয়, তা দিয়েই সংসার চলে যায়। হঠাৎ করেই একদিন তার বাড়িতে দালান উঠলো। সবাই বললো, সাবু দর্জি এতো টাকা পেলো কোথায়। কেউ কেউ প্রশ্ন করলো তুমি বাড়িতে দালান দিলে টাকা পেলে কোথায়? সাবু দর্জির এক কথা– টাকা ঘরেই ছিলো। তা ছাড়া শ্বশুর বাড়ি থেকে হেল্প করেছে। আসল কথা কাউকে সে বললো না। আসল ঘটনা সে আর তার বেজিটাই জানে। কিন্তু বেজিটাতো কথা বলতে পারে না তাই কথাটা কেউ আর জানতে পারলো না।

www.icsbook.info

একদিন এক লোক কদবেল নিয়ে এলো বাজারে। দর্জি ছেলে-মেয়েদের জন্য দুটো কদবেল কিনতে গেলো। কিন্তু দামে পটলো না বলে কদবেল আর কেনা হলো না। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো মাঝি পাড়ার নিশি কান্ত। সে বললো, গড়াই নদীর ভাঙনে বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটা কদবেল গাছ আছে। পাকা কদবেল তলায় পড়ে থাকে কেউ নিতে যায় না।

দর্জি বললো, কেউ নেয় না কেন?

– ওখানে অনেক বড় একটা সাপ আছে। তা ছাড়া ও পাড়ার সবাই চলে গেছে দূরে। প্রতি বছর নদীর পাড় ভাঙে, বাঁশঝাড়ও কবে ভেঙে পড়বে।

দর্জি কিছু না বলে সেখান থেকে চলে এলো। পরদিন সে আর বাজারে কাজ করতে গেলো না। বেজি আর ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলো সেই বাঁশ বাগানে। হাতে একটা লাঠি। ছেলের হাতে একটা বেতের কাঠা। সাবু দর্জি বেজিটাকে লেলিয়ে দিল কদবেল গাছের দিকে। বেজিটা লেজ ফুলিয়ে মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে গেলো কদবেল গাছের গোড়ায়। একহাত দূরেই একটা গর্ত দেখে বেজিটা দু'হাতে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। বুঝা গেলো ওখানে ঠিকই সাপ আছে। দর্জি দূর থেকে দু'তিনটা কদবেল কুড়িয়ে ছেলের দিকে ছুড়ে দিলো। নিরাপদ জায়গায় বসে আছে ছেলেটা।

এর মধ্যেই সাপের ফোঁস- ফোঁস কানে এলো দর্জির। সাপ উঠে এলো ওপরে। বিরাট সাপ। দেড়হাত খাড়া হয়ে ফণা তুলে দাঁড়ালো সাপটা। বেজিটা সমস্ত শরীর ফুলায়ে সাপের চার দিকে ঘুরতে লাগলো। দর্জির মনে হলো সাপটাই বুঝি বেজিটাকে গিলে খেয়ে ফেলে। এখন সে কী করবে। বাঁশ বাগানের মধ্যে ছায়া ঢাকা পায়ে চলা পথ। সেই পথে হাঁটতে হাঁটতে একটা কাটা বাঁশ পেয়ে গেলো। পাঁচ-ছয় হাত লম্বা। বাঁশটা হাতে নিয়ে সে বাঁশঝাড়ে উঠে গেলো। এ বাঁশ সে-বাঁশ করে সাপটার কাছাকাছি গেলো। আস্তে আস্তে বাঁশের এক মাথা ঝপ করে ফেলে চেপে ধরে রাখলো সাপটাকে। এই সুযোগে বেজিটা লাফ দিয়ে ধরে ফেললো সাপের মাথাটা। সাপও শরীর বাঁকালো কিন্তু বেজিটা এদিক সেদিক ঘুরলো বটে কিন্তু সাপের মাথাটা ছাড়লো না। প্রায় পনেরো মিনিট পর সাপটা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। বেজিটা সাপটাকে টেনে নিয়ে গেলো একটু দূরে।

দর্জি ওপর থেকে নামতে গিয়ে দেখে আরেকটি সাপ গর্ত থেকে ওপরে উঠে আসছে। তখন সে আবার শিস বাজালো। বেজিটা ফিরে এসে সাপ দেখে আবার লেজ ফুলিয়ে সাপের চার দিকে ঘুরতে লাগলো। দর্জি আবার

www.icsbook.info

একটু ওপরে উঠে গেলো আর আগের মতো বাঁশের এক প্রান্ত সাপের শরীরের ওপর এক ঘা মেরে ঠেসে ধরে রাখলো। সাপটা ঘাড় বাঁকা করে বাঁশটা পেঁচিয়ে ধরলো। ঠিক সেই সময় বেজিটা ধরে ফেললো সাপের মাথাটা। এভাবেই দুটো সাপ মারলো বেজিটা।

এবার দর্জি নেমে এলো বাঁশঝাড় থেকে। গর্তে আরো সাপ আছে কিনা দেখার জন্য হাতের লাঠি দিয়ে খুঁচাতে লাগলো। কিন্তু সাপের কোনো সাড়া শব্দ পেলো না। তবে খট করে একটা শব্দ হলো। দর্জির সন্দেহ হলো ওখানে কিছু একটা আছে। তখন কবি নজরুল ইসলামের সেই সাপ আর টাকার কলসের কথা মনে পড়লো। শেষে কিছু কদবেল আর বেজি নিয়ে সে ফিরে এলো বাড়িতে।

রাতে স্বপ্নে দেখলো স্বর্ণ আর কাঁচা টাকা সে গুনছে। গুনতে গুনতে তার ঘুম ভেঙে গেলো। সকালে কাউকে কিছু না বলে একটা ছোট্ট কোদাল হাতে দর্জি চলে গেলো সেই বাঁশ বাগানে।

চারদিকটা দেখে-শুনে গর্তের মাটি খুঁড়তে লাগলো। প্রায় দু'হাত নিচে পাওয়া গেলো একটা পিতলের ঘড়া। দেখেই আনন্দে মনটা নেচে উঠলো তার। তবে বুকের মধ্যে কেমন ধুক-ধুক শুরু হলো। শেষে ভাঙন বেয়ে নদীতে নেমে মাটি কাদা ধুয়ে ঘড়াটা তুলে আনলো ওপরে।

দর্জি ভাবলো এভাবে ঘড়াটা বাড়ি নেওয়া যাবে না। কারণ পথে লোকজন প্রশ্ন করবে ঘড়া পেলে কোথায়? ওর মধ্যে কী আছে– আসল কথা লোকে সন্দেহ করবে। এসব ভেবে ভাঙনের ভাটফুলের গাছের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বাড়িতে এলো।

বৌ বললো, এতো সকালে কোথায় গিছলে? সাবু দর্জি কোনো কথা বললো না। তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেনো? কারো সাথে ঝগড়া করেছো নাকি।

– কী আজেবাজে কথা বলছো। পানি দাও, খুব পিপাসা লেগেছে।

– তা দিচ্ছি–আজ বাজারে যাবে না?

– না। একটা ছেঁড়া কাপড় খুঁজে রেখে দিও।

– ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কী হবে।

– এতো কথা বলো কেনো। সন্ধ্যায় নদীতে যাবো বালু আনতে।

– বালু আনতে সন্ধ্যায় যাবে কেনো? শ্মশান ঘাটে কতো কিছু থাকে– যদি তোমার কোনো বিপদ হয়!

www.icsbook.info

– চুপ করো। আর একটি কথাও বলবে না। ভাত বাড়ো, আমি গোসল করে আসি।

সেদিন ছিলো হাট বার। বিকেলের দিকেই ছেঁড়া কাপড়খানা বগলদাবা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো দর্জি। চরের ওপর কিছুক্ষণ ঘুরলো। তারপর সূর্য ডুবলে সেই ভাটি গাছের ভিতর থেকে ঘড়াটা বের করে ছেঁড়া কাপড় প্যাঁচায়ে সে ঘড়াটা মাথায় করলো। তখন ছায়া ছায়া অন্ধকার নেমেছে পথে। দু' একজন লোকের সাথে দেখাও হলো। কেউ কিছু বললো না। হঠাৎ একজন বললো দর্জির মাথায় কী? আজ বাজারে যাওনি।

দর্জি বললো, বাজারে যাইনি। সারা চর ঘুরে ঘুরে মোটা বালু নিয়ে এলাম। বৌ মুড়ি ভাজবে। বাড়ি এসে ঘড়াটা চৌকির নিচে লুকায়ে রাখলো। বৌ এসে হাসতে হাসতে বললো কী আনলে। দর্জি চোখ বড় বড় করে বললো, একদম চুপ। ফ্যাচ ফ্যাচ করলে আমরা বিপদে পড়বো। যা বলার রাতে বলবো।

রাতে ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে দর্জি সেই ঘড়াটা ঘরের মেঝেয় আনলো। ঘড়ার মুখটা বন্ধ। বৌকে বললো, একটা দা নিয়ে আসো। এর মধ্যে যদি সোনা রূপা থাকে তা'হলে আমাদের আর চিন্তা থাকবে না। মুখের ঢাকনাটা এক প্রকার আঠা দিয়ে আটকানো। দা-এর মাথা দিয়ে খোলা সম্ভব হলো না।

হঠাৎ দর্জি কী মনে করে পাটকাঠিতে আগুন জ্বেলে ঘড়ার মুখের চার দিকে ঘুরালো। তাতে আঠা একটু নরম হলো তখন দা-য়ের মাথা দিয়ে চাড় দিতেই চড় চড় করে খুলে গেলো ঢাকনা। ভিতরে তাকিয়ে সাবু দর্জিতো জ্ঞান হারাবার অবস্থা। ঘড়ায় ভরা আগেকার রূপার টাকা।

বৌ বললো, পানি খাও। বেশি উতলা হইও না। এখন চিন্তা করো কিভাবে এগুলো বিক্রি করা যায়। দর্জি ঘড়া থেকে বিশ টাকা তুলে ঘড়াটা আবার রেখে দিলো আড়ালে। পরদিন ঘাড়ে ঝুলানো ব্যাগের মধ্যে সেগুলো নিয়ে শহরে চলে গেলো।

শহরে সেকরার দোকানে খোঁজ খবর করলো, কেউ টাকা নেড়ে চেড়ে দেখলো। অনেক পুরনো টাকা মূল্যও বেশি। দশ দোকান দেখে সেগুলো বিক্রি করলো। অনেকে জানতে চাইলো এগুলো কোথায় পেয়েছেন? দর্জি বললো, বাড়িতে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে পেয়েছি।

টাকা পয়সা নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসলেই এক লোক এসে

www.icsbook.info

বললো, আপনাকে ঠকিয়েছে। এই টাকার মূল্য অনেক। আরো থাকলে আমাকে দিতে পারেন– অনেক বেশি টাকা পাবেন।

লোকটা একদিন বাড়িতে এলো আর একশতটি রূপার টাকা নিয়ে গেলো। এভাবেই সবটাকা বিক্রি হয়ে গেলো। একদিন দর্জি বাজার থেকে রড সিমেন্ট নিয়ে এলো আর দালান গাঁথা শুরু করে দিলো।

এই টাকা ছিলো সহাদেব মণ্ডলের দাদার। সেই আমলে জলদস্যুরা বড় বড় বাড়ি দেখে ডাকাতি করতো। ওদের হাত থেকে টাকা-পয়সা রক্ষা করার জন্য লোকেরা এভাবেই সে সব মাটির নিচে পুঁতে রাখতো। যাই হোক, সেই টাকা দিয়ে দালান হলো, বাজারে দোকান হলো, বৌ-এর গা ভরা গয়নাও হলো।

তবে দেখতে দেখতে বেজিটার আদর গেলো কমে। একদিন বেজিটাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। এখনো সাবু দর্জি জনে জনে পাগলের মতো জিজ্ঞাসা করে বেড়ায় তোমরা আমার বেজিটাকে দেখেছো? তখন লোকজন আন্দাজ করলো –বেজিটার কারণেই হয়তো সে কোনো গুপ্তধন পেয়েছিলো, তাই বেজিটার জন্য এখন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

www.icsbook.info

নিশিরাতে মামাবাড়ি

শরীফ আবদুল গোফরান

মুরগাঁও গ্রাম। এই গ্রামের পশ্চিম পাড়ার বটতলায় একসময় সাপ্তাহিক হাট বসতো। লোকে হাটের নাম রেখেছিল মুহুরীগঞ্জহাট। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি বড় খাল। এই খালে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। কত রঙের নৌকা চলতো এই খাল দিয়ে। বর্ষা এলে বাইদ্যারা নানা জিনিসপত্র নিয়ে নৌকা ভিড়াতো মুহুরীগঞ্জহাটে। খালের ওপর দিয়ে গড়ে উঠে একটা পাকা ব্রিজ। আর এই ব্রিজের পূর্ব মাথায় খালের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক বটগাছ। লোকেরা জায়গাটির নাম রেখেছে বটতলা। আজ আর মুহুরীগঞ্জ হাট না থাকলেও বটতলা নামটি কেউ মুছে ফেলতে পারেনি।

www.icsbook.info

এই বটতলায় একটি ছেলেকে প্রায়ই দেখা যায়। নাম তার মুসলিম। গ্রামের লোকেরা তাকে মুসা বলে ডাকে। দেখতে বেশ লম্বা। হাত-পা লম্বা লম্বা। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। হাঁটু ভেঙে কোমর বাঁকা করে ও ভাঙা দিয়ে দাঁড়ায়। বটতলায় একটি বর্শি হাতে নিয়ে সে সব সময় মাছ ধরে। রাতের বেলা তাকে বেশি দেখা যেত। কত লোক যে তাকে দেখে ভয় পেয়েছে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

একদিন মোজাম্মেল ও তার মামা তাদের নিজ বাড়ি বসন্তপুর থেকে রওয়ানা করেছে- মুরগাঁও নানা বাড়ি আসবে। বসন্তপুর থেকে মুরগাঁও প্রায় ৭-৮ মাইলের রাস্তা। বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছু দূর এলেই মামার স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে যায়। মোজাম্মেল বললো মামা যাত্রাতেই স্যান্ডেল ছিঁড়েছে আজকের যাত্রা শুভ হবে না, আজ না হয় বাড়ি ফিরে যাই। কাল ভোরে রওয়ানা দেবো। কিন্তু মামার তাড়ায় তা আর হলো না।

গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা। ধুলায় হাঁটু অবধি প্যান্ট একদম সাদা হয়ে গেছে। মামার কাঁধে একটা ব্যাগ। ওর ভেতর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। আট মাইল পথ কিভাবে যাবে ভাবতেই গা চমকে ওঠে তাদের। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে কী করে। যেতে তো হবেই।

গালগল্প করতে করতে পথ চলছিল ওরা। মাটির উঁচু রাস্তার ওপর বাতাস আছড়ে পড়ছে। ততক্ষণে রাতের অন্ধকার নেমে এলো। ধারে কাছে বাড়িঘর নেই। দূরে কালো ছায়ার মতো গ্রাম দেখা যায়। জনমানবহীন মাঠ। আকাশে চাঁদ ছিল। খণ্ড খণ্ড মেঘ তা ঢেকে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

তারা দু'জন হাঁটছে, হাঁটতে হাঁটতে একসময় বটতলার কাছাকাছি এসে পড়লো। ব্রিজের ওপর উঠে সামনে বটগাছের গোড়ার দিকে তাকাতেই ধক করে উঠলো ওদের বুকের ভেতর। মোজাম্মেল, ও মামা ওটা কি বলে মামাকে জড়িয়ে ধরলো। ভূতের মতো কী যেন সটা হয়ে বটগাছটায় হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মধ্যে মশার কামড়ে নড়ে ওঠে। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো কথা বলে না। ভয়ে মনটা চুপসে গেল। শরীর দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগলো। আশপাশে কোনো বাড়িও নেই যে কাউকে ডাকবে।

মোজাম্মেল বললো, এটা ভূতই হবে। মনে হয় এই বটগাছেই থাকে। কি- প্রথমেই বলিনি আজ বিপদ রয়েছে? যা হোক সাহস করে হাঁটতে লাগলো ওরা। মোজাম্মেল কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, ভূত বাবাজি আমি কিছু করিনি যা করেছে মামাই করেছে। আমি ওকে না আসার জন্য বারণ

www.icsbook.info

করেছি। সে আমার কথা শোনেনি।

কবির মামা মোজাম্মেলের হাত চেপে ধরে বলতে গেলে টেনে- হেঁচড়ে বটতলা পার হতে লাগলো। এ দিকে ভূতটি নড়েচড়ে ওঠে বলে উঠলো- 'কাগু হারই যান। আই এ না। ডরান কিল্লাই'। এতক্ষণে মোজাম্মেলেরর দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। তাকে কাঁধে নিয়ে কবির মামা কোনমতে বাড়ি গিয়ে পৌছলো। বাড়ি গিয়ে বলতেই সবাই হ্যারিকেন নিয়ে বটতলায় এলো। দেখে খোনার বাড়ির আম্বর আলীর ছেলে মুসা। বটগাছের নিচে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। লোকজন দেখে ও ভাঙা দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। একজন গিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলো তাকে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠে। আরে মারেন কিল্লাই, আই কিচ্ছি।

গ্রামের উত্তর পাড়ায় মুসারা থাকে। মুসারা মানে মুসার ছোট এক ভাই ও বোন। মুসার বাপ নেই। মা মারা গেছে তারও আগে। বছর দুয়েক আগে হঠাৎ চার দিনের জ্বরে যখন তার বাপ মারা যায়, তখন মুসার বয়স আট।

তারপর শুরু হয়েছিল তাদের দুঃখের জীবন। জমি-জমা ওদের কিছুই নেই। মুসার বাবা পরের জমিতে কামলা খাটতো। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর খুব কষ্টে পড়লো ওরা। তাই তাকেই ভাইবোনের দিকে তাকিয়ে সংসারের হাল ধরতে হলো। সে মাছ ধরে করিম সওদাগরের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্রি করে। কখনো কখনো লাকড়ি কুড়িয়ে নিয়ে যায় গফুরের চা দোকানে। যখন একেবারেই কোন আয়-রোজগার হয় না তখন হাত পাতে অন্যের কাছে। এভাবে ভাই-বোন দু'টিকে নিয়ে চলে তাদের সংসার।

পরদিন সকালবেলা মুসা তার ছোট ভাই কালাকে নিয়ে বাঁকা হয়ে কাসেমের চা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রাতে মার খেয়ে বাড়ি ফিরেছে বলে মাছ ধরতে না পারায় আজ আর পকেটে একটা টাকাও নেই। খিদেই পেট চোঁ চোঁ করছে। রাতে দু'খানা শুকনো রুটি পেটে পড়েছিল। সকালে এখন পর্যন্ত কিছুই যায়নি। কাসেম মিয়া বিটা এক তাওয়ায় পরটা ভাজছে। দু' ভাই তাকিয়ে আছে ওদিকে। ভাজি দিয়ে পরটা খাওয়া খুব পছন্দ তার।

এমন সময় করিম সওদাগার ডাক দিলো একটা বস্তা নিয়া দিতে। মুসা এগিয়ে গেল ওদিকে। কিন্তু তার আগেই পৌছে গেল ছদরিয়া। মুসা কাছে গিয়ে বলছে, সওদাগর আঁরেনি বোলাইছেন। ছদরিয়া ভেংচি কেটে বললো,

www.icsbook.info

তোরে 'ন, আঁরে বোলাইছে। তোরে বোলাইলে কি অইবো? নিজের গতরটা লই আঁটিতে হারছ না, আবার বস্তা ধরবি। মুসা করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো করিম সওদাগরের দিকে।

গফুরের চা দোকানে বসে আছে গ্রামের মেম্বর সাহেব। হাত পাতলো মুসা। মেম্বর সাব আঁরে অগগা টেঁয়া দেন। মেম্বর সাব আট আনা পয়সা বের করে দিলো। আডা না, নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেল মুসার মুখ থেকে। অগগা টেঁয়া হুরাই দেন মেম্বর সাব। মেম্বর সাহেব রাগ হয়ে গেল, কি কস? এক টাকা? টাকা কি গাছে ধরে। অমনি চা দোকানদার গফুর মিয়া ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলো দোকান থেকে। মুসা দোকানের বাইরে কাত হয়ে পড়ে গেল। করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকলো। আর এদিকে তার চোখ থেকে পানি পড়তে লাগলো।

ঐ পথ দিয়ে মোজাম্মেল বগু মাস্টারের মক্তব থেকে পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ গফুর মিয়ার দোকানের দিকে তাকাতেই মুসাকে তার চোখে পড়লো। তার মনে পড়ে গেল বগু মাস্টারের অনেক উপদেশের কথা। এতিমকে ভালোবাসবে। এতিমের গায়ে হাত বুলাবে। তুমি নিজে খেলে প্রতিবেশীকে খেতে দিলে না তাহলে মোমিন হতে পারবে না। নানা বাড়ি আসার সময় মায়ের দেয়া দশটি টাকা এখনো তার পকেটে আছে। তার দয়া হলো। সে পকেট থেকে দশটি টাকা বের করে মুসার হাতে দিলো। আর বললো, ভাই এ টাকা দিয়ে কিছু কিনে খাও। ভিক্ষা করো না ভাই। কাজ করে খাও। এটা আমাদের নবীর শিক্ষা।

নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহনত করো সবে।

www.icsbook.info

পুঁজি ছাড়া ব্যবসা

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

ব্যবসায় জন্য প্রয়োজন দু'টি জিনিস, পুঁজি ও অভিজ্ঞতা। অনেকের পুঁজি আছে, অভিজ্ঞতা নেই। অনেকের অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু পুঁজি নেই। এরকম দু'ব্যক্তি পার্টনারশিপ ব্যবসায় নামলে বিপদ আছে। অনেক সময় দেখা যায় বছর শেষে পুঁজিওয়ালার অভিজ্ঞতা হয়েছে কিন্তু পুঁজি চলে গেছে অভিজ্ঞ পার্টনারের হাতে। পুঁজি ছাড়াই ঢাকা এসেছে ফরিদ ও আরিফ। কাজ না পেলে ব্যবসা করবে, এই আশায়।

বিনা পুঁজিতে লাভজনক ব্যবসা ভিক্ষা করা। দশজনের কাছে হাত পাতলে একজনের কাছ থেকে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই। দু'চারজন গালাগালি করলেও ক্ষতি নেই। দু'টাকার নোট বা কয়েন বর্তমান বাজারে কোন কাজে লাগে না কিন্তু দান করলে সোয়াব হয়। দু'টাকা পাঁচ টাকা দিয়ে

www.icsbook.info

সোয়াব কামানোর সুযোগসন্ধানীর অভাব নেই। ঢাকা শহরে বাড়ি ভাড়ার চেয়ে গাড়ি ভাড়া কম। বাড়ির জন্য জমি কিনতে হয়। গাড়ির জন্য রাস্তা কিনতে হয় না। মেসে সিট ভাড়া তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা। বাড্ডা থেকে ফার্মগেট বাস ভাড়া মাত্র দশ টাকা। যানজটের কারণে তিন ঘণ্টা বসে থাকা যায়। বসে বসে ঘুমানোও যায়। ফরিদ বিশ টাকা বাস ভাড়া দিয়ে আপ-ডাউন পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা ঘুমাতে পারে প্রতিদিন। মাসে মাত্র ছয়শত টাকা। কম টাকায় খাওয়ার জন্য ঢাকায় আছে হোটেল ছালাদিয়া, হোটেল ইটালিয়া, হোটেল রোডেশিয়া। বড় বড় তিন তারা পাঁচ তারা ও চাইনিজের উচ্ছিষ্ট বিক্রি হয় এসব হোটেলে। মুরগির চামড়া, গলা, ডানা, পা, গিলা ও কলিজার বিশেষ মেনু খেতে খারাপ লাগে না।

ফরিদ ভিক্ষা না করে কাজ করে খায়। "নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহেনত কর সবে"। নবীর শিক্ষা কাজে লাগিয়েছে সে। মাঝে মাঝে আরিফের সাথে দেখা হলে ফরিদ জিজ্ঞেস করে।

– কেমন আছ-টাছ, কী কর-টর দিন-টিন কেমন চলে-টলে? এসব দ্বৈতশব্দ ডিকশেনারিতে না থাকলেও মানুষের মুখে মুখে চালু আছে। আরিফ জবাব দেয় :

– আল্লাহর রহমতে তোমাগো দোয়ায় ভালাই আছি। বিনা পুঁজিতে লজিংনে খাই, মেসে ঘুমাই, মসজিদে টয়লেট করি।

– মসজিদে কী কর?

– মসজিদের বাথরুমে কাম সারি। সিটি করপোরেশনের পাবলিক টয়লেটে ফি লাগে। ছোট কাজ দুই টাকা, বড় কাজ পাঁচ টাকা। এত মসজিদ থাকতে টাকা খরচ করে কোন পাগলে?

– আমি ঠিক উল্টা। আমি ভিক্ষা করি। বাসে ঘুমাই। মিনারেলের খালি বোতলে জেনারেল ওয়াটার ভরে রেললাইনে ছোটবড় সব কাম সারি।

– তোমার বাবারও লাজ-শরম কম আছিল। তুমি একদম বেশরম। আল্লায় হেফাজত করুক।

– পুরুষ মাইনষের আবার লাজ-শরম?

– তুমি যেই রকম পুরুষ, তোমার কাজ-কাম, লাজ-শরমও সেই রকমই।

– প্রাইমারি স্কুলে পড়ছিলাম, পুরুষ তিন প্রকার। উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষ। আমি অইলাম ঐ নাম পুরুষ। মানে নামেই পুরুষ।

www.icsbook.info

কামে নাই। তাই বইল্যা তোমার মতন কা-পুরুষ না। মাইগ্যা খাই না।

– পাগলে কি না কয়, ছাগলে কি না খায়?

– চোর চোট্টার চাইতে পাগল- ছাগল অনেক ভালা। পাগলে আবোল-তাবোল কইলেও মিছা কতা কয় না। ছাগল সব খাইলেও ঘুষ খায় না। আমরাই ভদ্রলোক। পুঁজি ছাড়া ব্যবসা করি। একজন কাম করি, একজন ভিক্ষা করি। চুরি চোট্টামি করি না, কাউরে ঠকাই না।

– ছোটকালে পোলাপানগো একটা ধাঁধা শোনাইতাম। এক ছাগলের তিন মাথা, ছাগলে খায় লতা পাতা। এর জবাব মাটির চুলা। এখন সেই মাটির চুলাও নাই লতাপাতা দিয়া কেউ রান্ধেও না।

– সেই ছাগলের খাওনও এখন মাইনসে খায়। ক্ষেত নিড়াইনা পাটপাতা, মালঞ্চা, হেলেঞ্চা, ঢেঁকি, কলমি, থানকুনি এখন ঢাকায় টাকা দিয়েও পাওয়া যায় না।

গ্রাম থেকে এক ব্যাগ এসব আগাছা নিয়ে ঢাকায় এসেছিল ফরিদ। মতিঝিলের অফিস পাড়ায় ফুটপাথে সাজিয়ে বসতেই বিক্রি হয়ে যায় সব। বিনা পুঁজিতেই লাভ পাঁচশত টাকা। কাজে লেগেছে চাপার অভিজ্ঞতা।

– ফরমালিন পিজারভেটিভ ছাড়া টাটকা শাক। খাইয়া মজা পাইবেন। রোগ-বালাই মাফ পাইবেন।

মাঝে মাঝে গ্রাম থেকে নিয়ে আসে এলেবেড়া, ওলট কমল, চিরতা, কালমেঘ, বাসক, তেলাকুচা, নিমের ডাল, অর্জুনের ছাল। শহরে এসব ঔষধি গাছ তাজা পাওয়া যায় না। শুকনা লতা-পাতা ভিজিয়ে পানি খায় ঔষধ হিসেবে। তর তাজা এসব বনাজি বিক্রি হয় হটকেকের মত চাপার জোরে :

– আমার কাছে দেখতে পাচ্ছেন কিছু জঙ্গলের লতা পাতা। জঙ্গল হলো মানবের জন্য মঙ্গল। এসব চিনলে জড়ি, না চিনলে চুলা গুতানোর খড়ি। এসব দিয়েই ঔষধ কোম্পানি ঔষধ বানায়। কোম্পানির ঔষধ না খাইয়া ডাইরেক্ট আল্লাহর নেয়ামত খান।

বিনা পুঁজির এ ব্যবসায় ফরিদ মিয়া হয়ে যায় ফরিদ সাব।

স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ে লোকসানের ঝুঁকি নাই, ভ্যাট নাই, ট্যাক্স নাই।

কিছু জিনিস দশ টাকা কেজি কিনে প্রতি পিস দশ টাকা বিক্রি করা যায়। ফরিদের লেকচারও বেশ কাজে লাগে:

– বরফ-কোল্ড ড্রিংক মুখে ঠান্ডা লাগলেও খাইলে শরীর গরম লাগে।

www.icsbook.info

শসা-খিরাই-গাজর খান। মন-প্রাণ একেবারে ঠান্ডা আর তাজা। কাইট্টা ছিল্যা লবণ লাগাইয়া দিছি। চাইয়া যান, খাইয়া যান, ঘরের জন্য লইয়া যান।

সিজন বুঝে আনারস, পেয়ারা, জাম্বুরা, আমড়া, কামরাঙ্গা ও বরই বেচে এভাবেই লাভবান হয় ফরিদ।

বাসে ঘুমানোর বদ অভ্যাস ত্যাগ করে বাসা ভাড়া নেয়। তবে বিনা ভাড়ায় বাসে চড়ে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা করে মাঝে মাঝে। লোকাল বাসে প্রতিবন্ধী ও হকারদের ভাড়া লাগে না।

আরিফ মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধী সেজে ভিক্ষা কাম ব্যবসা করে। সিটে বসা যাত্রীদের কোলে লজেন্স বা বাদামের প্যাকেট ছুড়ে দিয়ে বলেঃ

– ভিক্ষা না দিয়ে একটা লজেন্স, এক প্যাকেট বাদাম নিয়ে যান। খান আর সোয়াব কামান।

ফরিদও চটকদার লেকচার দিয়ে বাসে চড়ে বিক্রি করে ভিক্স কফ লজেন্স, ডোল কোম্পানির চুলকানির মলম, মাথা ব্যথার টাইগার বাম, কান চুলকানোর কটন স্টিক, টুথ ব্রাশ ও টুথ পাওডার। সস্তা দামের বিপদের বন্ধু, ঘরের ডাক্তার। ফরিদকে দেখলে দ্রুত সরে পড়ে আরিফ। দুই বন্ধুতে দূরত্ব তৈরি হয়। অথচ কেউ কারো শত্রু নয়। একজন নবীর শিক্ষা মেনে খেটে খায়, আর একজন নবীর শিক্ষা অমান্য করে মেগে খায়।

এক সাথে ঢাকায় এসেও আরিফ ফরিদের মত সাহেব না হয়ে হয়েছে আরু ফহির।

www.icsbook.info

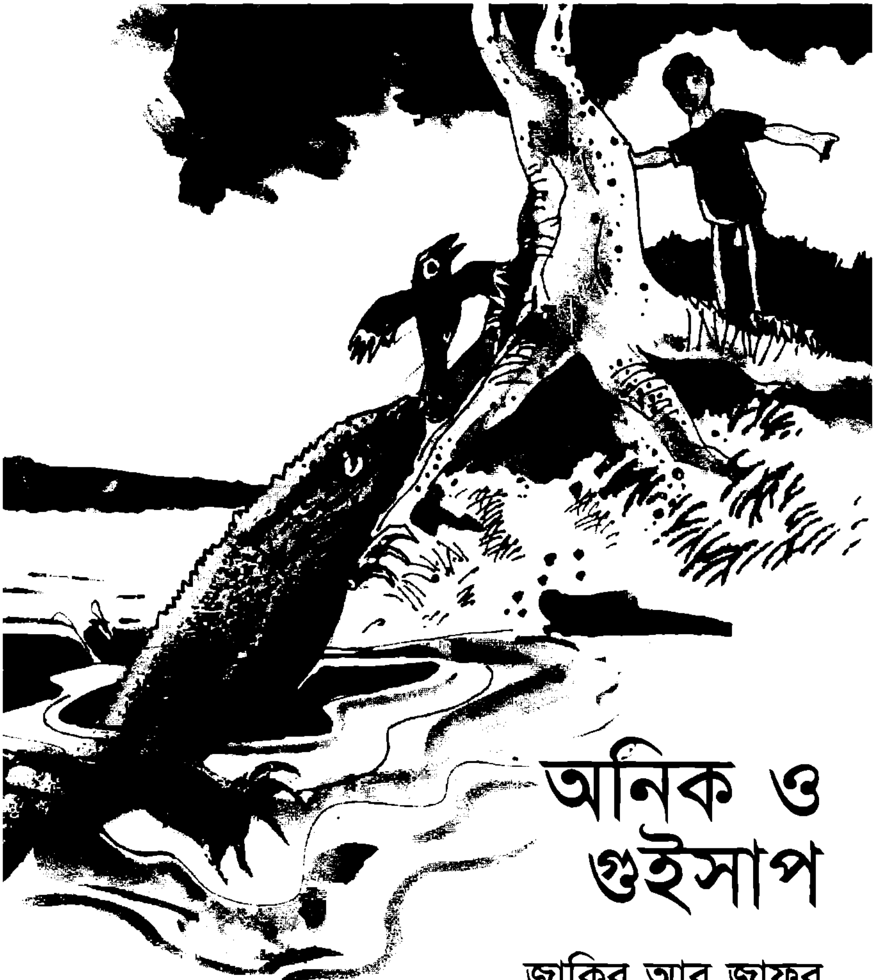

অনিক ও গুইসাপ

জাকির আবু জাফর

বছরে একবার মাত্র গ্রামের বাড়ি আসে অনিকরা। এবারও এসেছে। এসেছে বাবা-মার সাথে। একমাত্র ছোট বোন প্রভাও সঙ্গে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। এই সময়টা প্রতি বছর একবারই আসে। বেশ আনন্দ নিয়েই আসে সময়টি। সারাটা বছর অপেক্ষায় থাকে এ সময়ের জন্য। একদিন আগে শেষ হলো পরীক্ষা। আজই এসে গেছে গ্রামের বাড়ি। অবশ্য অষ্টম শ্রেণী বলে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হবে অনিককে। সুতরাং বেশি দিন থাকার সুযোগ নেই। প্রভা এবার পঞ্চম শ্রেণীতে উঠবে। ফলে তার সময় অফুরন্ত। প্রভা কিছুদিন বেড়ানোর পক্ষে। অনিকও। কিন্তু সমস্যা অনিকের বৃত্তি পরীক্ষা। অন্যদিকে অনিকের বাবার অফিস। প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি। বেশি ছুটি মেলে না। অনিকের মা অবশ্য গৃহিণী। তবুও তারা

www.icsbook.info

চারদিন থেকে তারপর যাবে ঢাকায়।

অনিকেরা যখন বাড়িতে এসে নামলো তখন দুপুর ১২টা। অনিকের দাদী হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন অনিক ও প্রভাকে। চাচীও বেশ আদর করলেন। বাড়িতে দাদী, চাচা-চাচী ও চাচাতো ভাইবোন মিলে তাও চারজন।

অনিকের প্রথম আনন্দ তার দাদী। দাদীকে দেখলেই তার ভেতরে অন্যরকম আনন্দ খেলা করে। দাদীও আদরে আদরে ভরে দেয় অনিকের বুক। দাদীর হাত ধরেই ঘরে ঢুকে অনিক ও প্রভা। জামা বদল করে এক গ্লাস ডাবের পানি খেলো অনিক। তারপরই দৌড়ে পুকুর পাড়ে।

এটি অনিকদের অনেক পুরনো বাড়ি। অনিকের দাদার দাদা এই বাড়ি বেঁধেছেন। বাড়ির সামনে একটি বড় পুকুর। পেছনেও একটা। পেছনের পুকুরটা একটু ছোট। একদম বাড়ির সদর দরজায় একটি মসজিদ। মসজিদ থেকে সোজা পথ এসে অনিকদের সদর দরজায় ঢুকেছে। বাড়ির চারপাশে বেশ জমানো গাছ গাছালি। অনিকেরাসহ বেশ কিছু পরিবার বসত করে এই বাড়িতে। অবশ্য আগে আরও দু'টি পরিবার ছিলো। তারা অনিকদের কাছে জমি-ভিটা বিক্রি করে চলে গেছে অন্যত্র। এখন অনিকেরাই বাড়ির বেশিরভাগ অংশ নিয়ে থাকে। অনিকের দাদী এবং চাচা-চাচী বেশ রক্ষণাবেক্ষণ করে বাড়ির আসবাবপত্র। বছরে একবার অনিকেরা আসবে এটা সবার জানা। ফলে এ সময়টায় বেশ আয়োজন থাকে।

এসব আয়োজন করেন অনিকের চাচা। মোষের ঘন দধি তো থাকবেই। নদীর চিংড়ি মাছ, লরাকা মাছ, এসব মাছে ভরপুর। তা ছাড়া শীতের পিঠা। খেজুরের রস মজুদ রাখা চাই। অবশ্য তাই থাকে। এসব মজাদার খাবার অনিকের দারুণ পছন্দ। ফলে ডিসেম্বর এলেই এসব কিছু অনিকের মনে ভাসতে থাকে। খেজুরের রসের মতো জিহ্বায় রস আসে। ভাপা পিঠার ধোঁয়ার গন্ধ ভাসে নাকে। মোষের দুধের দধির স্বাদ জেগে ওঠে মুখে। তখন ছটফট শুরু হয় গ্রামে যাওয়ার জন্য। পরীক্ষা দিয়েই দে ছুট। সবকিছু গুছিয়ে অপেক্ষা। নির্দিষ্ট দিনে উড়ে যাওয়ার মতো করে দৌড়ে চড়ে গাড়িতে। পৌঁছে গেলেই মুক্ত পাখির মতো ডানা ছড়ায় নানা দিকে। বিশেষ করে বাড়ির পেছনের পুকুরপাড় খুবই প্রিয় অনিকের।

এ পুকুরের চারপাশে নানা রকমের গাছে ভরা। ছায়াদার গাছগুলোর ডালে ডালে পাখির কূজন। পশ্চিম পাড়ে একটি বড়সড় কড়ই গাছ ডালপালা

www.icsbook.info

ছড়িয়ে আছে। এই গাছটির ডালে বসে এক জোড়া ঘুঘু ডাকে ভরদুপুরে। ঠিক দক্ষিণ পাড়ের দেবদারু ছায়ায় বসে ডাক শোনে অনিক। গত চার বছর এ জোড়া ঘুঘুর গান দুপুর হলে বেজে ওঠে। আজ পুকুরপাড়ে এসেই খুঁজছিলো ঘুঘুদের। হ্যাঁ ওই তো ওরা মনের আনন্দে আকাশে উড়ছে। একটু পরেই কড়ই গাছের ডালে বসে শুরু করলো গান। ঘুঘুর গানে নিঝুম দুপুর যেনো দুলে উঠছে। রাত থেকে কুয়াশা ভয়াবহ রকম ঝরেছে। এমন দুপুর তবুও যেনো আকাশ ঘোলা হয়ে আছে কুয়াশার ভারে। ফলে রোদের তেজও নেই তেমন। আকাশ যেমনই থাকুক ঘুঘুজোড়া গান করবেই– এটাই যেনো ওদের পণ। অনিকের মনে হয় যেনো পাখি দু'টি তার আত্মীয়। তাকে শোনাতেই যেনো গান করছে ওরা। খুব মায়া জাগে পাখিদের প্রতি। সব পাখিই অনিকের প্রিয়। কিন্তু এ দু'টি ঘুঘু আজ চার বছর এক রকম একই জায়গায় বসে এ সময়টায় গান করে।

অনিক ভাবছে যখন সে থাকে না তখনও কি ঘুঘু দু'টি গান করে। যদি করে তবে তখন কে শোনে ওদের গান। এ গাছগাছালি, প্রকৃতিই হয়তো শোনে। হয়তো অন্য কোনো মানুষও শুনতে পারে। আচ্ছা পাখি দু'টি অন্য কোনো মানুষকে পছন্দ করে? তখন কি অনিককে ভুলে যায় ওরা। ভীষণ কষ্ট লাগে অনিকের। আবার গা ঝেড়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে– ধ্যুৎ আমার প্রিয় পাখিরা আমাকে ভুলবে না। কেন ভুলবে? আমি এদের জন্য ছুটে আসি ঢাকা থেকে। কতদূর পথ ফেলে আসি আমাকে কেন ভুলবে ওরা।

দেবদারু গাছের গোড়ায় বসে প্রতিদিনের মত গান শুনছিলো আর নানান কথা ভাবছিলো অনিক। ঘুঘুদের কাছ থেকে তার চোখ কখনো কখনো ছুটে যায় অন্য গাছে। দোয়েল, শ্যামা, টিয়ে আর শালিক পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। একগাছ থেকে লাফিয়ে ছুটছে। কোনো পাখি আবার দুষ্টুমিতে মেতে উঠেছে। একটিকে আরেকটি ঠোঁট দিয়ে কামড়ায়। অন্যটি আবার তাড়া করে তাকে। এভাবে পাখিদের আনাগোনা, নাচানাচি, মৃদু ঝগড়া এসব দেখছে অনিক। পাখির পেছনেই তার সময় চলে যায়। বসে বসে ভাবে যদি সেও পাখি হতে পারতো। তবে লেখাপড়ার এতটা ঝুট-ঝামেলা থাকতো না। পাখির সাথে হেসে খেলে, উড়ে বেড়িয়ে কেটে যেতো সময়। ওই দু'টি ঘুঘুর সাথে ডালে বসে ভাব জমাতো। আর নতুন গান করার জন্য বায়না ধরতো। কি মজাই না হতো। কি আনন্দ হতো তবে। পাখির নাচানাচি দেখতে দেখতে খেয়াল করলো অনিক তার ছায়া অর্ধেক পরিমাণ ভেসে

www.icsbook.info

উঠেছে পুকুরের পানিতে। মিহি বাতাসের ঝিরি ঝিরি কম্পন তার ছায়াকে কাঁপিয়ে তুলছে। তার ভারি ভালো লাগছে, ওই কম্পন- দোলা। এর মধ্যে একটি মাছ সম্ভবত কৈ মাছ হবে, টুপ করে ছাট দিলো। টুপ প্রবল শব্দটি বৃষ্টিতে ভেসে ওঠা ফোঁটার মতো জেগে ওঠে। এরকম ছাট দেয় কৈ মাছ। দেখতে দেখতে অনিক এখন মাছের এসব ভাষাও বোঝে। মাছটি তার ছায়াকে ভেঙে দিয়ে গেলো। অবশ্য সামান্য সময়। তারপর জেগে ওঠা পাতলা ঢেউ পাড়ে এসে মিলে গেলো। ঠিক আগের মতো আবার দেখা যাচ্ছে ওর ছায়া। মুগ্ধ হয়ে নিজের ছায়া দেখছে অনিক।

হঠাৎ পাখির পাখার ঝাপটা কানে বেজে উঠলো অনিকের। সেই সাথে কিছু কিছু শব্দ। তার কোনো এক পাশ থেকেই শব্দটি বেজে উঠলো। দ্রুত চোখ ফেরায় সে। আশপাশে দেখে খুব সতর্কতার সাথে। না কিছুই চোখে পড়ছে না। নিজের ছায়ার দিকে মন দেয় অনিক। ঠিক আবার বেজে উঠলো শব্দটি আগের মতো। উত্তরমুখী হয়ে বসে আছে সে। তার মনে হলো বাঁ পাশ থেকেই শব্দটি শোনা গেলো। বাঁয়ে দ্রুত দেখলো সে। অনিক যেখানে দেবদারুর গোড়ায় বসে আছে ঠিক তার পাঁচ সাত হাত দূরে একটি ডুমুর গাছ। গাছটির এখন কিশোর বয়স। তবে বেশ ডালপালা গজিয়েছে গাছটির।

একবার এই ডুমুর গাছেই একটি দোয়েলকে আরেকটি দোয়েল ঠুকরিয়ে পশম তুলে দিয়েছিলো। কিন্তু আক্রান্ত দোয়েলটি কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করেনি। নীরবে কেন দোয়েলটি এমন অত্যাচার সহ্য করেছিলো জানে না অনিক। হঠাৎ এই ঘটনা মনে পড়ায় অনিক ভাবছে আজো বুঝি ওই দোয়েলটি মার খাচ্ছে। তার সাথীর কাছে। তার খুব ইচ্ছে হলো দোয়েলটিকে খুঁজে বের করার। উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখছে অনিক। প্রতিটি ডালে চোখ বোলায় সে। কিন্তু না দোয়েলের মতো কোনো পাখি তার চোখে পড়ে না। আবার অন্য কিছুও তার চোখে পড়ছে না। বসে দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে গেলো সে। একরকম পুকুরের দিকে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করছে কিন্তু না কিছুতেই তো দেখছে না। এবার অনিক দেখলো পানিতে ডুমুর গাছের ছায়া। কেমন যেনো পানিতে সবুজ জমে আছে। প্রকৃতি সবুজ আর ছায়া সবুজ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য খোঁজে অনিক। ঠিক তখন আবার সেই পাখির পাখা ঝাপটানি এবং কিচকিচ শব্দ। এবার খানিটা জোরে বাজলো কানে। এবং ডুমুর গাছের দিক থেকেই শব্দটা এলো। একটি গাছের চারা খেজুর

www.icsbook.info

গাছ, একটি মন্দা গাছ এবং একটি বন্য গাছের জন্য ডুমুর গাছের নিকটে পৌঁছা যাচ্ছে না। তবুও খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অনিক। ডুমুর গাছের পাশে আরেকটি দেবদারু ছায়া কিছুটা জমিয়ে দিয়েছে ডুমুর গাছটিকে। ফলে রোদ পড়ার কোনো সুযোগ নেই ডুমুর গাছে। রোদহীন গাছটি নিজের ছায়া আর দেবদারুর ছায়া নিয়ে অনেকটা অন্ধকার হয়ে আছে। অনিক চোখের আলো জ্বেলে দেখার চেষ্টা করছে। তবুও দেখে না কিছুই। কিন্তু অনিক এ বিষয়ে নিশ্চিত যে ডুমুর গাছের ভেতর থেকে দপাদপি কিংবা পাখার ঝাপটা ভেসে আসছে।

দেবদারুর একটি ডাল এক হাতে জড়িয়ে ধরে পানির দিকে ঝুঁকে গেলো অনিক। ঝুঁকে ডুমুর গাছের তলা দেখার চেষ্টা করছে। দেখতে দেখতে আরো একবার পাখার ঝাপটানি ভেসে এলো। এবার দেবদারুর গোড়ায় বসে পড়লো অনিক। বসে বাম হাত দিয়ে যতটা সম্ভব দেবদারুকে জড়িয়ে নিলো। তারপর শরীরের অর্ধাংশ বের করে ডুমুর গাছের তলায় চাইলো সে। ঠিক তখনি তার চোখে পড়লো একটি বড়সড় মাছরাঙা। মাছরাঙাটির একটি পা কামড়ে ধরে রেখেছে একটি গুইসাপ। মাছরাঙাটি প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু গুইসাপ কিছুতেই ছাড়বে না এমন ভাব ধরে আছে। মাছরাঙাটি ডানা ঝাপটায় আর ঠোঁট দিয়ে কামড় দিচ্ছে গুইসাপের মাথায়। মাছরাঙার কামড়ে গুইসাপ কাবু হচ্ছে না মোটেই। কিন্তু একটি পায়ের বেশি মাছরাঙাকে জব্দ করতেও পারছে না। কামড় দিয়ে ঝিম মেরে বসে আছে গুইসাপটি। অনিকের মনে হলো সম্ভবত গুইসাপটি কৌশল খাটাচ্ছে। পা কামড়ে পড়ে থাকলে পাখিটি অনবরত পাখা ঝাপটাবে। এভাবে ঝাপটাতে গেলে একসময় দুর্বল হয়ে পড়বে মাছশিকারি পাখিটি। আর তখনই খাবে তাকে। মাছরাঙাটির বিপদ দেখে অনিক খুব কষ্ট পেলো। সে সিদ্ধান্ত নিলো যে করেই হোক মাছরাঙাটির প্রাণ রক্ষা করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? ভাবনায় পড়ে গেলো সে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি উঁকি দিলো তার। তখনি দ্রুত দৌড়। রান্নাঘরের পাশ থেকে একটি বাঁশ নিয়ে আবার দৌড়। সেই দেবদারুর গোড়ায় দাঁড়িয়ে টার্গেট করলো গুইসাপটিকে। ডুমুর গাছের তলায় যেখানে গুইসাপটি মাছরাঙার পা কামড়ে ধরে আছে ঠিক সেখানে বাঁশটির মাথা পৌঁছে দিলো।

বাঁশের মাথা দিয়ে গুইসাপের মাথায় যতটা সম্ভব জোরে গুঁতো দিলো অনিক। গুঁতো খেয়ে গুইসাপটি রাগে ফুলে উঠছে। চোখ খানিকটা বড় করে

www.icsbook.info

যেনো অনিককে শাসাচ্ছে। কিন্তু মাছরাঙাকে ছাড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। একটু কায়দা করে আবার গুঁতো দিলো অনিক। গুঁতো খেয়েই গুইসাপটি ফুলতে ফুলতে কিছুটা বাঁয়ে সরে গেলো। এতটাই সরলো যে অনিক খুব সহজে গুঁতো দিতে পারছে না।

দেবদারু গাছটাকে জড়িয়ে ধরে শরীরকে খানিকটা কুজো করে দেখলো। ভাগ্য ভালো মনে হলো এ জন্য যে এখনো কোনো গর্ত দেখা গেলো না। যদি কোনো গর্ত থাকতো তবে মাছরাঙাটি আরো আগেই শেষ হয়ে যেতো। কারণ গর্তের ভেতর গুইসাপ ঢুকে পড়লে মাছরাঙার আর বাঁচার সম্ভাবনাই থাকতো না। গর্ত নেই ভেবে একটু খুশিই হলো অনিক। বাঁশের গুঁতো দেয়ার চেষ্টা শুরু করলো। খানিক চেষ্টা করেছে গুইসাপের চোখে গুঁতো দেয়া যায় কি না। চেষ্টায় সে সফলও হলো। চোখ টার্গেট করে গুঁতো দিলো জোরে। এবার গুইসাপটি আরো বেশি রাগান্বিত হলো। গুইসাপের পেট ফুলে ফুলে উঠছে। কিন্তু সে কিছুতেই মাছরাঙাকে ছাড়ছে না। বরং অনিকের মনে হলো খানিকটা বেশি জোরে চেপে ধরেছে মাছরাঙার পা। মাছরাঙাটি আগের থেকে আরো জোরে পাখা ঝাপটাচ্ছে। সম্ভবত উদ্ধারকার্যের বিষয়টি পাখিটি বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এতে কোনো কাজ হচ্ছে না। গুইসাপ মরিয়া হয়ে মাছরাঙার পা মুখে পুরে আছে। মাছরাঙাটি ভীষণ কাঁপছে। তার দুই চোখে ভয়ের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পাখা ঝাপটাতে কখনো ক্লান্ত হয়ে যায়। তখন কাঁপুনিটা বেশ বেড়ে যায়। অনিকের খুব মায়া লাগছে পাখিটার জন্য। অনিক ভাবে সারা জীবন মাছশিকারি পাখিটা এখন নিজেই অন্যের শিকার হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো। যে করেই হোক মাছশিকারি পাখিটাকে সে উদ্ধার করবেই। এবার শরীরের শক্তিকে ডান হাতে জড়ো করার চেষ্টা করে অনিক। বাম হাত দিয়ে দেবদারুকে ধরে সম্ভাব্য সব শক্তি ডান হাতে আনার চেষ্টা করলো। আরো খানিকটা ঝুঁকে গেলো পুকুরের দিকে। নিশানা ঠিক করে গুইসাপের মাথায় ভীষণ জোরে গুঁতো দিলো। এতেই কাজ হলো চমৎকার। ব্যথার চোটে গুইসাপটা ফুঁসে উঠলো। ফুঁসে ওঠার সাথে সাথে মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে গেছে। তাতেই মাছরাঙাটি মুক্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ডুমুর গাছের মগডালে বসলো।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটে গেছে অনিকের। জোরে গুঁতো দিতে গিয়ে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো না সে। ফলে গুইসাপটাকে গুঁতো দিয়েই

www.icsbook.info

ঝপাত করে পড়ে গেলো পুকুরে। পড়েই একরকম তলিয়ে যাবার দশা। বেশ সাহসিকতার সাথে সে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছে। গত বছরই অনিকের চাচা ওকে সাঁতার শিখিয়েছে। না হলে এখন কী হতো! তবুও খানিকটা পানি খেতে হলো তাকে। নাকে মুখে পানির থাবায় বেশ কাবু হয়ে গেছে অনিক। তলিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেলো সে। পানির তল থেকে মাথা তুলে চাইলো ডুমুর গাছের দিকে। তার চোখ পড়তেই দেখে গুইসাপটি তার দিকে চেয়ে ভীষণ ফুঁসছে। চোখ দুটি জবা ফুলের মতো লাল। পেট বেলুনের মতো ফুলে ফুলে উঠছে।

গুইসাপের চোখ দেখে কিছুটা ভয় পেয়ে গেলো অনিক। বয়সের তুলনায় সে অনেক বেশি সাহসী। তবুও তার ভয় করছে সাপের ফোঁসে ওঠা দেখে। সে দ্রুত পাড়ে ওঠার চেষ্টায় এগোচ্ছে। ঠিক তখনই গুইসাপটি তাকে আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো এবার। মনের অজান্তে বাঁচাও বলে চিৎকার দিলো সে। কিন্তু তার উপস্থিত বুদ্ধি তাকে ছেড়ে যায়নি। চিৎকার দিয়েই সে ডুব দিলো। ডুব দিয়ে খানিকটা পুকুরের মাঝখানে চলে গেলো। পূর্বপাড় থেকে উঠানের দিকে কি যেনো কাজ করছিলো অনিকের দাদী। বাঁচাও শব্দটি কানে যেতেই সচেতন হলেন তিনি। এ যে অনিকের কণ্ঠ। তাড়াতাড়ি উঠে এলেন পুকুরের পাড়ে। পুকুরে নজর দিতেই তার চোখ ছানাবড়া। গুইসাপের সাথে যুদ্ধ করছে অনিক। অনিক ডুব দিয়ে যে দিকে যায় গুইসাপও ঠিক সে দিকে ছোটে। ডুব থেকে মাথা তুলেই বলে বাঁচাও।

দৃশ্য দেখে অনিকের দাদীর কলিজা যেন চেপে ধরেছে কেউ। গায়ের সব শক্তি দিয়ে ডাকছে অনিকের বাবাকে চাচাকে।

অনিকের বাবা কাপড় ছেড়ে রাস্তার দিকে গেছে একটু আগে। বাইরে থেকে চাচা এসে কেবল ঘরের সামনে দাঁড়ালো। ঠিক তখনই মায়ের চিৎকার শুনতে পেলো। দৌড়ে এলেন তিনি। ততক্ষণে হইচই আর বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার। অনিকের মায়ের কান্না, প্রভার কান্না দুপুরকে ভারী করে তুললো। অনিকের চাচা ঘটনা দেখেই অবাক। দক্ষিণ পাড়ের কাছে পানিতে ভেসে থাকা বাঁশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অনিক তখন নানা দিকে ঘুরে পুকুরের মাঝখানে। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। দ্রুত সাঁতার কেটে পৌঁছে গেলো অনিকের চাচা। অনিকের পেছনে পিঠের দিকে এনে তার গলা ধরে ভেসে থাকতে বললেন। বাম হাত দিয়ে সাঁতার কাটছেন। আর ডান হাতে ধারা

www.icsbook.info

সেই বাঁশটি। অনিকের চাচাকে তীব্র বেগে সাঁতার কেটে বাঁশ হাতে আসতে দেখে খানিকটা ভয় পেয়ে গেছে গুইসাপটি। কিন্তু সে দমে যায়নি। তার মুখের খাবার কেড়ে নেয়ার শোক থেকে অসম্ভব রাগে সে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করছে। চাচা-ভাতিজা দু'জনের দিকে তেড়ে আসার সাহস দেখাচ্ছে সাপটি। অনিকের চাচা অভয় দিয়ে বললেন, শক্ত করে ধরে থাক আমার গলা। আর তিনি ডান হাতে বাঁশটি উঠিয়ে যথাসম্ভব জোরে বাড়ি দিলেন ধেয়ে আসা গুইসাপের দেহে। সাপটাও বেশ চালাক। বাঁশের বাড়ি থেকে রক্ষা পেতে সেও ডুব দিলো দ্রুত। এ সময় দ্রুত সরে এলো অনিককে নিয়ে তার চাচা। কিছুক্ষণ পর গুইসাপটা ভেসে উঠলো। ভেসে উঠে ভীষণ ফুঁসছে। আবার ধেয়ে আসছে অনিকের দিকে। আগের মতোই। বাড়ি দিলো অনিকের চাচা। আবার সেই বুদ্ধি খাটালো সাপটি। তবে এবার শেষ রক্ষা হয়নি। পুরো বাড়ি না লাগলেও অর্ধেকটা খেয়েছে সে। তাতে খানিকটা কাবু হয়ে গেছে সাপটি। বাড়ি খেয়ে ডুব দিলো দ্রুত কিন্তু সহজে আর উঠলো না। এই ফাঁকে দ্রুত সাঁতরিয়ে অনিককে নিয়ে পাড়ে উঠে এলেন তার চাচা। ভয়ে অনিকের মুখ সাদা হয়ে গেছে। বুকে জড়িয়ে নিলেন অনিকের মা। দাদী মাথায় গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। চুলে হাত বুলাচ্ছে প্রভা। কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করছে অনিকের চাচী। কেন পুকুরে নামলো, একা কেন এলো এসব নিয়ে বকাঝকা করছে অনিকের মা। কিন্তু অনিকের চাচা বেশ খুশি। তিনি অনিকের মাকে উদ্দেশ করে বললেন, ভাবী ওকে বকা দিবেন না। অনিক অনেক সাহসী কাজ করেছে। একটি শাপের সাথে লড়াই করে সুস্থ আছে সে। তাও খালি হাতে। এই বলে অনিকের পিঠে কোমল থাপ্পড় দিয়ে বললেন, সাবাস অনিক সাবাস! নাম রাখবে তুমি।

ঠিক এই সময় গুইসাপটি ভেসে উঠলো পানিতে। রক্ত বেরুচ্ছে সাপটির মুখ দিয়ে। অনিকের চাচা দেখেই বাঁশ নিয়ে তেড়ে ছুটছিলেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে বাধা দিলো অনিক। বললো- সেও একটি প্রাণী। ওকে জানে মারবেন না। ছেড়ে দিন চাচা। ও বেঁচে থাক।

অনিকের কথায় সবাই অবাক। ভীষণ অবাক হয়ে অনিককে বুকে টেনে নিলেন তার মা। মনে মনে ভাবলেন অনেক বড় হবে আমার অনিক।

www.icsbook.info

ওরা চাঁদে যায়

হারুন ইবনে শাহাদাত

আজ নাবিলের মনটা খুশিতে ভরা। গ্রাম থেকে ওর বড় চাচা ও তার বড় ছেলে নাফিস এসেছে। চাচীর হাতে বানানো নারকেল-পুলি, গোশত-পুলি, এলোকেশি, দুধ-চিতই আনতে ভুল করেননি চাচা। নাবিল পিঠা খেতে খুব ভালবাসে। চাচীর হাতের পিঠা হলে তো কথাই নেই। গ্রামের পিঠার মজাই আলাদা। বাসায় যে ওর মা পিঠা বানান না তা নয়। কিন্তু ইট পাথরের ঢাকা শহরের পরিবেশে বানানো পিঠাগুলো কেন যেন গ্রামের খোলা আকাশের নিচে মাটির চুলা আর মাটির পাতিলে বানানো পিঠার মতো মজা লাগে না। নাবিল নাফিসের চেয়ে দুই-তিন বছরের বড়। কিন্তু দুইজনে গলায় গলায় ভাব। নাবিল গ্রামে দাদু-বাড়ি গেলে ওরা দু'জন সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। খাবার সময় ছাড়া ওদের টিকিটিও দেখা

www.icsbook.info

যায় না। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে দুই ভাই। যমুনা নদীর তীর, হেমনগর রাজবাড়ি, বকুলতলা, শিমলা-পলিশা নাফিসের নানা বাড়ি ছোটাছুটি চলে সারাদিন। কখনো ওদের চাচার সাথে পুকুরে মাছ ধরে। নাবিল অবাক হয়ে মাছ ধরা দেখে। জীবন্ত মাছের লাফালাফি দেখে ওরা খুব মজা পায়। ঢাকায় এমন তাজা মাছ খুব একটা দেখা যায় না।

'ভাইয়া।' নাফিসের ডাকে নাবিলের ভাবনায় ছেদ পড়ে।

'কী?' নাবিল নাফিসকে প্রশ্ন করে।

'এবার আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?'

'আব্বুর কাজের যা চাপ, দেখি আব্বু কী বলেন?' নাবিল ভাবে, নাফিসের কী সুবিধা। সে বাড়ি যাওয়ার সাথে সাথে তাকে নিয়ে সাইকেলে বেরিয়ে পড়ে। কাউকে সাথে নিতে হয় না। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়ালেও কোনো সমস্যা হয় না। ঢাকা শহরটাও যদি এমন নিরাপদ হতো। কত মজা হতো!

'নাবিল, নাফিস ও তোমার চাচাকে নিয়ে ডাইনিংয়ে আসো।' নাবিলের মা ডাকেন।

নাবিল, চাচাকে নিয়ে ডাইনিং রুমে যায়। টেবিলে পিঠা-পুলির আয়োজন দেখে ওর মন খুশিতে নেচে ওঠে। ওর প্রিয় গোশত পুলি-পিঠা মুখে দিয়ে চাচার কাছে জানতে চায়, 'চাচা, পিঠায় মহিষের গোশত নাকি গরুর গোশত দিয়েছেন চাচী?'

চাচা হাসতে হাসতে বলেন, 'কেন, মহিষের গোশত?'

'মহিষের গোশত আমার খুব প্রিয়। কিন্তু ঢাকায় কোন্‌টা গরুর আর কোন্‌টা মহিষের গোশত চেনার উপায় নেই। কাওরানবাজার নয় তো কাপ্তান বাজার না গেলে মহিষের গোশত কেনাই যায় না।' নাবিল বলে।

'ঝাওয়াইল বাজারের কসাইরা খুব বড় একটা মহিষ জবাই করেছিল, সেই মহিষের গোশত দিয়ে তোমার চাচী এই পিঠা বানিয়ে তোমার জন্য পাঠিয়েছে।' চাচা বলেন।

'চাচা, চাচীকে বলবেন আমি খুব খুশি হয়েছি। এবার চাচীর জন্য একটি ভাল গিফট কিনবো।' নাবিল বলে।

শুধু চাচীর জন্যই কিনবে..

না, না, আপনার জন্য নাফিসের জন্যও কিনবো।

খাওয়া শেষে নাবিল নাফিসকে বলে, 'চলো, এবার তোমাকে নিয়ে মহাকাশ অভিযানে যাবো।'

www.icsbook.info

নাবিলের কথা শুনে নাফিস বলে, 'ভাইয়া তোমার চাপা মারা বন্ধ করো। একা একা স্কুলে যেতে পারে না, তিনি কি না আমাকে নিয়ে যাবেন মহাকাশে!'

নাবিল হাসতে হাসতে বলে, 'ঠিক বলেছো, আমরা শহরের শিশু-কিশোররা একা একা স্কুলে যেতে পারি না। তোমাদের মতো অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারি না। কিন্তু দেশ-বিদেশে এমনকি মহাকাশ অভিযানেও যেতে পারি।'

'তাহলে চলো।' নাফিস নাবিলের হাত ধরে বলে।

নাবিল নাফিসকে নিয়ে ওর রুমে যায়। দু'জন পাশাপাশি দু'টি চেয়ারে বসে। নাবিল নাফিসের হাতে একটি জয়ষ্টিক দেয়। দু'জন দুই জোড়া কালো চশমা পরে নিয়ে একটি টেবিলের সামনে বসে বলে, 'এই হলো আমাদের মহাকাশ যানের সুইচবোর্ড। প্রথমে আমরা চন্দ্রাভিযানে যাবো।'

নাফিস হাসতে হাসতে বলে, 'ভাইয়া, মহাকাশের আর কোন গ্রহতে এখনো কোন মানুষ যেতে পারেনি, অচেনা, অজানা জায়গায় না যাওয়াই ভাল, কি বলেন?'

'ঠিক, বলেছো। অচেনা অজানা গ্রহে গিয়ে আবার হারিয়ে যেতে পারি।'

'ভাইয়া আমাদের এ নভোযানের নাম কী?'

'কেন চাঁদে যাওয়ার যান এ্যাপোলো-১১। তোমার মনে নেই পৃথিবীর ইতিহাসের সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথা। ২০ জুলাই, ১৯৬৯। আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে সকাল ৯টা ৩২ মিনিটে তিন মহাকাশ অভিযাত্রী নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্সকে নিয়ে চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি জমায় 'এ্যাপোলো-১১'। ১৬ জুলাই রওনা হয়ে তারা চাঁদে পৌঁছান ২০ জুলাই (বাংলাদেশ তারিখ ২১ জুলাই)।'

'ভাইয়া তোমার মাথায় অনেক শার্প। দিন তারিখ আমার খুব একটা মনে থাকে না।' নাফিস বলে।

'মনে রাখবে যতই ভুলিবে ততই পড়িবে, তাহলেই মনে থাকবে।' নাবিল বলে।

'বা চমৎকার! যতই ভুলিবে ততই পড়িবে।' নাফিস নাবিলের এই কথাটি কয়েকবার আবৃত্তি করে।

'শোন, নীল আর্মসট্রং এর নিকট থেকে ধার করা আমাদের এই নভোযান, এ্যাপোলো-১১ এর চারটি প্রধান অংশ হলো : ১. ফ্রিস্টেজ রকেট স্যাটার্ন-৫

www.icsbook.info

(তিনটি রকেট নিয়ে তৈরি) ২. সার্ভিস মডিউল- রকেট ইঞ্জিন ও জ্বালানির জায়গা ৩. লুনার মডিউল 'ঈগল'- বিশেষভাবে তৈরি ছোট গাড়ি, যা চাঁদের বুকে চলার উপযোগী ৪. কম্যান্ড মডিউল ও কলম্বিয়া- মহাকাশযানের মূল নিয়ন্ত্রক অংশ। চাঁদের বুকে পৌঁছবার ৬২ থেকে ৭৫ মাইল দূর থেকেই আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন লুনার মডিউলে প্রবেশ করেন। কম্যান্ড মডিউল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এটি চাঁদে নামতে শুরু করে। চাঁদের পৃষ্ঠ অসমান হওয়ায় চাঁদের আকাশে সমান্তরালভাবে একে চালিয়ে নিয়ে সুবিধেমতো ইতস্তত নুড়ি ছড়ানো একটি জায়গায় নামানো হয়। এর প্রায় ৭ ঘণ্টা পরে আর্মস্ট্রং প্রথম মানব হিসেবে পা রেখেছিলেন চাঁদের মাটিতে।'

নাবিলের কথা শেষ হওয়ার আগেই নাফিস জানতে চায়, 'ভাইয়া, আমাদের হাতে অত সময় নেই, ৭ ঘণ্টা কেন ১ ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে পারবো না। আচ্ছা ভাইয়া, ওরা কতক্ষণ ছিলো চাঁদের মাটিতে।'

নাবিল বলে, 'নীল আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন চাঁদের বুকে সময় কাটান ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। এ সময় তারা চাঁদের বুকে পরীক্ষা চালানোর নানা যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং চাঁদের পাথর সংগ্রহ করেন। অভিযানের শেষাংশে তারা ফিরে যান লুনার মডিউলে। এটি চাঁদের বুক থেকে উঠে এসে কম্যান্ড মডিউলের সাথে যুক্ত হয়। আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন কম্যান্ড মডিউলে চলে আসে এবং লুনার মডিউলকে ছেড়ে দেয়া হয় মহাশূন্যে। পরবর্তীতে রকেট চাঁদের মহাকর্ষ কাটিয়ে পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করে। ২৪ জুলাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের ঠিক আগে সার্ভিস মডিউল পরিত্যক্ত হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩ কিলোমিটার উঁচুতে মহাকাশযান থেকে তিনটি বিরাট প্যারাসুট দিয়ে নেমে আসেন তারা। কম্যান্ড মডিউল নিরাপদে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে।'

নাফিস খুশিতে হাত তালি দিতে দিতে বলে ওঠে, 'কী মজা! আমরা ছুটে চলছি এই মাটি থেকে ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৪০৩ কিলোমিটার দূরে বায়ুশূন্য ও প্রাণহীন পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদে।'

নাবিল ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে বলে, 'মজা বুঝবে একটু পর। চাঁদে দিনের বেলা তাপমাত্রা ৪০০ ডিগ্রি কেলভিন এবং রাতে ১০০ ডিগ্রি কেলভিন।'

'নাবিল, নাফিস তোমরা কি সারাদিন ভিডিও গেম নিয়েই পড়ে থাকবে, নাকি নাওয়া-খাওয়ার দরকার আছে?' নাবিলের আম্মুর ডাকে দুই ভাই চমকে ওঠে।

www.icsbook.info

সোনালি দিনের প্রত্যাশা

আলতাফ হোসাইন রানা

মুমুদের পড়ার ঘরের জানালাটা খুললেই চোখ পড়ে ঐ ঘাস ফড়িংয়ের মাঠটার দিকে। শিশুদের কোলাহল আর হই চই রিনিঝিনি শব্দের মতো প্রায়শ কানে আসে। জোড়া কয়েক শিশুকে সব সময়ই মাঠটার মধ্যে খেলতে দেখা যাবেই। এদিক ওদিক তিড়িং বিড়িং নেচে বেড়ায় ঘাস ফড়িং। কেউ ফড়িং ধরার জন্য চুপি চুপি পা ফেলে। কেউবা ছুটোছুটি করে বল নিয়ে। বিকেল হলে পরিবেশ আরো সুন্দর হয়ে ওঠে।

মাঠের পশ্চিম পাশে সুনিবিড় ছায়াঘেরা শাল আর মেহগনি গাছগুলোর মাঝে মুমুদের বাড়ি। বাড়ির পেছনে বেশ কিছু দূর ছোট্ট নদী কীর্তনখোলা। ছোট্ট মেয়ের মতো রিনিঝিনি শব্দে নাচতে নাচতে সারাক্ষণ ছুটে চলে। পাশে নলখাগড়ার ঝোপ। শীতে ওখানে কাছিম রোদ পোহায়।

মুমুদের বাড়ির সামনে যে ফুলের বাগান রয়েছে, রঙবেরঙের প্রজাপতি সেখানে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। শাল গাছগুলো যেনো ইচ্ছে করেই চারদিক থেকে নীলাভ-ধূসর বিশাল বাঁধ দিয়ে বাড়িটিকে ঘিরে রেখেছে।

www.icsbook.info

মুমু তার খরগোশ ছানাটি কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ফুলের বাগান ঘেঁষে একেবারে মাঠটার কাছে গিয়ে থামে। মাঠের শিশুরা তখন বিচিত্র খেলায় মেতে ওঠে। কেউ কেউ খেলা বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে গোলাপের পাপড়ির মতো সুন্দর ছোট্ট মেয়ে মুমু এবং তার সাদা ফুটফুটে খরগোশ ছানাটির দিকে। মুমু ওটাকে নিয়ে রোজ বিকেলে মাঠে খেলতে আসে। মুমু ছানাটি কোল থেকে ছেড়ে দিলে মাঝে মাঝে ছুটোছুটি করতে করতে বাগানে ঢুকে পড়ে। বাগানে ঢুকেই খরগোশ ছানাটি ঘাসে গা ডুবিয়ে শুয়ে পড়ে কিংবা বন গোলাপের ঝোপের নিচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। ডালিম দানার মতো চোখ। দুষ্ট দুটো চোখে চোখ পড়তেই ছানাটি পালাতে চেষ্টা করে। বেশি দূর যেতে পারে না। মুমু ছানাটি কোলে তুলে নেয়।

মুমুর মনে পড়ে একবার বাবার সাথে সবাই মিলে বন বিভাগের পুরো এলাকা দেখার জন্য ঘুরতে বেরিয়েছিল। বনের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় আলোর ঝলমলে সবুজ প্রফুল্ল যেনো উজ্জ্বল ফুলে ফুলে। এই সময়টা বাগানে এমনিতেই ভালো লাগে। ফুটন্ত ফুলে ঘাস সুন্দর বর্ণ বৈচিত্র্য ধারণ করেছে। বাতাসে ভাসছে সুগন্ধি ঘাসের অপূর্ব ঘ্রাণ। আর আকাশে উঁকি মারছে গ্রীষ্মের স্নিগ্ধ সূর্য। উজ্জ্বল আলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে পুরো বাগান। সত্যি যেনো চারপাশে অপরূপ সুন্দরের সমারোহ। রঙ বাহারি প্রজাপতিরা ঘুরে ঘুরে ওড়ে মুমুর চোখের দৃষ্টি সীমানায়। দু-একটি গাছে কৃত্রিমভাবে খড়কুটো দিয়ে বোনা বড় মৌচাক। তাতে মৌমাছি উড়ছে গুনগুন করছে, কী একটা প্রাণী দেখে মুমু হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ওঠে-বাবা! দ্যাখো, দ্যাখো, কী সুন্দর একটা কি যেনো দৌড়ে যাচ্ছে।

মুমুর বাবা এক পলক দেখতেই প্রাণীটা পালিয়ে গেলো। ওটা হরিণ। দশ শিংঅলা হরিণ। বনের সবচেয়ে অভিজাত প্রাণী। বাবা মুমুকে বুঝিয়ে বললেন।

বিচিত্র বর্ণের কাঠঠোকরা এখান থেকে ওখানে উড়ে লাফিয়ে যাচ্ছিল। কতক্ষণ যে মুমু সেদিকে তাকিয়ে ছিল মনে নেই।

লাল ঝুঁটিঅলা বন মোরগ দেখে তো বায়নাই ধরে বসলো-আমাকে একটা লাল ঝুঁটির পাখি ধরে দিতে হবে।

আমি খাঁচায় পুষবো।

বাবা কতো করে বোঝালেন ওটা পাখি নয়, বন মোরগ, ধরা যাবে না। দেখো না কেমন ছুটে ছুটে পালাচ্ছে। কোনো কথাই শুনবে না মুমু। বন

www.icsbook.info

মোরগ পাখি তার চা-ই চাই।

শেষ পর্যন্ত খরগোশ দেয়ার লোভ দেখিয়ে শেষ রক্ষা। এখন যে খরগোশ ছানাটি নিয়ে মুমু খেলা করে সেবার ঘুরতে গিয়েই ছানাটির বাবা-মাকে নিয়ে এসেছিল।

মুমু এখন খরগোশগুলো নিয়েই সারাক্ষণ খেলায় মেতে থাকে। তাদের ঠিক মতো খাওয়ানো, শরীর পরিষ্কার করে দেয়া, আদর করাতেই যেনো তার আনন্দ। খরগোশগুলোর জন্য বড় ভাইয়াকে বলে চিলেকোঠায় ছোট্ট করে দুটো ঘর করে দিয়েছে। সকালের সোনালি রোদে যখন খরগোশগুলো আড়মোড়া ভেঙে খড় আর বিচালির ওপর এসে বসে মুমু তখন কতগুলো দুধ কলমি এনে ওদের সামনে ছড়িয়ে দেয়। দুধ কলমি খাবার হিসাবে খরগোশরা খুব পছন্দ করে। ছানাটির কুটকুট করে খাওয়া আর পিট্‌পিট্ করে ডালিম দানার মতো চোখ দুটোর চাওয়া দেখে মুমুর সাথে রুমু ঝুমু দু'জনেই খুশিতে নেচে ওঠে।

মুমুদের বাড়িটি সবুজ লাল ও ছাই রঙের ছাদে ছাওয়া গুড়ি কাঠের ছাই রঙা। মুমুর বাবা যখন বন বিভাগের চাকুরে ছিলেন তখন এমন সুন্দর বাড়িটি করেছিলেন। গেলো বছর বাবা কি একটা বড় অসুখে মারা গেলেন। মুমুরা চার ভাই-বোন। ছোট আরো দু'বোন। রুমু আর ঝুমু। বড় ভাই রাজু। বাবা মারা যাওয়ার পর বন বিভাগের বড় সাহেবকে বলে মুমুর বড় ভাই একটা চাকরি পায়। এতে কষ্ট হলেও তাদের অভাব কিছুটা দূর হয়। আয়ের উৎস হলেও ভাইয়ের সামান্য আয়ে সংসার ঠিকমতো চলে না। কাপড়, খেলনা নিয়ে রুমু আর ঝুমুর সাথে মুমুর প্রায়ই ঝগড়া বাধে। মুমুর এসব ভালো লাগে না। মুমু সারাক্ষাণ ভাবে, বার বার ভাবে, কবে বড় হবে। তাড়াতাড়ি বড় হওয়ার তার খুব ইচ্ছে পড়াশোনা করে বড় হবে। অনেক বড়। পড়াশোনাতেও মুমু ভালো। সব বিষয়ে তার ভালো দখল রয়েছে। আই কিউতে স্কুল শিক্ষকরা মুমুকে যখন জিজ্ঞেস করে- বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও। মুমু সোজা উত্তর দেয়- পাইলট হবো। বিমান চালাবো। পৃথিবীর সব দেশ ঘুরে ঘুরে দেখবো।

মা-ভাই-বোন নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে কার না ইচ্ছে করে। পয়সা খরচ হবে তাই মা তাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান না।

আজ নতুন বছরের প্রথম দিন। প্রতি বছরই এ দিনে মুমুরা আনন্দ করে। কিন্তু আজকের আনন্দটা তার কাছে অন্য রকম লাগছে। একেতো বছরের

www.icsbook.info

নতুন দিন। তার পর আবার এই দিনেই জন্ম হয়েছিল মুমুর। দুটো দিন এক সাথে পাওয়াতে মুমুদের বাড়িতেই যেনো আনন্দের বন্যা বইছে। লাল, নীল কিছু বেলুন দিয়ে বাড়ির ভেতরটা নিপুণ হাতে সাজিয়ে তুলেছে। বড় ভাইয়া মুমু ও তার ছোট বোনদের জন্য নতুন কাপড় ও খেলনা কিনে আনে। গতকাল ভাইয়া নতুন মাসের টাকা পেয়েছে। মুমু অনেকগুলো নতুন কড়কড়ে টাকা তার ভাইয়াকে গুনতে দেখে একপলক চেয়ে থাকে। মুমু তার বাবাকেও এমন করে টাকা গুনতে দেখেছে। ভাইয়া দেখলো মুমু তার দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে।

মুমুকে ডাক দেয় ভাইয়া-কি মুমু নিবি, আয় কাছে আয়। নতুন একটা পঞ্চাশ টাকার নোট মুমুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাকি টাকাগুলো মায়ের হাতে তুলে দেয় বড় ভাইয়া। চকচকে নতুন টাকার নোট পেয়ে মুমু যেনো খুশিতে মাতোয়ারা। এর আগে পাঁচ বা দশ টাকার দু-একটা নোট পেলেও পঞ্চাশ টাকার নোট এটাই প্রথম। মনে একটা অজানা আনন্দ নিয়ে মুমু বেরিয়ে পড়ে ঘরের বাইরে।

পাশের বাড়ির সমবয়সী আনিকাকে পেয়েই ডাক দেয় মুমু- অ্যাই আনিকা দ্যাখ দ্যাখ, আজ না ভাইয়া আমাকে কতো সুন্দর একটা নতুন টাকা দিয়েছে। তোর আছে এমন নতুন টাকা?

আমার যে ভাই নাই। আনিকার শান্ত জবাব।

তাহলে তোকে কেউ এমন সুন্দর টাকা দেয় না বুঝি।

দেয়, আমার আব্বা আমাকে দেয়। তবে পঞ্চাশ টাকা না পাঁচ টাকা দেয়।

ঠিক আছে, তুই তো আমার স্কুলের বন্ধু।

ভাইয়াকে বলবো তোকেও একটা সুন্দর নতুন পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে। কেমন?

আচ্ছা, আনিকা উত্তর দেয়।

এভাবেই হই চই আর আনন্দ করে পুরো দিনটি কাটিয়ে দেয় মুমু। রাতে মায়ের পাশে ঘুমাতে গিয়ে মুমু অজানা অনেক ভাবনায় পড়ে যায়। আগের কথাগুলোই আবার ভাবতে থাকে। অনেক বড় হবে। বিমান চালাবে। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে। মা, ছোট বোনদের মুখে হাসি দেখবে। মুমু ভাবে এমন দিনগুলো তার কবে আসবে। ভোরের সূর্যের মতো তার জীবনে নতুন দিনগুলোর উদয় হবে। মুমু এখন সেই কাঙ্ক্ষিত সোনালি দিনের প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ।

www.icsbook.info

রোশনীদের ঈদ

মাহফুজুর রহমান আখন্দ

রোশনী। দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে। চোখে মুখে মায়াবী প্রলেপ। পরনে হালকা রঙের সালোয়ার-কামিজ। রঙ জ্বলে যাবার কারণে আরো বেশি হালকা লাগছে জামাটি। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দু-একটি অতিরিক্ত সেলাইও চোখে পড়লো। ছিঁড়ে যাওয়া জায়গাগুলো হাতের সুচেই সেলাই করে নিয়েছে। খুব খেয়াল না করলে চোখে পড়ে না। দক্ষ হাতের সেলাই বলেই মনে হলো। মাথায় হিজাব। ছেঁড়া ওড়না কেটে হিজাব বানানোর চেষ্টা করেছে। খুব সুন্দর না হলেও হিজাবি রোশনীকে ভালোই লাগছে। একজন মুসলিম কিশোরী হিসেবে মানিয়েছে বেশ। হিজাবের ছেঁড়া জায়গা দিয়ে খোঁপার অংশবিশেষ দেখা যায়। মাথায় চুল খুব বেশি নেই। চুলগুলো কিছুটা তামাটে। পার্লারে গিয়ে ফ্যাশন করে এমনটি করেনি। তেল-স্যাম্পুর অভাবেই তামাটে হয়েছে,

www.icsbook.info

তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

– স্যার, মালা লইবাননে, বকুল ফুলর মালা। স্যার ও স্যার।

চমকে উঠলাম আমি। আসলে এতক্ষণ ওকেই পর্যবেক্ষণ করছিলাম গভীরভাবে। 'ও হ্যাঁ, মালা? দাম কত?'

– দশ টিঁয়্যা স্যার। ফুঁইছন না স্যার, সুন্দর বাসনা।

সত্যিই ফুলগুলো বেশ টাটকা। গন্ধটা খুব মজার। মনটা ভরিয়ে দিলো নিমিষেই। বকুল ফুলের গন্ধ আমার ভীষণ পছন্দ। মালাতো কিনবোই। কিন্তু ওর সাথে কথা বলার খুব ইচ্ছে হলো আমার। জানতে ইচ্ছে করলো ওর পরিচয়। কেন যেনো মনে হলো সে আমাদের বাংলাদেশের মেয়ে না। আরাকানের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মেয়ে হবে। রোহিঙ্গাদের নিয়ে গবেষণা করতে করতে ওদের বিষয়ে ভীষণ স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছি আমি। তাই কথা বাড়ানোর চেষ্টা করলাম।

– কয়টা মালা আছে তোমার কাছে?

– স্যার দওশশো আছে স্যার।

– সবগুলো কতো টাকা নেবে?

– একশো টিঁয়্যা।

– একশো টাকা! সবগুলো নিলে দাম কম নেবে না?

– অনে খননা স্যার, কটিঁয়া দিবেন? চোখে-মুখে মায়াময় হাসির ঝিলিক।

বেশ খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে আমাদের সম্পর্কটা। আমি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম। 'কয়টা মালা নিয়ে এসেছিলে?'

– বিইশশোটা। দশশো ব্যাচা হয়ে গি।

– কোথায় বাড়ি তোমার?

– টেননাফত।

– টেকনাফের কোথায়? কোন জায়গার নাম না বলে শুধু ইশারা করে দেখালো।

আমার সন্দেহটা আরো বেশি ঘনীভূত হলো। 'তোমার আব্বু কী করেন?' বলতেই চোখ দুটো কেমন নিচের দিকে নামিয়ে নিলো সে। তার চঞ্চলতাও নেমে এলো শূন্যের কোটায়। বুঝতে আর বাকি থাকলো না যে ওর বাবা নেই। নিজেকে বেশ অপরাধীই মনে হলো। কেন ওর কষ্টটা বাড়িয়ে দিলাম? কিন্তু ভেতরে ভেতরে আগ্রহটা আরো বেশি তীব্র হলো ওকে জানার। তাই আবারো জিজ্ঞেস করলাম, তোমার আব্বু কবে মারা গেছেন?

www.icsbook.info

কোনো কথা বলতে চাচ্ছে না সে। মনে হলো তার চোখে পানি জড়ো হতে শুরু করবে এখনই। আমি কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ফুলগুলো হাতে নিলাম। বললাম, একশো টাকাই দেবো? সে শুধু মাথা নাড়লো। পরিবেশটা হালকা করতে চাইলাম আমি। বললাম, যদি পাঁচশো টাকা দেই? মানিব্যাগ থেকে নোটটা বের করে ওর সামনে তুলে ধরলাম। পরিবেশ সামলে নিয়ে কিছুটা হাসির আভা ছড়িয়ে দিলো ঠোঁটের কোণায়। আমি হয়তো তার সাথে মশকরা করছি। তেমনটিই মনে হলো ওর চেহারা দেখে। তাই একটু দৃঢ়তার সাথেই বললাম। 'হ্যাঁ, যদি তোমাকে পাঁচশো টাকা পুরোটাই দেই?'

– আয়ার ছোটবোনর লাই লাল জামা কিনিবাল্যায় ফুলর মালাগুন বেচিদ্দে স্যার। সামনে ঈদ।

– তোমার ছোটবোন আছে? কী নাম ওর?

– আচে স্যার। আরিফা। ছয় বছর। খুব দুষ্টু স্যার।

– লাল জামা খুব পছন্দ করে সে?

– মাথা নাড়িয়ে সায় দিলো। কিন্তু কী যেন বলতে গিয়ে আবার থেমে গেলো সে। আমি তাকে আবারো জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাড়ি কী সত্যিই টেকনাফে?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো সে। তারপর হাতের ইশারায় নাফ নদীর ওপারের দিকে ইঙ্গিত করলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আরাকানে? মাথা নাড়লো সে। আরাকানের কোন এলাকায়?

– মনডু, বর্মার মগরা আঁয়ার বাফোরে মারি ফালাইয়্যে। দঁড ভাইরেও মারি ফালাইয়্যে। মগে আঁয়ার ঘরবাড়ি জ্বালাইপুরাই দিয়্যেই। আঁই, আঁয়ার ছোঁডবোন আর মা বর্মত থোন টেননাফত দাই আইগিয়ই। চোখের কোণায় আবারো পানি জমে এসেছে। কণ্ঠও ভারি হয়ে এসেছে তার।

– এখানে কোথায় এসে উঠেছো?

– আঁয়ার মামাও টেননাফত দাই আইগিয়ই।

– কী হয়েছিল ওখানে?

সে আরো জানায়, মগরা তাদেরকে ঘর থেকে বের হতে দেয় না। শুধু মারে। তাদের বাড়িঘর পুড়ে দিয়েছে। বেশি কিছু বলতে পারে না সে। নির্যাতনের ভয়াবহতার কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারে না। শুধু লাশ আর বাড়িঘর পোড়ানোর কথাটি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে থাকে। তবে তার

www.icsbook.info

কথার মধ্য দিয়ে সাজানো গোছানো বাড়িঘরের কথা বোঝা গেল। সুন্দর ছিমছাম টিনের বাড়ি ছিলো তাদের। বাড়ির চারপাশে নানা ফলের গাছে ভর্তি ছিল। জমিজমা যা ছিল তাই দিয়েই তাদের সারা বছরের খাবার হয়ে যেতো। তার বড়ভাই এবং বাবা মিলেই জমিতে চাষাবাদ করতো। বাড়ির পাশের মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে পড়তো রোশনী। মাঝে-মধ্যে ওর ছোটবোন আরিফাও যেতো পড়তে।

রোশনীর বাবা খুব শৌখিন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মেয়েদের খুব আদর করতেন। বিশেষ করে ছোটমেয়ে আরিফাকে। চোখের আড়াল হতে দেননি কখনো। যখন যা আবদার করেছে, তাই পূরণ করার চেষ্টা করতেন তিনি। সেবার ঈদে লাল জামা চেয়েছিল সে। বাবা কিনেও দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেলো। রাত দশটার দিকে পুলিশের সাথে মগেরা এসে ধরে নিয়ে যায় তার বাবাকে। পরের দিন লাশ পাওয়া যায় খালপাড়ের জঙ্গলের ভেতর। এ নিয়ে শুরু হয় গন্ডগোল। রোশনীর ভাইসহ অনেককেই মেরে ফেলে ওরা। চাচাতো বোন সামিরাকে তুলে নিয়ে যায় বাড়ি থেকে। তাকে আর পাওয়া যায়নি। বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কেউ কেউ পুড়েই মারা যায়। পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে রোশনীরা তার মামার সাথে পালিয়ে আসে টেকনাফে। আসার সময় আট দিন নৌকার ভেতরে ভেসে ভেসে সময় পার করেছে। বিশুদ্ধ পানি আর খাবারের অভাবে অনেকেই মারা গেছে নৌকার ভেতরে। বাংলাদেশেও আশ্রয় নেয়া কঠিন। বিজিবির চোখ ফাঁকি দিয়ে রোশনীরা আশ্রয় নিয়েছে টেকনাফের নাইট্যাংপাড়া পাহাড়ি জঙ্গলের ঝুপড়িতে।

রোশনীর কথাগুলো স্বপ্নের মতো মনে হলো। চোখের সামনে সিনেমার মতো চিত্রায়িত অবস্থায় ভাসতে থাকলো দৃশ্যগুলো। কোন কথা বের হচ্ছে না আমার মুখ থেকেও। এমন নিষ্পাপ মেয়েটি যদি আমাদের কারো হতো? মায়ায় জড়িয়ে গেলাম ভীষণভাবে। রোশনীর মাথায় হাত বুলিয়ে আরো পাঁচশো টাকা যোগ করে বললাম, তুমিও একটা লাল জামা কিনে নিও। আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো রোশনী। হয়তো তার বাবার কথাই মনে পড়েছে। তার বাবার দেয়া লাল জামাটিই হয়তো সে অনুভব করছিলো তখন। ঈদের দিনে লালজামা পরা রোশনী আর আরিফার চেহারাটা ভাসতে থাকলো আমার চোখের মণিতে। নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে দু'টি আদুরে লালপরী।

www.icsbook.info

ঈদের চাঁদ

আবুল হোসেন আজাদ

সবে ভোর হয়েছে। পাখিদের কলকাকলিতে চারিদিক মুখরিত। কাল সন্ধ্যায় চাঁদ উঠেছে। ঈদের চাঁদ। ঈদের খুশির ঢেউ তাই আছড়ে পড়েছে প্রতিটি ঘরে ঘরে। ইমনের কেবল ঘুম ভেঙেছে। আজ কখন ফজরের নামাজের আজান হয়েছে শুনতে পায়নি। কাল সারারাত প্রায় জেগেই ছিল। ঈদের আনন্দে নয় দুঃখে। শেষ রাতের দিকে চোখটা বুজে এসেছে।

ইমনের আব্বু চাকরি করেন ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। ছুটি পান কম। তবে প্রতি ঈদে বাড়িতে আসেন। তখন ইমনের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসেন। ইমন আব্বুর আনা টুকিটাকি উপহারগুলো পেয়ে খুশিতে

www.icsbook.info

বিভোর হয়ে যায়। যে ক'দিন আব্বু বাড়ি থাকেন ছুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আব্বুর কাছ ছাড়া হয়না। মা বকা দিতেন। ইমন তাতে ভ্রুক্ষেপ করত না।

সেই মা আজ নেই। গত বছরের ঈদেও মা ছিলেন। কত কিছু রান্না করে মা কোলে বসিয়ে খাইয়ে দিয়েছেন। সে কথা মনে হতেই ইমনের মনটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। হু হু করে কান্না বেরিয়ে আসে। ঈদের খুশির দিনেও সে কান্না চেপে রাখতে পারে না।

দাদী ভোর বেলা উঠে উঠানকাঠান ঝাড় দিয়ে চুলো ধরিয়েছেন। সিমাই, লাচ্চি আর কী কী যেন রান্না করছেন। সে দিকে ইমনের তেমন আগ্রহ নেই। ইমনের মা গত বছর ফেব্রুয়ারিতে মারা গেছেন। হয়েছিল ব্লাড ক্যান্সার। যখন রোগটি ধরা পড়লো সেখান থেকে মাস পেরুতে না পেরুতেই ওর মা চলে গেলেন। ইমন তখন ক্লাস টু তে পড়ে। হাসপাতাল থেকে মার লাশ রাত্রে এনে দাফন করা হলো। ইমন মায়ের মরা মুখখানা দেখলো। সে রাতে আকাশে চাঁদ ছিল। ওদের বাড়ির উঠনের শিউলি তলায় খাটিয়ায় মার লাশ। শিউলি পাতার ফাঁক গলে জোছনার আলো উপছে পড়েছে মার মুখের ওপর। ইমন মা মা বলে কেঁদে উঠলো চিৎকার করে।

এখন গ্রামের স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে ইমন। ওর আর কোনো ভাই বোন নেই। দাদা দাদী ওকে আগলে রেখেছেন। ওরা ছাড়া আছেন এক ছোট চাচা ও ফুফু। সবাই ওকে খুব আদর স্নেহ করেন। মা না থাকার ব্যথাটা ওরা কেউ ইমনকে বুঝতে দিতে চায় না। ইমনের মন তবুও মানে না। চারিদিকে মায়ের মুখটা খুঁজে বেড়ায়। ওর ছোট্ট মনে মায়ের অনেক স্মৃতি চোখের তারায় ভেসে ওঠে।

বেলা অনেকটা হয়ে গেছে। ওদের গ্রামের মসজিদের মাঠে ঈদ জামাত শুরু হবে সকাল আটটায়। আব্বু ইমনকে কোলে তুলে নিলেন। বাড়ির সামনেই ওদের পুকুর। পুকুরে গিয়ে সাবান মাখে ইমন। গোসল সেরে আব্বুর আনা নতুন পায়জামা পাঞ্জাবিটা পরে নেয়। মাথায় পরে নেয় লাল টুপি। খুব সুন্দর লাগছে ইমনকে। ইমন ছুটে যায় দাদীর কাছে। দাদী ওকে জড়িয়ে ধরে মুখে চুমু দিয়ে আদর করতে থাকেন। আব্বু ওদিকে তাড়া দেয় ঈদগাহে যাওয়ার জন্য। ইমন চলে আসে।

সকালের মিষ্টি সোনালি রোদ গাছগাছালির পাতার ফাঁক গলে ঈদের মাঠে এসে পড়েছে। তখন ঝিরিঝিরি হাওয়া বইছে। সারা ঈদগাহে রঙবেরঙের কাগজের ফুলে সাজানো হয়েছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

www.icsbook.info

ঈদগাহের প্রবেশপথে বড় গেটে কলেমা ও আল্লাহু আকবর লেখা ব্যানার টাঙানো। আব্বুর হাত ধরে ইমন ঈদগাহে ঢুকে পড়ে। ওর বয়সী ছেলেরাও আসছে হু হু করে নদীর স্রোতের মতো। দেখতে দেখতে ঈদগাহটি ভরে যায়। প্রায় প্রতিজনের গায়ে নতুন জামা পায়জামা টুপি। গ্রামের গরিব যারা তারাও অনেকে নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে এসেছে। কেউ পায়জামা পাঞ্জাবি কেউবা নতুন লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরে। কেউবা পুরানো জামা পরিষ্কার করে গায় দিয়ে এসেছে। ইমনের দেখে খুব ভালো লাগে। বিষণ্ন মনটা কেটে যায়। একটা অদ্ভুত ভালো লাগা ওর মনে খেলা করে।

নির্দিষ্ট সময়ে ঈদের নামাজ শুরু হয়। পরে খুতবা। তারপর ইমাম সাহেব দেশ জাতি ও সারা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য দোয়া করেন। ইমনের দু'চোখে পানি টলমল করে। ইমাম সাহেব যখন কবরবাসীদের জন্য দোয়া করেন। তখন ইমন মার কথা মনে করে মনে মনে তাকে বেহেস্তবাসী করার জন্য বলতে থাকে। দোয়া শেষে সবাই উঠে কোলাকুলি শুরু করে। ইমনও অনেকের সঙ্গে কোলাকুলি করলো। বড়দের সাথে যেমন ছোটদের সাথেও তেমন।

এবার ঈদগাহ থেকে বাড়ি ফেরার পালা। ইমন আব্বুর সাথে চলে আসে বাড়িতে। ওদের বাড়ির পুব পাশে কটা কামিনি ফুল ও একটা বড় আমগাছের তলায় ওর মার কবর। কবরকে সামনে রেখে কেবলামুখী হয়ে আব্বুর সাথে ইমনও মায়ের কবর জিয়ারত করে। ততক্ষণে ওর পাড়া ও স্কুলের বন্ধুরা একসাথে ওদের বাড়িতে এসে পড়ে। ইতোমধ্যে ওর বন্ধু সাগর, পলাশ, নুরু, মিলন, সোহাগ, সবুজসহ অনেকে এসে পড়েছে। ওদের সবাইকে আপ্যায়ন করে বাড়িতে বসায়। ওদের খেতে দেয়। ইমনও ওদের সঙ্গে খেতে বসে। ওদের গল্প হাসি আড্ডায় ঈদের আনন্দ ভালোই জমে ওঠে।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়তে থাকে। রৌদ্র এখন প্রখর। একটা বউ কথা কউ পাখি পুকুর পাড়ের শিমুল গাছটায় বসে ডেকে যাচ্ছে একটানা। মৌমাছিরা আর কয়েকটা প্রজাপতি উড়ে উড়ে যাচ্ছে গাবফুলে এ ডাল থেকে ও ডালে। ইমনের মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। বন্ধুদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য এবার পা বাড়ায় ইমন। তখন পাশের বাড়ির টিভি থেকে জাতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলামের সেই গানটি ভেসে আসে– ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ।

www.icsbook.info

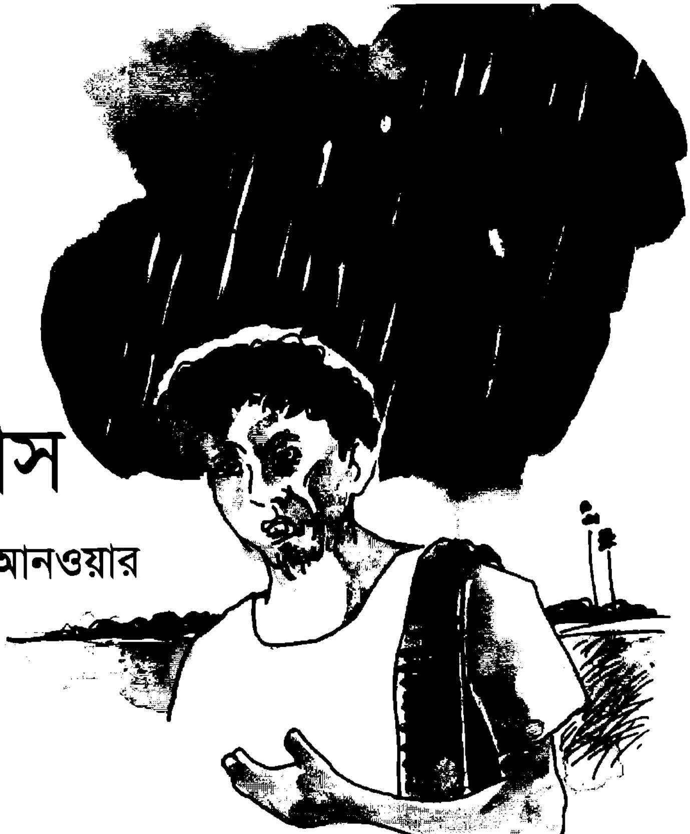

বিশ্বাস

হেলাল আনওয়ার

সময়টা ভালো যাচ্ছে না বুনো গাজীর। তার জীবনে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনায় সে একেবারে ভেঙে পড়েছে। তার স্ত্রী-বিয়োগ মানে-মারা যাওয়ার কারণে তার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

এই মহল্লার সবচেয়ে দামি-মানী না হলেও বুনো গাজী সবার চেয়ে ধনী। সম্পদের সাথে তার মনের তেমন মিল নেই। অর্থাৎ অর্থের প্রাচুর্যতা থাকলেও মনের দীনতা যেন তাকে আগলে রাখে। সম্পদের প্রতি অসীম মায়া। দুনিয়ায় সম্পদ ছাড়া আপন বলতে বুনো গাজীর তেমন আর কেউ নেই। এ নিয়ে এলাকার লোকজন বিভিন্ন মন্তব্যও করে থাকে। তবু বুনো গাজীর তাতে কিছু যায় আসে না।

সন্তানগুলোও বাবার মতো। এ জন্য বুনো গাজীর মনে অনেক আনন্দ। অনেক সুখ। সম্পদের অহংকারে কাউকে মানুষ বলে ভাবতো না। অনেক সময় মুখের পরে মানুষকে যা তা বলে ফেলতো। অভাবী মানুষেরা কিছু চাইলে বলতো- তোরা কি আমায় ফকির করে দিবি? কাজ করতে পারিস নে? লোকের দ্বারে চাতি লজ্জা করে না?

www.icsbook.info

স্ত্রী জামেলাও ছিলো স্বামীর অনুগত। তাই সে গর্ব করে বলতো–এটা ভাগ্যবানের বাড়ি। সবাই আয় বোঝে তো ব্যয় বোঝেন না।

এত সুখ নিয়ে বুনো গাজীর দিনগুলো বেশ খোশ হালেই পার হচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন নদীর ভাঙনের মতো বুনো গাজীর সুখের কপাল ভেঙে গেল। এলোমেলো হয়ে গেল তার জীবনের সবকিছু। আর এর মূল কারণ– তার অনুগত স্ত্রী জামেলা।

জামেলা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। বুনো গাজী যথারীতি ঝাড়ফুঁক আর লতাপাতার চিকিৎসা দিল। কিন্তু তাতে কোনো সুফল এলো না। অগত্যা ছেলেদের ডেকে বললো– তোমাদের মাকে একটু কবিরাজ দেখাও। কারণ, ঐ পরিবারে কোনোদিন ডাক্তার ডাকা হয় না, তার বদলে কবিরাজ দেখানো হয়। তাতে টাকা বেঁচে যায়। ছেলেরা বাবার কথা মতো পাশের গ্রাম থেকে রাশ কবিরাজকে ডেকে আনল। রাশ কবিরাজ হলো গরিবের বন্ধু। রাশ তার উপনাম। আসল নাম ছলিমুদ্দীন কবিরাজ। একবার কবিরাজি করতে গিয়ে একসের চালের ভাত কেবল কচু শাক দিয়ে খেয়েছিল। অর্থাৎ একরাশ ভাত। সেই থেকে রাশ কবিরাজ বলে পরিচিতি লাভ করে।

যাহোক, যথাসময়ে রাশ কবিরাজ এলো বুনোগাজীর বাড়ি। জামেলাকে দেখে চোখের পাতা ওপরে উঠিয়ে বলে– ভাই, তোমার বউয়ের পেছনে বেশ টাকা খরচ হবে।

ঔষধ বানাতে হবে।

– বুনো গাজী বলে, কত টাকা?

– তা শ' দুয়ের মতো।

– হ্যাঁ?

বুনো গাজীর মন খারাপ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ ভেবে নিলো। তারপর বললো– তোমার সাথে পরে আলাপ করবানে।

রাশ কবিরাজ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো তার দিকে। তারপর কবিরাজি ঝোলাটা বোগলে চেপে ধরে বলে– ভাই তালি চললাম।

রাশ কবিরাজ বুনোকে পেছন ফেলে সামনে পা বাড়ালো। তখন সে কবিরাজের দিকে ভ্রু কুঁচকে উপহাসের সাথে আপন মনে বলতে থাকে এ্যাঁ–আমার সাথে চালাকি?

কবিরাজি করবি তা আমার বেশ জানা।– অত সস্তা না। আমার থেকে ফাঁকি মেরে নেয়া। অন্যসময় কেউ অসুস্থ হলে ডাক্তার না জুটলেও কবিরাজ

www.icsbook.info

জুটতো। কিন্তু জামেলার ভাগ্যে তাও জুটলো না। ফলে, অসুখ আরো বেড়ে গেল। তার স্বাস্থ্যেরও অবনতি হলো। তবু এই হীন মানসিকতার একজন সদস্যও খরচের ভয়ে ডাক্তার দেখালো না।

দুই.

অমাবস্যার রাত।

গাঢ় অন্ধকারে চার পাশ আচ্ছন্ন।

জামেলা কাতরাতে থাকে। অসম্ভব যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে। তার কণ্ঠস্বরেও নেমে আসে আড়ষ্টতা। আধো বোলে বুনো গাজীকে ডাক দেয়–

– কই শুনতে পাচ্ছো?

বুনো গাজী গভীর ঘুমের ভেতর। জামেলার নিচু ও রুগ্নস্বর তার কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। জামেলা দেহের সমস্ত শক্তি কণ্ঠে এনে ডাক দেয়!

– কি হলো-একটু শোন–?

বুনো গাজী চোখ বন্ধ করেই বলে-আরে-ঝামেলা করো কেন? ঘুমিয়ে পড়তো?

– আমার যে মোটে ঘুম আসছে না।

– চোখ বন্ধ করে চুপ করে থাকো। তাহলে ঘুম আসপ্যানে।

জামেলার কষ্ট হয়। আর কোনো কথা বলতে পারে না।

কথা বলার মতো শক্তিও তার শরীরে নেই। খাদ্যহীনে-পথ্যহীনে দুর্বল দেহখানা যেন জামেলার ব্যক্তি সত্তাকে উপেক্ষা করছে।

এক সময় জামেলা তার শরীর আর স্বাস্থ্য নিয়ে গর্ব করতো। অহংকার করে বলতো–আমার কোনো রোগ বালাই নেই। সারা বছরেও আমার পেছনে একটা পয়সাও খরচ হয় না। কোনো ডাক্তার কবিরাজ লাগে না। আরো কতো কথা।

বুনো গাজীকে সে আবারো ডাক দেয়।

– আমার একটু পানি দাও না!

বুনো পাশের কলস থেকে একমালা পানি জামেলার দিকে এগিয়ে দেয়। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় অস্থির জামেলা পানিটুকু ঢক ঢক করে খেয়ে নিলো।

বুনো গাজী রাগে বিড় বিড় করতে থাকে।

জামেলা বুঝতে পারে। জিজ্ঞেস করে– কিছু বলছো?

www.icsbook.info

– না, আর কী বলবো?

– আসলে আমি খুব ঝামেলা করছি না?

– ঝামেলা আর কী? তোর সাথে সাথে আমারও কবরে যেতে হব্যানে। জামেলা ভীষণ কষ্ট পায় বুনো গাজীর কথায়। তবু তো কিছুই করার নেই তার। ক্ষীণ সুরে বলে– এখন ঘুমিয়ে পড়।

ঘুমিয়ে আর লাভ কী? তোর সাথে রাতটুকু কাটাই দিই! তারপর হালচাষ বন্ধ হয়ে যাক। এ পুরি পাল্লারা মুখে তুলো পুরে দিন কাটায় দিক। আর কী?

আসলে বুনো গাজীর এখন আর হালচাষ না করলেও চলে। গোলা ভরা ধান। পুকুর ভরা মাছ। অভাব বলতে বুনো গাজীর সংসারে নেই। তারপরও কাজ না করে সে থাকতে পারে না। কাজ করা তার নেশা আর পেশা। কাজ তার চাই। বুনো গাজীর অভাব অর্থাৎ সম্পদের অভাব না থাকলেও মনের অভাব তাকে জাপটে ধরে। প্রতিদিন সকালে হুকো সেজে নেশা মিটিয়ে বুনোগাজী চলে মাঠের দিকে। হাল চাষ করে। তারপর সময় হলে পান্তাভাত আর ঝালপুড়া নিয়ে মাঠে পৌঁছে দেয়। বুনো গাজী আলের পরে পা দুটো লম্বা করে গামলাটা ওপরে রাখে। এরপর খেতে শুরু করে। খাওয়া শেষ হলে গাঁটি থেকে তামাক পোড়ার মাজন আঙুলের মাথায় নিয়ে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। অতঃপর লাঙলের তাড়া ধরে পাচুনী দিয়ে বলদের পাছায় গুঁতো মারে। আর তাতেই বলদ বুঝে যায়।

জামেলা বুনো গাজীকে বলে– কাজতো তুমি সারা জীবন করলে! আমিওতো কোনোদিন এ সংসারে বসে থাকিনি। যার জন্য জমি জিরাতও কম করনি! আল্লাহ দিলে তোমার অভাবও নেই। কিন্তু আমার জন্য তুমি একটু ঔষুধও আনতে পারলে না?

– আরে কস কি? জানিস, সেদিন ওকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হলো। আবার কচ্ছিস ঔষধ জুটলো না?

জামেলা বলে– সকালে মিয়াভাই এসে বললো– ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাতি। আমার অসুখ নাকি খুব মারাত্মক!

– ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব তা টাকা পাবো কনে? তোর মিয়া ভায়ের কাছ থেকে কিছু নিয়ে আয়তো দেখি?

– সে কি? মিয়া ভায়ের কাছ থেকে আনবো কেন?

– তাহলে এতো টাকা পাব কনে?

– তুমি কি ভুলে গেলে বাবার বাড়ির দশ বিঘা জমি তোমার সংসারে

www.icsbook.info

এনেছি? তাতে হয়নি? এখন আবার কচ্ছো মিয়া ভায়ের কাছ থেকে আনতে!

জামেলার মন আরও খারাপ হয়ে যায়। সারা জীবন এই সংসারের জন্য কিই না করেছি!

কিন্তু কিইবা পেলাম? শুধু বলদের মতো এ সংসারে কাজ করেছি। সম্পদ বানিয়েছি। জীবনকে যেনতেনভাবে পার করে দিয়েছি। আর সম্পদ জমিয়েছি। কিন্তু এগুলো কাদের জন্য করেছি? সন্তানদের সুখের জন্য? আমাদের জন্য তাহলে কী করলাম?

সকালে বুনোগাজী যথারীতি লাঙল আর বলদ নিয়ে মাঠে চলে- । জামেলা ছেলেদের ডাক দেয়। বলে- এভাবে বিনা চিকিৎসায় আমাকে তোমরা আর কত ভোগাবে?

– কেন আব্বা তোমার ঔষধ এনে দিতে পারে তো?

– তোদের আব্বার কথা বাদ দে।

– কেন মা?

– তোদের আব্বা এসব বোঝে না।

– তাহলে আমরা কিইবা করতে পারি বলো?

– আমি তাহলে মরে যাব?

ছেলেদের কথা শুনে জামেলার ভীষণ কান্না পায়। তার দু'চোখে বেদনার ঝড় ওঠে। এই জীবনে তাহলে টাকার চেয়ে সম্পদের চেয়ে আপন আর কেউ নেই? অর্থ লিপ্সায় বাবা, মা, এমনকি আপনজনকেও পর করে দেয়? যাদের জন্য জীবনকে কোরবানি করেছি তারা আজ অবহেলা করছে?

জামেলার বোবা বেদনা পুরনো স্মৃতিকে বিষময় করে তোলে। সম্পদ আর অর্থের প্রাচুর্যতার মাঝে যে প্রকৃত সুখ নেই তা সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করে।

জীবন যন্ত্রণায় জামেলার পরাজিত মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। যে জীবন কেবল স্বপ্নের মোহে কেটে যায় সে জীবন সুখের খেয়া হারিয়ে ফেলে। জীবন কেবল অর্থহীন ব্যর্থ নয় অর্থলিপ্সার কারণেই সুখ থেকে বঞ্চিত হয়। হাড্ডিসার জামেলার জীবন তেমনই এক সংসারে কালো ইতিহাসের এক খণ্ডচিত্র।

তিন.

ইদানীং বুনোগাজী প্রায়ই মন খারাপ করে থাকে। বাড়ির পাশে ছোট্ট পুকুর। পুকুর ধারে আমগাছ। তার ছায়ায় বসে বসে পুকুরের মাছ দেখে। মনে মনে ভাবে বাহ, এরা কত সুখী! অথচ–

www.icsbook.info

পাড়ার অনেক মানুষ এখন বুনোগাজীকে এড়িয়ে চলে। তার স্ত্রীর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বরণ করাটা কেউ পছন্দ করেনি। তাছাড়া তার অর্থলিপ্সা মানুষের মনে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করেছে।

ছেলেদের সবার বিয়ে শাদি দিয়ে বুনোগাজী ভারমুক্ত হতে চেয়েছিলো। ভেবেছিলো বৌমাদের সেবা নিয়ে বাকি দিনগুলো পরম সুখে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু তা আর হলো না। বৌমারাও এখন আর তার নিকটে আসতে চায় না। আর ছেলেরা তো তার নিজের মতো। সারাদিনও খোঁজ নেয়ার সুযোগ নেই তাদের।

এখন তার কেবল জামেলার কথা মনে পড়ে। ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে করে বুনো গাজী খুব কষ্ট পায়। তাছাড়া বয়সের বোঝা যেমন বুনোগাজীকে অসহায় করে তোলে তেমনি বুড়োর বোঝা অন্যের জন্য বড় ঝামেলা হয়ে যায়। তা থেকে বুনোগাজীও মুক্ত নয়।

যে বৃদ্ধের স্ত্রী আগে মারা যায় সেই কেবল বুঝতে পারে তার যন্ত্রণা কতো বড়। বিপদের লাল ঘোড়া দুর্বল শরীর কেমন অথর্ব করে দেয়। বুনোগাজী এখন হাড়ে হাড়ে টের পায়। আগে সে ভাবতো এসব কিচ্ছু না।

কিন্তু সে জীবনকে বুঝতে পারছে।

বুনোগাজী এখন আর আগের মতো মাঠে যেতে পারে না। হালচাষের মতো তার গায়ে জোর নেই। ছেলে বউদের সব আলাদা করে দিয়ে নিজেকে ভার মুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা আর হলো না। জমিজমা সবকিছু ভাগাভাগি করে দিয়ে এখন আর নিজের বলে কিছু নেই। এমনকি যাদের জন্য সারা জীবন এত কষ্ট করে সম্পদ বানিয়েছে তারা ভালো আচরণটুকুও করে না তার সাথে।

ছেলেরা অনেক সময় তার মুখের পরে অনেক বড় বড় কথা বলে যায়। বলে– তার কারণে নাকি তাদের মা মারা গেছে। সে নাকি চিকিৎসাও করেনি। এসব কথার কোনো প্রতিবাদ বুনোগাজী করে না। মনে মনে ভাবে, যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর! ক'দিন আগে তাকে একছেলে বলে ফেললো, তুমি মার জন্য দু'টাকা খরচ করে ডাক্তার দেখাওনি। ঔষধ খাওয়াওনি। বলতে টাকা পাবে কোথায়? এখন তোমার বেলায়তো আমাদের টাকার অভাব থাকবে। ছেলেদের কথা শুনে বুনোগাজী খুব কষ্ট পায়। ভারাক্রান্ত হয়ে কেবল নিজেকে চিনতে পারে না। যে বাতাস বয়ে যায় সে বাতাসের ফিরে আসা স্বাভাবিক। ক'দিন আগেও যার দাপটে– সংসার চলতো। সবাই তাকে মান্য করে চলতো

www.icsbook.info

আজ সে একেবারে নিঃস্ব। ভেতর বাহির বলতে বুনো গাজীর এখন আর কিছু নেই। সে ভাবতে থাকে। ভাবছে আর ভাবছে। তার সারা জীবনের অর্জন যেন দমকা হাওয়ায় সব উড়ে গেল। জীবন, যৌবন, সম্পদ, সন্তান আর অহংকার সব কিছু দপ করে নেমে এলো মাটিতে। ধুলার সাথে তা মিশে কেবল একাকার হয়ে গেল। এখন তার নিজস্ব বলতে আছে কেবল হতাশা, অপমান, আর দুঃসহ জীবনের ছায়াচিত্র। যার ভাগীদার একমাত্র সেই।

এসব ভাবতে ভাবতে বুনোগাজী আনমনা হয়ে যায়। বাকহীন অবলা পশুর মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তার মুখে কোনো ভাষা নেই। অর্থ লিপ্সার আগুন নিভে গেছে। এখন সে নিঃসঙ্গতার এক অথৈ সমুদ্রে পাক খেতে থাকে।

হঠাৎ একফালি কালো মেঘ তার মাথার ওপরে স্থির হয়ে যায়। তারপর বৃষ্টি। প্রচণ্ড বৃষ্টি। সেই সাথে ঝড়। সেভাবে এই মেঘ যেন জামেলার ভারাক্রান্ত মনের শোক আর কষ্ট। আর ঝড় কেবল অতীত স্মৃতির পুঞ্জীভূত বেদনা এবং বৃষ্টি এ যেন জামেলার শোকাহত চোখের পানি!

তাহলে মানুষ আপন পেটের জন্য এতো কিছু করে কেন? কেন এত সম্পদ আহরণের বাসনা? সে বুঝতে পারে এই পুঞ্জীভূত সম্পদের মাঝেই কেবল পুঞ্জীভূত ব্যথা, বেদনা আর সকল বঞ্চনা। সে অস্ফুটে বলে– জামেলা, আমাকে ক্ষমা করে দিও। তোমার প্রতি চরম অবিচার করেছি। চেয়ে দেখ, আমার ঘুম ভেঙে গেছে। এখন আর আমি আগের মতো নেই।

এক পা দু'পা করে বুনোগাজী এগিয়ে যায় গোরস্তানের দিকে। যেখানে জামেলা ঘুমিয়ে আছে। নীরবে নিভৃতে। এটুকু আসতে বুনোগাজীর খুব কষ্ট হয়। হাঁফ লেগে যাচ্ছে। তবু এই কথাগুলো জামেলাকে শোনানোর দরকার বলে মনে করে সে।

গোরস্তানের পাশ দিয়ে উঁচু কাঁচা রাস্তা। বুনোগাজী রাস্তায় দাঁড়িয়ে জামেলার কবরের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। হাউ মাউ করে ডুকরে কেঁদে ওঠে। একেবারে শিশুর মতো। জামেলা জামেলা বলে চিৎকার করতে থাকে। প্রায় পাগলের মতো বলতে থাকে– জামেলা, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তার দু'চোখের পানিতে ভিজে যায় মুখমণ্ডল। একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে– আমার ভুল হয়ে গেছে জামেলা। আসলে মানুষের জন্য নিজের বলে যা তা কেবল তোমার মতো সাড়ে তিন হাত জায়গা। মানুষের জন্য এর বেশি আপন কিছু আছে বলে আমি এখন আর বিশ্বাস করি না।

www.icsbook.info

সুরের মূর্ছনা

রফিক মুহাম্মদ

এমন মিষ্টি সুর, এমন মধুর সুর কিসের? কোথা থেকে এ সুর ভেসে আসছে? এর আগেতো কোন দিন কোথাও এমন সুর সে শুনেনি।

রিজোয়ান লেপের নিচ থেকে মুখটা বের করে কান খাড়া করে সুরের উৎস বুঝার চেষ্টা করে। হ্যাঁ..হ্যাঁ...এইতো..এইতো.. মনে হচ্ছে পাশের ঘর থেকে এই মিষ্টি সুর ভেসে আসছে। রিজোয়ান এই সুরে বিভোর হয়ে যায়। বেশ কিছু সময় সে তন্ময় হয়ে তা উপভোগ করে। কি এক মায়াময় মধু মাখা এই সুর। এই সুরের মূর্ছনা হৃদয়-মনে শান্তির পরশ ছড়িয়ে দেয়। এক অন্যরকম ভালোলাগা, অন্যরকম প্রশান্তিতে মন-প্রাণ ভরে যায়। এই শীতের ভোরে এমন মায়াময় সুর রিজোয়ানকে মুগ্ধ করে।

www.icsbook.info

রিজোয়ান এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জ্যাকেটটা গায়ে জড়িয়ে সুরের টানে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

রিজোয়ান বাবা মায়ের সাথে তাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। এর আগে ওর বয়স যখন মাত্র এক বছর ছিল তখন গ্রামে এসেছিল। সেটা সে তার বাবা মায়ের কাছে শুনেছে। এর পর ঢাকায় কেটেছে দুই বছর। এর মধ্যে আর গ্রামে দাদার বাড়িতে যাওয়া হয়নি। পাঁচ বছর বয়সের সময় বাবা-মায়ের সাথে চলে যায় আমেরিকা। রিজোয়ানের বাবা রায়হানুল ইসলাম একজন ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। দুই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর স্কলারশিপ নিয়ে সপরিবারে আমেরিকা চলে যান। সেখানে পাঁচ বছর থেকে গত জানুয়ারিতে দেশে ফিরেছেন। দেশে এসে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করেছেন। আমেরিকা থেকে আসার পর থেকে গ্রামে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে রিজোয়ান। প্রতিদিনই মোবাইল ফোনে দাদাকে বলে আমরা বাড়ি আসছি দাদা ভাইয়া। ফোনে দাদুকে পিঠা বানিয়ে রাখতে বলে। রিজোয়ানরা বাড়ি আসবে এ অপেক্ষাতেতো ওর দাদা-দাদিও পথ চেয়ে বসে আছেন। আমেরিকা থেকে আসার পর রিজোয়ানের দাদা রাশেদ মাস্টার ঢাকায় গিয়েছিলেন। সঙ্গে রিজোয়ানের দাদিও ছিলেন। তবে দু'দিনের বেশি থাকতে পারেননি। রায়হান ঢাকায় রিজোয়ানের বড় খালার বাসায় উঠেছে। আগামী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ার্টার পাবে। তাই এ মাসের বাকি ক'টা দিন রিজোয়ানের খালার বাসায়ই ওরা থাকবে। ছেলে পাঁচ বছর পর বিদেশ থেকে দেশে এসেছে তাই তাকে দেখার জন্য রায়হানের বাবা-মা গ্রাম থেকে ছুটে এসেছেন। তবে শত ইচ্ছা থাকার পরও দু'দিনের বেশি থাকতে পারেননি। ঢাকা শহরে আত্মীয়ের বাসায় এত জন থাকাটা যে সবার জন্য কষ্টের এটা রাশেদ মাস্টার ঠিকই বুঝতে পারেন। তাইতো দু'দিন থেকেই চলে গেছেন। রায়হান বলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে উঠেই সবাইকে নিয়ে বাড়ি যাবে। রিজোয়ানতো দাদা-দাদিকে কিছুতেই যেতে দেবে না। রাশেদ মাস্টার তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে রেখে এসেছেন। রাশেদুল ইসলাম প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। এলাকায় রাশেদ মাস্টার হিসাবে তিনি পরিচিত। এতদিন বিদেশ থাকলেও দাদা-দাদুর সাথে রিজোয়ানের প্রাণের সম্পর্ক। সুদূর আমেরিকা থেকেও প্রতিদিন একবার স্কাইপিতে দাদা-দাদুর সাথে কথা

www.icsbook.info

বলেছে রিজোয়ান। এ জন্য দূরে থেকেও দাদা-দাদুর জন্য রিজোয়ান অনেকটাই পাগল। ঢাকায় আসার পর থেকেই গ্রামে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে রিজোয়ান। প্রায় প্রতিদিনই রায়হানকে বলে, বাবা কবে দাদার বাড়ি যাবো? ছেলের পীড়াপীড়িতে রায়হান কোন রকমে কোয়ার্টারে উঠে পরদিনই গ্রামের বাড়ি চলে যায়।

গ্রামে এসে রিজোয়ানতো আনন্দে আত্মহারা। বাড়ির সামনে বিশাল পুকুর। পুকুরের পর বিশাল খোলা মাঠ। সে মাঠে সবুজ ধানক্ষেত। এখন ফেব্রুয়ারি মাস। পুকুরের পূর্ব পাড়ের শিমুল গাছে টকটকে লাল ফুল ফোটে আছে। রিজোয়ানতো এসেই দাদার হাত ধরে পুকুরপাড়ে চলে গেছে। শিমুল গাছে টকটকে লাল ফুল দেখে সে তো আনন্দে চিৎকার দিয়ে বলে উঠে, ওয়াও! কী সুন্দর লাল ফুল। দাদা ভাইয়া এটা কী ফুল? রাশেদ মাস্টার মুচকি হেসে রিজোয়ানের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, আচ্ছা দাদু ভাই তুমি কী কী ফুলের নাম জান? রিজোয়ান ঝটপট উত্তর দেয়, অনেক ফুলের নাম জানি। এই যেমন গোলাপ, বেলি, জুঁই, রজনীগন্ধ্যা, শাপলা এসব।

: এর মধ্যে কোন কোন ফুল তুমি দেখেছো?

: গোলাপ আর রজনীগন্ধ্যা ফুল দেখেছি। এ ছাড়া বইয়ে আমাদের জাতীয় ফুল শাপলার ছবি দেখেছি। শাপলা ফুলতো পানিতে ফোটে তাই না?

: হ্যাঁ, শাপলা ফুল বর্ষাকালে খালে, বিলে, পুকুরে ফোটে। দাদু ভাই তুমি কি পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া এসব ফুলের নাম জান না? এসব লাল ফুলের কথা শোননি কোনদিন?

: হ্যাঁ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া এসব ফুলে নাম বইয়ে পড়েছি, কিন্তু মনে নেই।

: ও আচ্ছা, শোন দাদু ভাই এটা হলো শিমুল ফুল।

: ওয়াও! কী বিউটিফুল, তাই না?

: হ্যাঁ দাদু ভাই এ ফুলটা দেখতে সুন্দর ঠিকই তবে এ ফুলের কোনো ঘ্রাণ নেই।

: বল কি? অনেকটা অবাক হয় রিজোয়ান। দাদাকে আবার প্রশ্ন করে, এত সুন্দর ফুলের গন্ধ নেই কেন?

: সেটা কি করে বলবো দাদু ভাই। এটাতো আল্লাতালার সৃষ্টির অপার রহস্য।

www.icsbook.info

রিজোয়ান অবাক হয়ে শিমুল গাছের দিকে তাকায়। গাছের প্রতিটি ডালে থোকা থোকা লাল ফুল ফুটে আছে। গাছে অনেক পাখি কিচির মিচির করছে। এ ফুল থেকে ও ফুলে উড়ে যাচ্ছে। রিজোয়ান মুগ্ধ হয়ে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখে। কিছুক্ষণ দেখার পর বলে, দাদাভাই তুমি একটু দাঁড়াও আমি আব্বুর মোবাইলটা নিয়ে আসি। এমন সুন্দর দৃশ্যের অবশ্যই ছবি তুলতে হবে। রিজোয়ান পুকুরপাড় থেকে দৌড়ে বাড়ি গিয়ে বাবার মোবাইল ফোন নিয়ে আসে। এরপর শিমুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে, ভিডিও করে।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়। শীতকাল শেষ হয়ে বসন্ত ঋতু শুরু হলেও গ্রামে এখনো বেশ শীত। মাঘের শীতের রেশ এখনো রয়েছে। বিকাল হলেই চারদিক কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে রিজোয়ান সামনের খোলা মাঠের দিকে তাকায়। দৃষ্টিসীমায় শুধু সবুজ আর সবুজ। রিজোয়ান মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মাঠের প্রান্তে ধোঁয়ার মতো কুয়াশা ঝরে পড়ার দৃশ্য কী মনোমুগ্ধকর। রিজোয়ান মনের আনন্দে মোবাইলে এসব দৃশ্যধারণ করে।

নাতির এমন আনন্দ দেখে রাশেদ মাস্টারের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। বাম হাতে রিজোয়ানের হাত ধরে বলেন, চলো দাদুভাই আমরা ওই মাঠে যাই। সবুজ ধানক্ষেতের আল ধরে হাঁটলে আরো ভালো লাগবে। দাদার কথায় রিজোয়ান আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। চল দাদাভাইয়া, চল।

রাতে খাওয়া-ধাওয়া শেষে রিজোয়ান বলে সে দাদাভাইয়ার সাথে ঘুমাবে। দাদাভাইয়া অনেক গল্প জানে। রাতে শুয়ে শুয়ে সে দুঃখী রাজকন্যার গল্প শুনবে। তাইতো বাবা-মায়ের বারণ করার পরও দাদার সাথেই ঘুমাতে গেল। বিছানায় শুয়েই রিজোয়ান বায়না ধরে, দাদাভাইয়া দুঃখী রাজকন্যার গল্পটা বলো।

রিজোয়ানের কথায় রাশেদ মাস্টারতো অবাক! একি বলছো দাদু ভাই, আমিতো কোন দুঃখী রাজকন্যার গল্প জানি না।

: না তুমি জানো। তোমাকে বলতেই হবে।

: ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলছি। এক ছিল রাজা। তার ছিল দুই রানী। ছোট রানী ও বড় রানী। দুই রানীকে নিয়ে রাজার দিন খুব সুখেই কাটছিল। রাজ্যজুড়ে প্রজারাও ছিল খুব সুখে। কোথাও কোনো অভাব ছিল না। সারা রাজ্যে কারো কোন দুঃখ ছিল না। বুঝেছ? রিজোয়ানের কোন জবাব নেই।

www.icsbook.info

রাশেদ মাস্টর বুঝতে পারেন যে রিজোয়ান ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে মনে একটু হেসে তিনি নিজেও পাশ ফিরে শুয়ে পড়েন।

খুব সকালে রিজোয়ানের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই একটা মিষ্টি মধুর সুর ওর কানে ভেসে আসে। লেপের নিচে মুখ রেখে প্রথমে সুরটা শুনে। কী মিষ্টি সুর। রিজোয়ান যত শুনছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু এটা কিসের সুর? কোথা থেকে এ সুর ভেসে আসছে? সুরের মূর্ছনায় ওর হৃদয় মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। রিজোয়ান লেপের নিচ থেকে মুখটা বের করে এবার গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। বুঝতে চেষ্টা করে কোথা থেকে এমন সুর ভেসে আসছে। হ্যাঁ...এবার কিছুটা অনুমান করতে পারে। মনে হচ্ছে পাশের ঘর থেকে এই মিষ্টি সুর ভেসে আসছে। রিজোয়ান এবার লেপের নিচ থেকে বেরিয়ে আসে। খাট থেকে নেমে জ্যাকেটটা গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঘরের বাইরে এসে তো রিজোয়ান অবাক হয়। একি চারদিক ঘন কুয়াশায় ছেয়ে আছে। ধোঁয়ার মত কুয়াশা উড়ছে। সামান্য দূরের জিনিসও কুয়াশার জন্য দেখা যাচ্ছে না। আমেরিকায় সে তুষারপাতের দৃশ্য দেখেছে। তবে এ দৃশ্য তার চেয়ে অন্যরকম, তার চেয়ে অনেক সুন্দর। ঘন কুয়াশার এই অপূর্ব সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে মোহময় সুরের টানে রিজোয়ান এগিয়ে যায়। হ্যাঁ এইতো ওই ঘর থেকেইতো সুরটা ভেসে আসছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো রিজোয়ান এগিয়ে যায়। ঘরের দরজা খোলা। হ্যাঁ.. এইতো ...এইতো সেই সুরের উৎস। রিজোয়ান দেখে ওর মতো বয়সের একটি ছেলে সুর করে একটি বই পড়ছে। পাশেই ওর দাদা বসে আছেন। তিনিও দু'চোখ বন্ধ করে তন্ময় হয়ে এ সুর উপভোগ করছেন। দাদাকে দেখে রিজোয়ান সাহস করে ঘরের ভেতর ঢুকে। ছোট্ট ছেলেটি সুর করে পড়ছে..আর-রহমান। আল্লামাল কুরআন। খালাক্বাল ইনসানা আল্লামাহুল বাইয়ান....। সুরের মোহময় মূর্ছনা রিজোয়ানের হৃদয় মনকে জুড়িয়ে দেয়। রিজোয়ান এবার ওর দাদার পাশে বসে পড়ে। রাশেদ মাস্টার এবার চোখ খুলে তাকিয়ে পাশে রিজোয়ানকে দেখে বলেন, একি দাদু ভাই এত সকালে তোমার ঘুম ভেঙে গেছে?

: হ্যাঁ দাদাভাইয়া। এমন মিষ্টি সুর শুনে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। এটা কি বই এমন সুন্দর মিষ্টি সুর করে পড়ছে?

: রিজোয়ানের প্রশ্ন শুনে লজ্জায় রাশেদ মাস্টারের মাথা নিচু হয়ে যায়। মুসলমানের ছেলে অথচ কোরআন শরিফ চেনে না। ইংরেজি-বাংলা পড়ার জন্য কত প্রতিযোগিতা। এ জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করছে, অথচ যে

www.icsbook.info

শিক্ষা মুসলমানদের জন্য আসল সে শিক্ষাই দেয়া হচ্ছে না। রাশেদ মাস্টার এবার রিজোয়ানকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, এটা হলো আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন। তুমি কি এর আগে কখনো কোরআন শরিফের কথা শুননি?

: হ্যাঁ আব্বু-আম্মু বলেছেন। তবে ওখানেতো কোরআন শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না।

: ওহ আচ্ছ। তুমি কি কোরআন শিখতে চাও?

: হ্যাঁ দাদাভাই। কী সুন্দর, কী মোহময় এই সুর। ওই যে পড়ছিল.. আর-রহমান, আল্লামাল কোরআন...।

: বাহ! একটু শুনেই তা মনে রেখেছো? এর অর্থ যদি জান, তাহলে আরও ভালো লাগবে। যেমন... আর-রহমান মানে হলো করুণাময় বা দয়াময় আল্লাহ। আল্লামাল কোরআন অর্থাৎ শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন।

: দাদাভাই আমিও কি ওর মতো সুন্দর সুর করে পড়তে পারবো?

: হ্যাঁ হ্যাঁ.. অবশ্যই পারবে। কাল থেকে তুমি এখানে কোরআন শরিফ শিখবে এবং সুন্দর করে তা পড়বে।

রিজোয়ানের হৃদয়-মন আনন্দে নেচে ওঠে। বাইরে তখন কুয়াশার চাদর ভেদ করে টকটকে লাল সূর্যটা উঁকি দিচ্ছে। পূর্বদিকের জানালা দিয়ে সূর্যের আলোক রশ্মি এ ঘরেও এসে প্রবেশ করছে।

www.icsbook.info

জলপ্রপাতের জীবন্তিকা

শাহনাজ পারভীন

সময়টা গড়িয়ে যায় নদীর স্রোতের মত বাঁধভাঙা জোয়ারের সাথে তাল মিলিয়ে। সূর্য উদয়-অস্ত কেমন বয়ে যায় সমতল মাঠের হাওয়ার সাথে, লু-হাওয়ার উষ্ণ পরশে। হিজল, তমাল, বকুল, ছাতিমের গন্ধ ছাপিয়ে। ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টাতে গেলে দিন মাস বছর দশক ঝরে ঝরে পড়ে অথচ শিলু দিব্য দৃষ্টিতে দেখে এই তো সেদিন। মনে হয় যেন এই মাত্রই ঘটে গেল চোখের সামনে। চোখের পাপড়িরা এখনো পলক ফেলেনি। অথচ সেই উনসত্তরের এক আটাশ রোজার বিশেষ বিকেলের ঘটনা, প্রায়ই মনের আয়নায় ছায়া ফেলে নিজের। সে ছায়ায় আবছা হয় বর্তমানের দিনলিপি, আনন্দ, চেতনা, বিশ্বাস।

www.icsbook.info

মিলুর বয়স তখন কত? ও তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। এই রোজার ঈদে বায়না ধরেছে সবার মত সেও হাত রাঙাবে মেহেদিতে। ঘরে ঘরে ধুম পড়েছে মেহেদি বাটার। ফুল, লতা– পাতা, বিভিন্ন চিত্রসহ নিজের নাম এঁকে এঁকে হাতে দেয়ার। তখন তো এখনের মত টিউব মেহেদির প্রচলন ছিল না। কত দূর-দূরান্ত থেকে মেহেদি পাতা সংগ্রহ করা হতো। কিশোর-কিশোরী বয়স্কা নির্বিশেষে শবেকদরের পরদিন মেহেদি হাতে দেবেই দেবে। ঐ দিনটা যেন মেহেদি দেয়ার বিশেষ বার্ষিক অনুষ্ঠানের দিন। ধারণা করা হতো যদি শবেকদরের দিনে দেয়া মেহেদি হজের দিন পর্যন্ত কারো হাতে থাকে, তাহলে অশেষ সওয়াবের ভাগীদার হওয়া যায়। যেমন ধারণা করা হয় কোরবানির গোশত মুহররমের ১০ তারিখে যদি খাওয়া যায় তাহলেও সওয়াব হয়। শিলু অবশ্য এসবের ধর্মীয় ব্যাখ্যা জানে না। তবে ছোট ভাই বোন বিশেষ করে মিলুর আকাঙ্ক্ষায় ও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে সে আশপাশের অনেক বাড়িতে গিয়েছে, কিন্তু মেহেদি পাতা জোগাড় করতে পারেনি। এ পাড়ায় যে ক'টা গাছ আছে তা আগেই পাতাশূন্য হয়ে শুধু ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও কি বড় গাছের মগডাল থেকে পাতা ছিঁড়তে পারে? হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। বাড়ি ফিরেই মিলু, নিলু, মলি, প্লাবনের কান্না থামাতে ব্যস্ত। ও কিভাবে থামাবে এতগুলো মাতৃহীন শিশুর কান্না?

গত বছর মায়ের মৃত্যুতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া শিলুর ওপর ছোট ভাই বোনদের সব দায়িত্ব। ওদের পাড়ার সব মায়েরা কিভাবে রোজার দিনের অলস সারা দুপুর পাটা পেতে পেতে মেহেদি বাটছেন। তাদের মেয়েদের হাতে ফুল এঁকে এঁকে মেহেদি দিচ্ছেন। ওরই বয়সী রিজু, বিউটি, কাকলী, সোমা কি আনন্দে তাদের মায়েদের কাছে আবদার করছে মেহেদি বেঁটে দাও। হাতে ফুল করে দাও। ওর চোখ ছল ছল করে ওঠে। বারবার দুধের সরের মত মায়ের স্মৃতি ওর চোখের ওপর ভেসে বেড়ায়। মাখনের মত গভীর মমতায় জড়িয়ে থাকে ওর দু'চোখে। অনেক বোঝাতে চেষ্টা করে শিলু–

– কেঁদো না আপু, কেঁদো না ভাইয়া। আব্বু আসুক। আব্বুকে বলব রহিম চাচার বাড়ি থেকে আমাদের জন্য মেহেদি আনতে। তখন সবাই মিলে হাতে দেবো।

কিছুতেই কিছু হয় না। ও অন্যদের কী বোঝাবে? বেণি দুলিয়ে পিঁড়িতে

www.icsbook.info

বসে ও নিজেই কখন যেন বিউটি হয়ে যায়। ওর হাতে মেহেদি দিতে থাকে ওর মা। ওর নাকে ভুরভুর করে ওর মায়ের আঁচলের সুবাস। ছুঁয়ে দেখতে চায় মায়ের হাত, আঙুল, কপোল, সমস্ত অবয়বের সাহচর্য। ও পরম স্নেহে অফুরন্ত আনন্দের সে দৃশ্য চলচ্চিত্রের মত উপভোগ করতে থাকে। ওর কাঁধ নেড়ে যখন নিলু ডাকে-

– আপা ভাত দাও। ক্ষিধে লেগেছে আমার। আপা খাবার দাও।

বাস্তবে পা রেখে মনটা খারাপ হয়ে যায়। কী সুন্দর কল্পনা, কী সুন্দর স্বপ্নটা ভেঙে দিলো নিলু। ইস্ যদি অনন্তকাল দেখতে পারত এই স্বপ্নটা, ইস্ যদি এ স্বপ্নটা কখনোই আর শেষ না হতো? হাত ধরে এক পাশে সরিয়ে রাখে সে নিলুকে।

– আমি কোথায় পাবো ভাত? নিজেই তো নড়তে পারছি না।

নিলুর মুখে ভাত শব্দটা শুনে ওর পেটে ঝিমানো ক্ষুধা ভাবটা পাক মেরে ওঠে। মনে করতে পারে না কখন ও ভাত খেয়েছে। আস্তে আস্তে সূর্য উদয়ের মতো আলোকিত হয়।

গতকাল বাজার এসেছিল রাত করে। যে মা ঘরে আছেন তিনি একাই রান্না করেছিলেন। শিলুকে হাত লাগাতে হয়নি। নিলুকে ঘুম পাড়াতে যেয়ে ক্ষুধার্ত দেহটা নিয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝরাতে আব্বুর ডাকে ঘুম ভাঙে।

ঘুম ঘুম চোখে শক্ত ভাত, ডাল, আলু ভর্তা খেয়েছিল। সেহেরি খেয়েছিল, না খায়নি তা আর মনে করতে পারে না শিলু।

প্লাবন দৌড়ে আসে। দৌড়ে আসে আসে মলিও।

–আপা, রিজু আপাদের ঈদের নতুন জামা এনেছে। আমাদের আনবে না? আমাদের জামা আনো, জুতা আনো, টুপি আনো।

–ফিতা আনো, চুড়ি আনো। আব্বু এখনো আসছে না কেন?

বিষন্ন দেহে ওরা যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে আকাশ কাঁপিয়ে মায়ের চিৎকার শোনা যায়।

–কী করে এদের দায়িত্ব পালন করব আমি?জিনিসপত্র রাখলেই থাকে না। এই মিলু খেয়েছিস, বাটিতে মিষ্টি ছিল?

-আমি খাইনি।

– ফের মিথ্যে কথা?

- আমি খাইনি।

www.icsbook.info

বলেই চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে মিলু। মিলুকে নিশ্চুপ দেখে মায়ের রাগ দ্বিগুণ হয়। রেগে গিয়ে মা মিলুর কান ধরে টানতে গেলে মিলুও রাগে সটান সরে দাঁড়ায়।

–বলছি তো আমি খাইনি। দেখিউনি কোথায় মিষ্টি ছিল।

মায়ের রাগ চতুর্গুণ হয়। ছড়িয়ে যায় বাড়ির অলিতে গলিতে।

রাগের লাটাই ধরতে ব্যর্থ শিলু মিলুকে দেয় কয়েক চড় থাপ্পড়। তারপর বড় অসহায় হয়ে নিজেই কাঁদতে থাকে গুমড়ে গুমড়ে। কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করার পর অদূরে আঙিনায় বসে থাকা মিলু নিলু মলিকে বুকে জড়িয়ে শ্রাবণের বারিধারায় অন্তর ভিজে যায়।

এভাবে কতক্ষণ বিশ্ব চরাচর তার গতি থামিয়েছিল শিলু এখন আর তা মনে করতে পারে না। তবে অদূরে দাঁড়ানো নতুন ব্যাগভর্তি জামা, জুতা, স্যান্ডেল, ফিতা হাতে আব্বুর চকমকে কণ্ঠস্বর শিলুকে ভাসিয়ে নিয়েছিল নায়াগ্রা জলপ্রপাতের গতির থেকেও দ্রুত গতিতে, দ্রুত লয়ে।

www.icsbook.info

শীত উপহার

জুবায়ের হুসাইন

মুনিয়ার চঞ্চলতা যেনো আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সারাক্ষণ কেবল ভাইয়াকে জ্বালাতন করে। 'ভাইয়া, এটা কী? ওটা কেনো হলো ভাইয়া? সেটা না হলে কী হতো?' জবাব দিলে ভালো, আর না দিতে পারলে ভাইয়াকে তাচ্ছিল্য করে বলবে, 'দূর! তুমি কিছুই জানো না ভাইয়া। এতো গবেট হলে কীভাবে বলো তো?'

মুরাদ নানাভাবে মুনিয়াকে বোঝাতে চেষ্টা করে। বলে, 'এটা আমি কেন, কেউই বলতে পারবে না। এটা আসলেই এমন।'

কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হবে না। একবার যেটা বলবে, সেটাতেই

www.icsbook.info

অটল মুনিয়া।

এই তো, আজ রাতের ঘটনাটাই ধরা যাক।

মুরাদ পড়াশুনায় মগ্ন। পাশের চেয়ারে বসে পড়ছিল মুনিয়া। হঠাৎ ডাকল, 'এই ভাইয়া?'

মুরাদ বলল, 'কিছু বলবে?'

'বলব বলেই তো ডাকছি। তুমি তো খেয়ালই করছো না।'

'আচ্ছা বলো।'

'বইকে মানুষ বই বলে কেনো ভাইয়া?'

মুরাদ পড়ে যায় মহা বেকায়দায়। এ কেমন প্রশ্ন হলো? কী জবাব দেবে এর ও?বলল, 'মানে, ইয়ে...'

'বুঝেছি, তুমি পারবে না বলতে। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার বলো তো ভাত কেনো ভাত হলো?' মুনিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে খুবই ভাবনায় পড়ে গেছে ও বিষয়গুলো নিয়ে। ভাত কেনো ভাত হলো এই বিষয়টা জানার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

মুরাদ একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। না, পিচ্চিটা আজ শান্তিতে পড়তে দেবে না। ইশ্, আম্মু যদি খেতে ডাকতেন! বলল, 'শোনো মুনিয়া, এমন কিছু জিনিস থাকে যেগুলোর কোনো উত্তরই হয় না। ভাত কেনো ভাত হলো– এটাও তেমনি একটা বিষয়। বুঝেছো? এখন মন দিয়ে পড়ো।'

মুনিয়া মুখ ভেংচে বলল, 'কিছুই তো বুঝলাম না! তার মানে বলো তুমি জানো না।'

'আচ্ছা বাবা বললাম আমি জানি না। এখন হলো তো?'

'হুঁহ্!' শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো মুনিয়া। তারপর চুপ হয়ে গেল।

কিন্তু মুরাদ জানে এই চুপ থাকা বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। একটু পরেই আরেকটা প্রশ্ন করে বসবে মুনিয়া। তাই মনে মনে প্রস্তুত হয়েই রইল। এরূপ ব্যাপার তো নিত্যদিনকার।

তাই-ই হলো। একটু পরেই মুনিয়া আবার বলে উঠলো, 'এই ভাইয়া, শোনো শোনো, একটা দারুণ কথা মনে পড়েছে।' মুনিয়াকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে।

মুরাদও অবাক। কী মনে পড়েছে ওর? আচ্ছা শোনাই যাক আগে। বলল, 'বলো কী মনে পড়েছে তোমার।'

'তুমি রাগ করেছো ভাইয়া, তাই না?'

www.icsbook.info

'না আপুমণি, আমি রাগ করিনি। আমি আমার ছোট্ট আপুমণির উপর কিছুতেই রাগ করতে পারি না।'

'সত্যিই তুমি রাগ করোনি?' মুনিয়ার যেনো বিশ্বাস হচ্ছে না।

'হ্যাঁ, সত্যিই আমি তোমার উপর রাগ করিনি।' সত্যি কথাই বলল মুরাদ।

হেসে ফেলল মুনিয়া। বলল, 'এই জন্যেই তো তুমি আমার ভাইয়া। মিষ্টি ভাইয়া! জানো ভাইয়া, আমি টীনাদের সবাইকে বলে দিয়েছি আমার ভাইয়া ওদের সবার ভাইয়াদের থেকে ভালো। অনেক ভালো। ঠিক বলেছি না ভাইয়া?'

'হ্যাঁ মুনিয়া আপুমণি, তুমি ঠিকই বলেছ।'

মুনিয়ার কথায় মুরাদ খুশি হয়ে উঠলো। আসলে ওরা দু'জন দু'জনকে খুব বেশি ভালোবাসে। তাইতো খুনসুটি লেগেই থাকে। অবশ্য দু'জনেই বিষয়টা বেশ উপভোগও করে থাকে।

মুরাদ বলল, 'এখন তোমার দারুণ কথাটা বলে ফেলো আপুমণি।'

মুনিয়া বলল, 'বলব তো! তুমি কথাটা শুনে আবার মাইন্ড করবে নাতো?'

'এ মা! আপুমণি দেখি আবার মাইন্ড কাকে বলে তাও জেনে গেছে! না মুনিয়া আপুমণি, আমি মাইন্ড করবো না। এখন বলো।'

'ইয়ে, মানে ভাইয়া...'

'হ্যাঁ, কী?'

'ইয়ে মানে.. আজ না আমি টীনার সাথে ঝগড়া করেছি।'

'কেনো? ঝগড়া করেছো কেনো?'

'বারে! ও আমাকে অপমান করবে আর আমি ওকে ছেড়ে দেব?' গাল ফুলিয়ে ফেলল মুনিয়া।

মুরাদও অবাক। টীনা মুনিয়াকে অপমান করেছে? আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পেল শোনার। বলল, 'টীনা তোমাকে অপমান করেছে? কী বলেছে ও তোমাকে?'

'ও বলেছে আমি নাকি হনুমানের ছোট বোন। আমার নাকটা দেখতে একেবারে পেত্নীর মতো।' এক্ষণে মুনিয়ার মুখ দেখে মনে হবে ও টীনাকে সামনে পেলে চুল ছেড়াছিড়ি শুরু করে দেবে। চেহারায় স্পষ্ট অসন্তুষ্টি ও রাগের ছাপ।

'তাই বলেছে ও তোমাকে?' মুরাদ সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করল।

www.icsbook.info

মুনিয়া প্রবলভাবে উপর-নীচ মাথা নাড়ে।

মুরাদ সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে, আমি কাল ওকে আচ্ছা করে বকে দেব।'

'..না ভাইয়া, ও আরো কী বলেছে শোনো আগে। ও বলেছে, আমি নাকি ঝগড়াটে। কেবল ঝগড়া বাধানোর তালে থাকি। বল ভাইয়া, ও কি ঠিক বলেছে? আমি কি শুধু ঝগড়া বাধাই?আমি কি হনুমানের ছোট বোন?আর আমার নাক? এটা কি পেত্নীর মতো?' হাত দিয়ে নিজের নাক দেখাল। কেঁদে দেবে বুঝি মুনিয়া। অভিমানে ফুলে ফুলে উঠছে ঠোঁট দু'টো। সেই সাথে ফুলে উঠছে গাল দু'টোও।

মুরাদ বুঝল ভাব খারাপ। টীনা তাহলে ভালোভাবেই ক্ষেপিয়ে তুলেছে মুনিয়াকে। বলল, 'ও ঠিক বলেনি আপুমণি। তোমার মতো ভালো মেয়ে এই অঞ্চলে আর আছে নাকি? ও জানে না তাই বলেছে এসব। তুমিও ওকে বলতে পারতে যে, ও তো রাজকন্যার মতো দেখতে। ওর চোখটা খুব সুন্দর। আর ওর কণ্ঠ? সে তো কোকিলের কণ্ঠকেও হার মানাবে! কী সুন্দর ওর চুলের বেনীটা!'

এই কথায় মুনিয়া যারপরনাই অবাক হলো। দু'সেকেন্ড কোনো কথাই বলতে পারল না। শেষে বলল, 'ও আমাকে অপমান করবে আর আমি ওকে ভালো ভালো কথা বলব? তা কী করে হয়?'

'এটাই করতে হয় মুনিয়া। তুমি যদি এগুলো বলতে, তাহলে দেখতে ও তোমাকে 'নাইস' মেয়ে বলত। তোমার সাথে আর ঝগড়া বাধানোর তালে না থেকে তোমার সাথে হেসে হেসে কথা বলত। তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয়ে যেতো। সবসময় তোমার পক্ষ নিয়ে কথা বলত।'

'তুমি সত্যি বলছ ভাইয়া?'

'হ্যাঁ, আমি সত্যি বলছি। আমি কি আমার প্রিয় বোনটিকে মিথ্যে বলতে পারি?'

'তার মানে কেউ আমাকে পেত্নী বলল, তারপরও আমি তাকে ভালো বলব? বকব না? তার সাথে ঝগড়াও করব না?'

'হ্যাঁ, তাকে ভালো বলবে, বকবে না এবং তার সাথে ঝগড়াও করবে না।'

'তুমি আমার সাথে জোক করছ, তাই না ভাইয়া?

হেসে ফেলল মুরাদ, 'না, আপুমণি, আমি তোমার সাথে জোক করছি

www.icsbook.info

না। যা সত্যি তাই বলছি। এটাই নিয়ম। আমাদের প্রিয় নবীও তাই বলে গেছেন।'

'আমাদের নবী এই কথা বলে গেছেন?'

'হ্যাঁ, তিনি আরো অনেক ভালো ভালো কথা বলে গেছেন। জানো, তিনি ছোটদের অনেক বেশি ভালোবাসতেন। ছোট-বড় সবাইকে সবার আগে সালাম দিতেন।'

'বলো না ভাইয়া তিনি আর কী কী বলে গেছেন?'

'অন্য একদিন বলব সেসব। এখন শোনো, কালই তুমি টীনার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে। বলবে, তোমার ভুল হয়ে গেছে। আর কখনও তার সাথে ঝগড়া করবে না। কি, পারবে না বলতে?'

মুনিয়া মুখে কিছু না বলে মুখ নিচু করে রেখে উপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল। অর্থাৎ পারবে।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। নীরবতা ভাঙলো মুনিয়াই। বলল, 'ভাইয়া, এখন তো শীতকাল। আমার তো তিনটা সোয়েটার আছে। আব্বু বলেছেন এবার আরো একটা কিনে দেবেন। কিন্তু জানো ভাইয়া, গত শীতে না নাদিয়ার কোনো শীতের পোশাক ছিল না। সারা শীতকালটা ও খুব কষ্টে কাটিয়েছে। ওর মনটাও তাই খুব খারাপ ছিল। এবারও বোধহয় কোনো শীতের পোশাক নেই ওর। বিকেলে খেলতেও আসেনি আমাদের সাথে।'

মুরাদ একটু অবাক হলো। বুঝতে পারল না মুনিয়ার হঠাৎ এই কথার কারণ। বলল, 'সেটা তো খুবই খারাপ কথা!'

'ভাইয়া, একটা কথা বললে তুমি রাগ করবে না তো?' বেশ ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করল মুনিয়া।

'আমি কি আমার আপুমণির উপর কখনও রাগ করতে পারি?নির্ভয়ে বলতে পারো তোমার কথা।'

'আমি না ঠিক করেছি এবার একসেট শীতের পোশাক নাদিয়াকে দিয়ে দেব।' একদমেই হরহর করে কথাটা বলে ফেলল মুনিয়া।

কিছুক্ষণ থমকালো মুরাদ। আনন্দে ওর বুকের মধ্যে কুলুকুলু ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। ও অবশ্য আন্দাজ করেছিল মুনিয়া এমনই কিছু একটা বলবে। শেষে বলল, 'এটা তো খুবই ভালো কথা। তুমি তোমার বন্ধুকে সহযোগিতা করবে, এটা অনেক সওয়াবের কাজও।'

'কিন্তু ভাইয়া, আব্বু-আম্মু যদি ...'

www.icsbook.info

'আরে না, আমাদের আব্বু-আম্মু সে রকম না। তারা কিছুই বলবেন না।'

'আচ্ছা ভাইয়া, নাদিয়াদের দুঃখ কি কোনোদিন শেষ হবে না?'

প্রশ্নটা বেশ কঠিন মনে হলো মুরাদের কাছে। কী জবাব দেবে এর? কিন্তু কিছু তো একটা বলতে হবে। নইলে মুনিয়ার মনে এই নিয়ে একটা চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি হবে। ক্রমে সেটা প্রসারিত হতে থাকবে। আর মুরাদ তো তার আদরের বোনটিকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে চায়। কোনো প্রকার নেতিবাচক প্রভাব তার মনে পড়তে দিতে চায় না। এসব ভেবে শেষে বলল, 'অবশ্যই শেষে হবে। তুমি আল্লাহর কাছে ওদের জন্য দোয়া করো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ ভাইয়া, আমি ওদের জন্য দোয়া করব। প্রাণ খুলে দোয়া করব। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমার দোয়া শুনবেন। আম্মু বলেছেন মন দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তা অবশ্যই দেন।'

'বাহ্ আপুমণি, তুমি তো অনেক কিছু জেনে গেছ দেখছি।'

'দূর! তোমার চেয়ে বেশি আমি জানি নাকি? তুমি কত সুন্দর সুন্দর কথা বলো। আমি তো তোমার কাছ থেকেই শেখার চেষ্টা করছি।'

'আমার মিষ্টি আপুমণি!'

'কিন্তু...' কথা থেমে যায় মুনিয়ার। তাকিয়ে থাকে দরোজার দিকে।

মুনিয়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল মুরাদও। আব্বু ও আম্মু কখন এসে দাঁড়িয়েছেন তা ওরা কেউই খেয়াল করেনি। বলল, 'আব্বু-আম্মু, তোমরা...?'

আব্বু বললেন, মুচকি হেসে, 'তোমাদের সব কথাই আমরা শুনেছি।'

মুরাদ বলল ভয়ে ভয়ে, 'আমরা আসলে আব্বু...'

'থাক, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমরা কিছু মনে করিনি। তোমরা ভালো বিষয় নিয়েই কথা বলছিলে। সেজন্য ধন্যবাদ তোমাদের। তবে...'

মুনিয়া আব্বুর কথার মধ্যে বলে উঠলো, 'আসলে আব্বু, আমিই ভাইয়াকে...'

আব্বুও তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'তোমাদের আলোচনার বিষয়টা ভালো। তবে পড়ার সময় এসব বিষয়ে আলোচনা না করাই ভালো। অন্য সময়, বিশেষ করে অবসর সময়ে আলোচনা করাই শ্রেয়। তারপরেও আমরা কিছু মনে করিনি।' সমর্থনের আশায় স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

www.icsbook.info

তিনিও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা কিছু মনে করিনি। এখন এসো তো, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ভুনা খিচুরি আর ইলিশ ভাজা আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভালো লাগবে না।'

ভুনা খিচুরি মুরাদ ও মুনিয়া দু'জনেরই প্রিয়। তাই খলবল করে দু'জনেই প্রায় একসাথে বলে উঠল, 'ভুনা খিচুরি! ইলিশ ভাজা! চলো চলো।'

আব্বু-আম্মুর পাশ ঘেষে বেরিয়ে গেল দু'ভাই-বোন।

মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে তাদের পিছু নিলেন আব্বু-আম্মুও।

ঠিক সেই মুহূর্তে আরশের দিকে উড়ে যেতে লাগল দু'টি সাদা পায়রা। খুশির বার্তাটা আরশের মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যস্ততা তাদের মধ্যে স্পষ্ট। খুশির একটা আভা যেন চারদিকে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল।

এই প্রচণ্ড শীতের রাতেও মনটা ভীষণ হালকা অনুভূত হতে লাগল মুনিয়া ও মুরাদের আব্বু-আম্মুর। ছেলেমেয়ে দু'টোকে তাদের মনে হলো এই শীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য সেরা উপহার।

www.icsbook.info

দাগ

মুহাম্মাদ দারিন

'এই নিয়ে দশশিশু এই একই সমস্যার জন্য এলো।'

'বলেন কী ডাক্তার সাহেব!'

'হ্যাঁ। আগের নয় জনেরও মুখে এমন দাগ ছিলো। কারো ছিলো চোয়ালে, কারো কপালে, কারো থুতনিতে, কারো নাকের 'পরে। তবে কারোরই ব্যথা ছিলো না। আপনাদের মতো ঐ নয় শিশুর অভিভাবকদেরও অভিযোগ তাদের সন্তানদের কোনো আঘাত লাগেনি। অথচ দাগটা আঘাত লাগলে যেমন হয় তেমনি কালচে দাগ।'

ছেলেটির নাম আম্মার খান। বয়স পাঁচ বছর। ও নার্সারীতে পড়ে। বয়সের তুলনায় একটু বেশি পাকা। জানার আগ্রহ প্রচণ্ড। যে কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ জাগলে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে ছাড়ে ওর সামনে যাকে পায়

www.icsbook.info

তাকে। কার্টুন দেখার পোকা ও। প্রতিদিনের মতো আজও আম্মার স্কুল থেকে ফিরে গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করে খাটে শুয়ে শুয়ে টিভিতে কার্টুন দেখছিলো।

দুপুরে আব্বু বাড়িতে এসে আম্মারকে কার্টুন দেখা অবস্থায় পায়। ওকে খাট থেকে উঠাতে চাইলে ও কান্না জুড়ে দেয়। সুতরাং ওকে আর ঘাটান না। ওর মুখে ডান চোয়ালে কিসের যেন দাগ দেখে ডান হাত দিয়ে ডলা মারেন। দাগ ওঠে না। গত কাল তিনি জাম কিনে এনেছিলেন। হয়তো জাম খেতে যেয়ে জামের দাগ লেগেছে ভেবে তিনি আর কিছু না করে খাওয়া-দাওয়া করে বাজারে চলে জান।

আম্মু হাতের সব কাজ শেষ করে আম্মারকে ঘুমাতে ডাকেন। কার্টুনপ্রিয় জেদি ছেলে কার্টুন থেকে উঠতে চায় না। আম্মু এসে ওকে জোর করে কোলে নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন। ওর ডান চোয়ালে গোল হয়ে কালচে দাগ পড়ে আছে। মনে হয় কেউ যেন ওকে মেরেছে।

আম্মু তাড়াতাড়ি বলেন, 'কিরে কে তোকে মারলো?'

'আম্মু কেউ মারেনি।'

'তাহলে কি পড়ে গেছিস?'

'কই না তো।'

'কেউ না মারলে মুখে দাগ হলো কি করে?' বলে আম্মু ওর দাগওয়ালা জায়গায় আলতো করে হাত বুলান যাতে ওর ব্যথা না লাগে।

আম্মার ব্যথায় কোনো আঁউ-উ-উ করছে না দেখে আম্মু আস্তে আস্তে চাপ বাড়ান দাগওয়ালা জায়গায়। দাগও ওঠে না এবং আম্মার কোনো প্রতিক্রিয়া করছে না দেখে আম্মু ভড়কে যান। সাথে সাথে ফোন করেন ওর আব্বুর কাছে।

আব্বু বলেন, 'আমিওতো দেখে এলাম দাগ। আমি ভাবলাম জামের দাগ বুঝি।'

তারপর ছুটে আসেন শহরের সবচেয়ে বড় শিশু ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার কোনো টেস্ট দেন না। কেননা পূর্বের রোগীদের টেস্ট করে কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। অগত্য কিছু ওষুধ প্রেসক্রিপশন করে বলেন, 'দেখেন ঔষধগুলো খাওয়ালে কী হয়।'

'তারমানে রোগ আপনি ধরতে পারেন নি।' বলেন আম্মারের আম্মু।

'দেখুন আমি আগেই বলেছি ইতিপূর্বে নয়শিশুর অভিভাবক একই কেস

www.icsbook.info

নিয়ে এসেছিলো। সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিছুই পাওয়া যায়নি। আপনার শিশুসহ সকল শিশুই পুরোপুরি সুস্থ। তবে দাগের কারণ বুঝতে পারছিনে। মেডিক্যাল সায়েন্সে এর কোনো অস্তিত্ব নেই।' বললেন শিশু বিশেষজ্ঞ।

শিশু বিশেষজ্ঞের কথায় কান না দিয়ে আম্মারের আম্মু ওকে নিয়ে গেলেন শহরের বড় চর্ম বিশেষজ্ঞের কাছে।

তার ভাষ্যও শিশু বিশেষজ্ঞের মত। অগত্যা আম্মারের আব্বু-আম্মু ওকে নিয়ে বাসায় ফেরেন।

যাতায়াতের পথে আম্মারের প্রশ্ন কিন্তু থামেনি। নতুন নতুন বিষয় নিয়ে নতুন নতুন প্রশ্ন ও ওর আম্মু-আব্বুকে অনর্গল করতে থেকেছে।

ওর চোয়ালে কি হয়েছে সে বিষয়ে ওর কোনো খেয়ালই নেই। আর থাকার কথাও না। কেননা ওর বয়সটা তো আর এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার বয়স নয়। বাসায় এসে নিত্য দিনের মতো ও ওর খেলনা নিয়ে খেলায় মেতে থাকে।

পরদিন সকালে অন্যদিনের তুলনায় একটু আগে ভাগে কে যেন ওকে ঘুম থেকে ওঠার জন্য ডাকে। বলে, 'আম্মার ওঠো। তোমার ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে।'

ও চোখ মেলে আশপাশে আম্মু-আব্বুকে পায় না। ঘুম ভাঙানোর জন্য রাগে ও দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে। যেন ঘুম ভাঙানো ওয়ালাকে সামনে পেলে আস্ত চিবিয়ে খাবে।

উঠে বসে ও। দেখে কেউ নেই ঘরে। রাগের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। হাত-পা ছুড়তে থাকে ও। কে যেন ওর হাত-পায়ের গুতা খেয়ে 'আঁউ-উ-উ' করে ওঠে।

চমকে ওঠে ছোট্ট আম্মার। কাউকে দেখতে পায় না ও। বন্ধ হয়ে যায় ওর হাত-পা ছুড়া। ভয়ে চোখ বন্ধ করে দুই হাতে দুই পা ধরে। হাঁটুর ভিতর মাথা গোজে ও।

কে যেন ওকে পাজাকোলা করে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনুভব করে ও। চোখ খোলা তো দূরে থাক। আরো এঁটে রাখে। আব্বু-আম্মুকে ডাকার মতো সাহস ওর হচ্ছে না।

বেশ কিছু সময় পর আম্মার ওর সমবয়সী কিছু শিশুর কথার আওয়াজ শুনতে পায়। বুকে কিছুটা বল ফিরে পায় ও। পিট পিট করে চায়। দেখে

www.icsbook.info

ওর চারপাশে ওর সমবয়সী নয়জন শিশু চেয়ারে বসে আছে। ওর চোয়ালের দাগের মতো অন্যদেরও মুখের বিভিন্ন জায়গায় দাগ আছে। ওরা সকলে বসে আছে ছোট্ট একটা ঘর মতো জায়গায়। ও বুঝে পাচ্ছে না জায়গাটা কোথায়। ভয় ওর কাছ থেকে পুরোপুরি বিদায় নেয়নি।

মাথার ওপর স্পিকার কথা বলে উঠলো। বলল, 'ছোট্ট সোনামণিরা শোনো, আমরা এখন ভীষণ মজা করবো। তার আগে আসো আমরা সকলে নাস্তা করে নিই। তোমাদের সকলের সামনে দেখ বিভিন্ন প্রকার নাস্তা চলে এসেছে। যার যেটা প্রিয় সে সেটা খাওয়া শুরু কর।'

শিশুরা যে চেয়ারে বসেছে তার প্রত্যেকটার সামনে একটি করে ছোট খাটো ডাইনিং টেবিল মেঝে ফুড়ে অটো বের হলো। তাতে সারি সারি সাজানো বিভিন্ন প্রকার শিশুখাদ্য। মোটকু দেখে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে মনের আনন্দে খাবার খেতে লাগলো। বোঝা গেল ওরা দু'জন খেতে ভালোবাসে। অন্যরা কেউ নাক সিটকিয়ে, কেউবা ঘাড় কাঁত করে, কেউ দুই হাতে চোখ মুখ ধরে বসে রইলো। অর্থাৎ এরাই প্রত্যেকদিন খাওয়ার সময় খেতে চায় না। নানা কৌশলে তাদেরকে খাওয়ানো হয়।

দুইজন মেয়ে নাকি সুরে কান্না জুড়ে দিল।

স্পিকারে আবার ভেসে এলো, 'দুই মামণি, কাঁদছো কেন?'

'আমি আম্মুর কাছে যাব।' শুটকো টিনটিনে মেয়েটি বলল।

অন্য মেয়েটি কোনো কিছু না বলে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ছাদের স্পিকার থেকে ভেসে এলো, 'দুই মামণি কেঁদো না। আর যারা কার্টুন দেখতে ভালোবাসো তারা তাদের চেয়ারের ডানপাশে হেডফোন আছে কানে লাগাও।'

কার্টুনের কথা বলার সাথে সাথে দশ শিশুই হেড ফোন কানে লাগালো। ভুলে গেল দু'জন কান্না। খেতে খেতে ওরা দু'জনও বাদ গেল না।

সকলের সামনে বড় এক স্ক্রিন দেখা দিল। তাতে শুরু হল কার্টুন। ত্রিশ সেকেন্ডও গেল না। প্রথমে হেডফোন খুলল আম্মার খান। চিৎকার করে বলল, 'এগুলো পুরোনো। এগুলো পুরোনো। আমি পুরোনো কার্টুন দেখবো না।'

ওর মতো আরো একজন ছেলে আর একজন মেয়ে হেডফোন খুলে ফেলল। ওরা তিনজন এক জায়গায় হলো। শুরু করলো শিশুসুলভ গল্প। এ গল্পের কোনো শুরু নেই। নেই কোনো বিষয়বস্তু। আর শেষ হবে কিনা

www.icsbook.info

তারও কোনো গ্যারান্টি নেই।

আর ওদিকে দুই খাদক ও শুটকো টিনটিনে মেয়েটিসহ পাঁচজন ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের চেয়ারগুলোই সুন্দর শিশু উপযোগী বিছানায় পরিণত হয়েছে।

স্পিকার আবার ঘোষণা দিলো, 'যারা গেমস খেলতে চাও তারা তাদের সিটে যেয়ে বস।'

আম্মারসহ পাঁচজনই সিটে যেয়ে বসলো। সিটের সামনে উদয় হলো কম্পিউটার আর মাউস কি-বোর্ড। পাঁচ শিশুই এক্সপার্ট গেমসের জন্য। শুরু করলো ওরা যার যেটা ভালো লাগে। খেলল বেশ কিছু সময়। প্রথমেই ক্ষান্ত দিলো আম্মার খান। কোনো কিছুই বেশি সময় ওর ভালো লাগে না। ইতিমধ্যে আরো দুইজন ঘুমিয়ে পড়েছে। না ঘুমানো এক মেয়ে ক্ষ্যান ক্ষ্যান করে কাঁদতে লাগলো। নাকি সুরে বলতে লাগলো, 'আমি আম্মুর কাছে যাব। উঁ-উঁ-উঁ আমি আম্মুর কাছে যাব।'

মেয়েটা আস্তে আস্তে তার সিট থেকে উঁচু হলো। তারপর কারো কোলে উঠলে যেমন কাঁধে মুখ রেখে ঘুমায় ঠিক তেমনি শূন্যে ওই অবস্থায় থেকে ত্রিশ সেকেণ্ড পর ঘুমিয়ে পড়লো। শূন্যে ভাসতে ভাসতে অন্যদের মতো মেয়েটিও বেড়ে স্থান পেলো।

আম্মার আবার তার সিট থেকে নেমে পাশের জনের সাথে গল্প জুড়ে দিলো। কী এক কথায় ছেলেটি সায় না দিতেই আম্মার ওর চোয়ালে জেতে এক থাবা মারলো। ছেলেটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। এও ভাসলো মেয়েটির মতো শূন্যের কোলে। আম্মার ফ্যাল ফ্যাল করে তা দেখতে লাগলো। ছেলেটি ঘুমের রাজ্যে যেতেই ওরও স্থান হলো বেড়ে।

আম্মারের কানের কাছে কে যেন বলল, 'তোমার এখন কী করতে মন চাচ্ছে আম্মার বাবু?'

আম্মার ঘুরে চারপাশ দেখে। কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না।

কানের কাছে আবারও শুনতে পায়, 'তুমি এখন কী করতে চাও আম্মার সোনা?'

'তার আগে বল তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে কেন?'

'তোমার ডান হাত বাড়াও, আমাকে পাবে।'

হাত বাড়িয়ে মানুষের মত কারো স্পর্শ পায় ও।

কণ্ঠটা বলে, 'তোমার কী করতে মন চাচ্ছে।'

www.icsbook.info

'আমার ছোট মামার কাঁধের মতো তোমার কাঁধে চড়বো আমি।' বলল আম্মার।

'ঠিক আছে। তুমি সামনে হাত বাড়াও আমার কাঁধ পাবে।' বলল অদৃশ্য কণ্ঠ।

আম্মার দু'হাত সামনে বাড়ায়। পেয়ে যায় দুই কাঁধ। দুইহাত অল্প একটু উপরে উঠায়। পেয়ে যায় দুইকান। দুইকান ধরে কাঁধে চেপে বসে ও। ওর ছোট মামার কাঁধ-কান আর এই কাঁধ-কানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে ছোট মামার সব দেখা যায় আর এর কিছুই দেখা যায় না।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর ও অদৃশ্যের মাথায় চাটি মারে। যেমন মারে ওর ছোট মামার মাথায়।

'আঁউ!' মৃদু চিৎকার করে ওঠে অদৃশ্য কণ্ঠ।

সাথে সাথে আম্মার অদৃশ্যের দুইকান ধরে জোরে টান মারে। মাথায় দেয় জোরের সহিত পরপর তিন চাটি। জোরছে খামচে দেয় নাক-মুখ।

আম্মারের মামার মতো এতোগুলা মার হজম করার ক্ষমতা নেই অদৃশ্যের। তাই 'আঁউ-উ-উ-উ..!' করে ঢলে পড়ে দেয়াল ঘেসে।

আম্মার দু'হাতে ঠেকায়। তাই ওর কোনো আঘাত লাগে না। তবে কাঁত হয়ে পড়ে যায় মেঝেয়।

আম্মার উঠে নয় শিশুকেই ঘুরে ফিরে দেখে। ওরা সকলে ঘুমাচ্ছে।

ছোট্ট ঘরটায় ঘুরে ঘুরে একপাশে একটা দরজা পায় ও। প্রবেশ করে দরজা খুলে। এখানে গাড়ির সিটের মতো একটা সিট এবং সামনে অসংখ্য সুইচ। সিটে বসে আম্মার খান। ও বাংলা অক্ষর সব না চিনলেও ইংরেজি অক্ষর সব চেনে। সুইচের উপর সমস্ত ইংরেজি অক্ষরগুলো একবার পড়ে ও। উচ্চারণ না শেখায় ঐগুলো উচ্চারণ করা ওর দ্বারা সম্ভব হয় না। উচ্চারণ করে দেয়ার মতো কেউ না থাকায় রাগ সপ্তমে চড়ে ওর।

যে কোনো খেলনা দিয়ে খেলা শেষ হয়ে গেলে আম্মার ঐ খেলনা ভেঙে ফেলে দেখতে চায় কিভাবে খেলনায় কাজ করে। তেমনিভাবে সুইচগুলোর উপর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে চড়-ঘুষি, কিল-থাপ্পড় মারা শুরু করে ও।

সুইচগুলো চৌদ্দ পুরুষের কোনো আমলে এমন কমান্ড পায়নি।

ঐ এলোপাথাড়ি চাপের কারণে ভিনগ্রহের ঐ সসার পৃথিবীতে ল্যান্ড করে। উদ্ধার হয় দশশিশু।

www.icsbook.info

'আমি আপনাদেরকে প্রেস ব্রিফিংয়ের শুরুতে এ কাহিনী বললাম এজন্য যে, নয় শিশু উদ্ধারকারী শিশু আম্মার খানের চতুর্থ পুরুষ তরুণ বিজ্ঞানী জুনিয়র আম্মার খান আমাদের এবারের অভিযানের নেতৃত্ব দেবে। অর্থাৎ ভিনগ্রহের প্রাণী কর্তৃক পৃথিবীর একশত শিশু কিডন্যাপ হওয়ায় এ অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন তিনি। অলরেডি তিনি বাংলাদেশ থেকে রওয়ানা হয়েছেন। তাছাড়া তার একমাত্র শিশুও হারিয়ে যাওয়া একশত জনের একজন। আশা করি আপনারা আর কোনো প্রশ্ন করবেন না। আমাদের সন্তান ফিরে পাওয়া অর্থাৎ এই অভিযান সফলতার জন্য আপনারা মহান স্রষ্টার দরবারে প্রার্থনা করবেন আশা করি।' কথা শেষ করে হাতের কাগজগুলো ঠিক করে ফাইলবদ্ধ করে সঙ্গীদের নিয়ে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে যান নাসার প্রধান ড. আউজ্যাক বেরন।

www.icsbook.info

মূল্যায়ন

আশরাফ জামান

এক দেশের কথা। দেশের বাদশাহ্ ও তার প্রধানমন্ত্রী উভয়েই ছিলেন যেমন বুদ্ধিমান তেমনি জনহিতৈষী। দেশের জনগণ বাদশাহ্কে সম্মান করতো এবং ভালোবাসতো। বাদশাহ্ও প্রজার দুঃখ-দুর্দশার আশু প্রতিকার করতেন। যে কোন রকমের অসুবিধায় দৃষ্টি দিতেন।

বাদশাহ্র ছিল এক বুদ্ধিমান মন্ত্রী। যাকে তিনি মন্ত্রীদের প্রধান হিসেবে মর্যাদা দিতেন। নানা প্রয়োজনে তার বুদ্ধি পরামর্শ মেনে নিতেন বাদশাহ্। বাদশাহ্র মনে একদিন এক খেয়াল চাপলো। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে বললেন, আচ্ছা মন্ত্রী বলো দেখি অর্থ বা সম্পদের মূল্য বেশি না জ্ঞান বা বিদ্যার মূল্য বেশি?

মন্ত্রী চুপ করে রইলেন। তাৎক্ষণিক কোন উত্তর তিনি দিলেন না। একটু ভেবে জবাব দিলেন, জাঁহাপনা! এর জবাব এক কথায় দেয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে বলতে পারি অর্থ বা সম্পদের মূল্য কোথাও বেশি আবার

www.icsbook.info

কোথাওবা জ্ঞান বা পান্ডিত্যের মূল্য অধিক।

বাদশাহ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। রাগতস্বরে বললেন, মন্ত্রী এভাবে প্রশ্ন এড়ালে চলবে না। তোমাকে একটি দিক গ্রহণ করে যুক্তি দেখিয়ে উত্তর দিতে হবে। যদি বল অর্থ বা সম্পদের মূল্য বেশি তাহলে তার ওপর যুক্তি দেবে আর যদি বিপরীত মত গ্রহণ কর তবুও তার ওপর তোমাকে যুক্তি দেখাতে হবে। তোমাকে সাতদিন সময় দেয়া হলো যথার্থ জবাব না দিতে পারলে শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড।

এবার মন্ত্রীর টনক নড়লো। মন্ত্রীর চোখে ঘুম নেই, শান্তি নেই মনে। আরাম আয়েশ সব বিসর্জন দিয়েছেন। অনেক ভাবতে ভাবতে একটা উপায় খুঁজে বের করলেন মন্ত্রী। পরদিন দরবারে বাদশাহকে গিয়ে জানালেন তার চিন্তাধারার কথা। তিনি বললেন জাঁহাপনা! আমি চিন্তা করে খুঁজে পেয়েছি এর সঠিক উত্তর।

বাদশাহ বললেন, বল তোমার কথা? মন্ত্রী বললেন, জাঁহাপনা! অর্থ বা সম্পদের তুলনায় জ্ঞান বা বিদ্যা অনেক বেশি মূল্যবান।

এমনকি একটার সঙ্গে অপরটার তুলনাই করা যায় না।

বাদশাহ বললেন, যুক্তি দিয়ে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে নইলে আমি মেনে নেবো না।

মন্ত্রী বললেন, হুজুর আগামী কাল দরবারে জনসমক্ষে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা আমি তা দেখিয়ে দেবো।

পরদিন রাজ্যে ঢোল পেটানো হলো।

ঘোষণায় দেশের বড় বড় ধনবান ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের শাহি দরবারে আসবার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। আরো আসার জন্য নির্দেশ দান করা হলো দেশের বিজ্ঞ পন্ডিত ও জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের।

নির্দিষ্ট দিনে সকাল থেকে লোকজন আসতে লাগলো রাজদরবারে। রাজ্যের অনেক লোক এসে বাইরেও জমায়েত হলো এ দৃশ্য দেখার জন্য।

দেশের শত শত পন্ডিত ও জ্ঞানতাপস এসে আসন গ্রহণ করলেন রাজদরবারের একদিকে। অপর দিকে দেশের বড় ধনশালী ব্যক্তিরা এসে আসন গ্রহণ করলেন।

বাদশাহ সকল ব্যক্তিবর্গ বা আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মানে খানাপিনার ব্যবস্থাও করেছেন। সকলের খানাপিনা ও সম্মান প্রদর্শনের পর আলোচনা শুরু হলো। বাদশাহ সকলের উদ্দেশে সম্মান জানিয়ে আলোচনার বিষয়টি

www.icsbook.info

পুনরায় অবগত করালেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশে ও সকলকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে স্ব-স্ব পক্ষের বক্তব্য রাখার সুযোগ দিলেন।

প্রথমে অর্থবানদের স্বপক্ষে বলার সুযোগ দেয়া হলো। অর্থবান বা সম্পদশালী ব্যক্তিরা কেউবা কোটিপতি আবার কেউবা অগাধ সম্পত্তি বা মিলকারখানার মালিক। এদের মধ্য থেকে একজন উঠে গর্ব করে বললেন, জাঁহাপনা! আমার কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালান্স আছে। আপনি রাজকার্যে দেশের যেকোন প্রয়োজনে বলুন আমি আপনাকে সহযোগিতা করতে পারবো। ঐ অর্থহীন বিত্তহীন পন্ডিতবর্গ ওরা কি পারবেন আপনাকে সাহায্য করতে?

বাদশাহ্ বললেন, ঠিক! রাজ্য পরিচালনা, অন্য রাজ্যের আক্রমণে বা সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে সকল ব্যাপারেই অর্থ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বন্ধু।

এবার পন্ডিতদের পালা। পন্ডিতদের মধ্যে থেকে জীর্ণবস্ত্র পরিহিত এক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানতাপস দাঁড়ালেন তিনি বলেন, জাঁহাপনা!যদি অনুমতি দেন তবে বলি– হ্যাঁ বলুন।

পন্ডিতবর বললেন, অর্থ সর্বক্ষেত্রেই মূল্যবান নয়, অর্থ দিয়ে উনারা সাহায্য করতে পারেন বলেছেন। কিন্তু আপনি বলুন সহস্র সৈন্যদের একজন মাত্র সেনাপতি কি দিয়ে বশ করে? অর্থ দ্বারা ক্রয় করা অস্ত্র দিয়ে নয়, বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে।

বাদশাহ বললেন, তা ঠিক।

এবার অপর একজন অর্থশালী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জাঁহাপনা। এখানে পন্ডিতগণ যারা এসেছেন আমি ইচ্ছে করলে এদের সকলকে চাকরি দিয়ে আমার অধীনে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারি সে ক্ষমতা আমার আছে।

বাদশাহ বললেন, হ্যাঁ তা-ও পারেন।

অপরপক্ষে এক পণ্ডিত দাঁড়িয়ে বললেন, তা ঠিক তবে আপনি আমাদের চাকরি দিয়ে অর্থনৈতিক সুবিধা দান করতে পারেন কিন্তু বিনিময়ে আমাদের কাছ থেকে যা নেবেন তা হলো বুদ্ধি ও জ্ঞান যা আপনাদের নেই।

বাদশাহ এবার চুপ করলেন।

বিত্তবানদের পক্ষ থেকে একজন দাঁড়িয়ে বললেন, জাঁহাপনা! পন্ডিত ব্যক্তিদের চেয়ে আমাদের দ্বারা আপনার উপকার অনেক বেশি হতে পারে। রাজ্যের প্রয়োজনে আমরা হাজার হাজার একর জমিজমা দান করতে পারি যা পন্ডিতেরা পারেন না।

বাদশাহ খুশি হলেন। এবার তিনি তাকালেন প্রধানমন্ত্রীর দিকে। বললেন,

www.icsbook.info

মন্ত্রীবর! তোমার যুক্তি এখনো দেখাতে পারোনি। শেষ জবাব আমি তোমার কাছে চাই। তুমি অতিসত্বর তোমার পক্ষ অবলম্বন করে উত্তর দাও তোমার সময় শেষ হয়ে আসছে।

মন্ত্রী মহোদয় একবার করুণ দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকালেন। মনে তার দৃঢ়তা রয়েছে। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বাদশাহর দিকে তাকিয়ে বললেন, হুজুর এক জরুরি ঘোষণার মাধ্যমে দেশের সকল অর্থ ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের উদ্দেশে জানিয়ে দিন যে, আমাদের রাজ্য বিপদগ্রস্ত। অন্য রাজা আমাদের ওপর হস্তক্ষেপ করছে কাজেই অর্থবান সকল ব্যক্তির কাছে যত নগদ অর্থ আছে এবং তাদের যে ভূসম্পত্তি রয়েছে এই মুহূর্তে তা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হলো। দেশের প্রয়োজনে সমস্ত অর্থ রাজ কোষাগারে জমা দিতে হবে এবং সমস্ত সম্পত্তি রাজ্যের মালিকানায় যাবে।

মন্ত্রী মহোদয়ের এই বক্তৃতা শুনে অর্থশালী ও সম্পদশালীরা হতভম্ব হয়ে গেল। এমনকি কেউ কেউ ভয় পেয়ে গেল, সত্যি না আবার মন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়ে যায়।

অপরদিকে পন্ডিতবর্গের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রী মহোদয় আবার বলতে লাগলেন, জাঁহাপনা! আর একটি ঘোষণা দিন রাজ্যে যত পন্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি আছেন তাদের পান্ডিত্য, বিদ্যা ও জ্ঞান বাজেয়াপ্ত করা হলো। এগুলো রাজ কোষাগারে জমা দিতে হবে।

মন্ত্রীর এই উক্তি শুনে পন্ডিতবর্গ হাসতে লাগলেন। সমস্বরে বলতে লাগলেন, জাঁহাপনা! আমাদের বিদ্যা পাণ্ডিত্য যদি আপনার রাজ্য পরিচালনার কাজে কোন উপকারে লাগে বাজেয়াপ্ত করতে হবে না আমরা স্বেচ্ছায় তা দান করবো।

এতক্ষণে মন্ত্রী প্রাণ পেলেন। তিনি আরো বললেন, জাঁহাপনা! জ্ঞানই সত্য, বিদ্যাই সত্য। জ্ঞান হস্তান্তর করা যায় না, তাই তা ধন সম্পদের চেয়ে মূল্যবান। জ্ঞান দান করলে তা কমে না বরং বাড়ে। কিন্তু অর্থ বা সম্পদ দান করলে কমে, তাই জ্ঞানের মূল্য অধিক। বাদশাহ মন্ত্রীর যুক্তি মেনে নিলেন এবং ধন্যবাদ জানালেন পন্ডিতবর্গকে। পুরস্কৃত করে তাদের বিদায় দিলেন।

পৃথিবীতে যুগে যুগে নবী-রাসূল, আউলিয়া, মহাপুরুষ যাঁরা এসেছেন তাঁরা জ্ঞান বা বিদ্যা নিয়ে এসে মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানিয়েছেন।

ক্ষণস্থায়ী সম্পদ মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, তাই বিদ্যা বা জ্ঞান অধিক মূল্যবান।

www.icsbook.info

বৃষ্টিতে ভিজে বেড়াল ছানা খুব কাহিল হয়ে পড়লো। তুমুল বৃষ্টি। তার ওপর দমকা বাতাসের ঝাপটা। কতোই বা বয়স হয়েছে তার। শীতের শেষে সে জন্মেছে। আর এখন চৈত্রের মাঝামাঝি। মাকে খোঁজার জন্য মিয়াও মিয়াও ডেকে ডেকে সে যাচ্ছিলো চিকলির মাঠে। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মা তাকে সাবধান করে বলেছিলো,

'আমি খাবার আনতে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছো মা?'

'চিকলির মাঠ।'

'আমিও যাবো। বাসায় বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না।'

'শিকারের পেছনে ছুটবো, না তোমাকে সামলাবো?'

'আমি ঝোপের আড়ালে বসে থাকবো। তুমি শিকার ধরবে।'

www.icsbook.info

'আহ্লাদ দেখো। কোনদিক থেকে কোনদিকে যাবো তার হুঁশ আছে। ওসব বায়না ছাড়ো বলছি।'

'শুধু একদিন যাই মা। আর কোনদিন যেতে চাবো না।'

'কথা শোন। বাসা থেকে একদম বের হবে না। ভালো করে বলে গেলাম কিন্তু।'

মা চলে গেলে বেড়াল ছানা বিছানার ওপর একা একা লাফালাফি করলো। তারপর একটা ভাঙা ডুগডুগি গাছের ডাল দিয়ে এলোমেলো তালে বাজাতে বাজাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তার যদি একটা ছোট ভাই থাকতো তাহলে তার সাথে সারাদিন খেলতে পারতো সে। এভাবে অনেকটা সময় কাটিয়ে খুব বিরক্ত হলো বেড়াল ছানা। মায়ের কড়া নিষেধ সত্ত্বেও সে একপা দু'পা করে নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে মাঠের দিকে যেতে লাগলো। এমন সময় হঠাৎ করে এলো দমকা বাতাস আর বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টির আঘাতে তার ছোট্ট দেহখানা চুপসে গেলো। দমকা বাতাসে তার এতাটা ঠান্ডা লেগে গেলো যে সে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করলো। এদিকে তার ক্ষুধাও লেগে গেলো প্রচুর। কিন্তু কোথায় পাবে সে খাবার। এই দুর্যোগে যদি মায়ের দেখা মিলতো! মা তাকে এই করুণ অবস্থায় দেখলে বাসায় নিয়ে যেয়ে আগুনের কাছে বসিয়ে বুকের দুধ খাওয়াতো। দুধ খাওয়া হলে ইঁদুর ছানার নরম হাড় চিবিয়ে মায়ের গা ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়তো। তার অবস্থা এতোটা খারাপ হলো যে তার হাঁটার ক্ষমতা নেই। দাঁড়াতে গেলেই সে মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যায়।

এমন সময় একটা উড়ন্ত বাজ তাকে ছোঁ মেরে অনেক দূরে চলে যায়। বেড়াল ছানার দেহে তখন কী আর জান আছে! ভয় এবং আতঙ্কে সে হুঁশ হারিয়ে ফেললো। বাজপাখি তাকে নিয়ে উড়তে উড়তে নিজের বাসায় নিয়ে গেলো। বাজের তিনটে অবোধ বাচ্চা বৃষ্টির ঝাপটা আর ঠান্ডা বাতাসের দাপানিতে কাহিল হয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে ছিলো বাসার মাঝখানে। বেড়াল ছানাকে বাচ্চাদের পাশে ফেলে রেখে অন্য কাজে চলে গেলো বাজপাখি। সে ভাবলো বাচ্চারা যখন ঘুম থেকে জাগবে তখন বেড়াল ছানাকে খেয়ে ক্ষুধা মেটাবে। সে বেড়াল ছানাকে মৃত ভেবেছিলো। তার দেহে যে প্রাণ ছিলো এ কথা বাজপাখি একটুও বুঝতে পারেনি। তার পেটেও ক্ষুধা কামড়

www.icsbook.info

দিচ্ছিলো। কিন্তু কাজের তাড়া থাকার কারণে বেড়াল ছানাকে খাওয়ার কথা মনে তুললো না। পথে যেতে দু'চারটা মেঠো ইঁদুর ছোঁ মেরে নিলেই চলবে। তিনটে বাচ্চার পেট ওটাকে খেলে যে খুব একটা ভরবে না তা সে আন্দাজ করতে পেরেছে। পুরুষ বাজটা ক'দিন হলো বোনের বাড়িতে বেড়াতে গেছে। তার খোঁজ করার জন্য সে বাতাসে পাখা মেলে দিলো।

একটু পরে বর্ষণ কেটে গিয়ে রোদ উঠলো আকাশে। সে রোদ লেগে বেড়াল ছানা সতেজ হয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরলো তার। রোদের দিকে পিঠ দিয়ে সে ভেজা দেহখানা ইচ্ছেমতো শুকিয়ে নিলো। এখন তার একটুও খারাপ লাগছে না। তবে পেটের ক্ষুধাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বেড়াল ছানা চোখ মেলে দেখতে পেলো বাজের দুটো বাচ্চা জড়সড় হয়ে আরাম করে ঘুমাচ্ছে। ঘুম থেকে জেগে ওঠার কোন লক্ষণ নেই ওদের। বেশ খাওয়া চলবে এবার টাটকা মাংস। সে একটা বাচ্চাকে খুব সন্তর্পণে টেনে নিয়ে ঘাড় মটকে মজা করে খেতে লাগলো। একটাকে খাওয়া শেষ করে সে আর একটার ঘাড় ভেঙে আপন মনে খেতে লাগলো। এটা যে শক্ত ডানার বাজের বাসা এ বিষয়ে তার একটুও ধারণা নেই। সে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। এমন সময় পাখায় বাতাসের আওয়াজ তুলে স্বামীকে সাথে নিয়ে বাসায় ফিরলো বাজপাখি। বেড়াল ছানার কান্ড দেখে তারা অবাক হয়ে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলো। পুরুষ বাজটা তার স্ত্রীকে প্রশ্ন করলো,

'কী হচ্ছে এখানে? বাসায় বসে কী খাচ্ছে বেড়াল?'

'ওটা তো মরা ছিলো। একটু আগে ধরে এনে ওদের কাছে রেখে গেলাম। এখন দেখছি মরেনি।'

'কী বলছো তুমি, ঘাড় মটকে রেখে যাওনি কেন?'

'আমি ভাবলাম মরে গেছে। তাই তোমাকে খুঁজতে চলে গেছি।'

'আমাকে খুঁজতে মানে? আমি কি দুধের বাচ্চা? আমি বুঝি একা আসতে পারতাম না?'

'তিনদিন আসোনি। তাই ভাবলাম একটু এগিয়ে যাই। এতোবড় সর্বনাশ হবে কী করে জানবো?'

'তোমাকে আচ্ছা করে পেটানো দরকার। কী করবো এখন। নিজের পালক ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।'

বাচ্চাদের জন্য বাজপাখি যে আহার সংগ্রহ করে এনেছে সেই তাদের খেয়ে

www.icsbook.info

ফেলেছে। কত আদর আর ভালোবাসায় সে তাদের বড় করে তুলছিলো। নিজের বোকামির জন্য আজ তার এতবড় ক্ষতি হয়ে গেলো। কপালে হাত দিয়ে সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। বাজেরা তাদের সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বেড়াল ছানাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। কিন্তু বাজের দুটো বাচ্চাকে ভক্ষণ করে তার দেহে এতোটা বল এসেছে যে সে বাঘের মূর্তি ধারণ করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওর ক্ষিপ্রতা দেখে ওরা পিছু হটতে বাধ্য হলো। একটা পুরনো গাছের মরা ডালে বসে বাজেরা করুণ সুরে কাঁদতে লাগলো। তাদের কান্না শুনে শালিক, বক, পেঁচা, কাক, ফিঙে এবং আরও অনেক পাখি এসে চারপাশে ভিড় করতে লাগলো। শালিক বললো,

'কী হয়েছে আপনাদের। কাঁদছেন কেন?'

'আমাদের ছানা খেয়ে ফেলেছে।'

'কে খেয়ে ফেলেছে?' গলা বাড়িয়ে বললো কানি বক।

'আপনারা তখন কোথায় ছিলেন? বাসায় কেউ ছিলো না?' কিছুটা ভারিক্কি গলায় বললো পেঁচা।

'আমি বাইরে ছিলাম। এসে দেখি একটা বেড়ালের বাচ্চা এই কান্ড করেছে।' মিনমিনে গলায় বললো মা বাজপাখি।

ঘটনা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেলো। বাজের বাচ্চাকে ঘাড় মটকে খেয়েছে যে ঘাগু বেড়ালের বাচ্চা তাকে দেখার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সবাই চললো বাজের বাসার উদ্দেশে। দেখ কতো লাটবাহাদুর হয়েছে সে বিচ্চু বেড়ালছানা। দুটো বাড়ন্ত ছানাকে সাবাড় করে বাসা জবর দখল করে বসে আছে। এমন অনাচার তো হতে দেয়া যায় না। সবাই শোরগোল করে সেখানে যেয়ে দেখলো বেড়ালের বাচ্চা সেখানে নেই। এতসব হট্টগোলের মাঝে সে যেন কোথায় চম্পট দিয়েছে।

বাজপাখির বাসার মাঝখানে পড়ে আছে তাদের মৃত ছানার রক্তাক্ত পালক।

www.icsbook.info

শাওনের গল্প লেখ

আহসান হাবিব বুলবু

ছোট মামা গ্রাম থেকে এসেছেন। শাওন বেশ ফুর্তিতে আছে বিকেলে ওর বন্ধুরা আসে। অন্ত, রুমী ও পবন। ওরা পাশে বাসার। বাড়ির সামনে এক চিলতে প্রাঙ্গণে কাঁঠাল গাছে নিচে খেলছে ওরা। শাওন মাতিয়ে তোলে সবাইকে। মামা ড্রয়িং রুমে বেলকুনিতে বসে বই পড়ছেন। মাঝে মধ্যে ভাগ্নের অদ্ভুত ধরনের খেলা দেখছেন। বইয়ের বিষয়বস্তুর চেয়ে শাওনের খেলাটাই বেশি মনোযো কাড়ে মামার।

শাওনের মামার নাম সৈয়দ শাহীন তারেক। তিনি একজন স্কুল টিচার নতুন জয়েন করেছেন। সিরাজগঞ্জ জেলা স্কুলে। এডুকেশন সাইকোলজি

www.icsbook.info

ওপর গ্র্যাজুয়েশন করেছেন তিনি। শিশু শিক্ষা মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর লেখালেখি আছে। তিনি ভাবছেন শাওনদের খেলাটা কী হতে পারে।- "ছোটবেলায় আমরা চোর-পুলিশ খেলেছি। যে পুলিশ হতো, সে চোর খুঁজে বের করত। সে রকম কিছু মনে হচ্ছে না। তবে খেলাটা কী? .... ছোটখাটো একটা জনসভার মতোই মনে হচ্ছে। একজন বক্তৃতা করছে। বক্তা কথার চেয়ে হাত ছোড়াছুড়িই বেশি করছে। হঠাৎ হট্টগোল। ছোটাছুটি! শাওন রঙিন কাগজের চারকোনা প্যাকেটের মতো একটা বস্তু হাতে নিয়ে ছবি তোলার ভঙ্গিতে ক্লিক-ক্লিক করছে।"

মামার আর বুঝতে বাকি থাকে না খেলাটি কি। মামা মিষ্টি মিষ্টি হাসেন। খুব উপভোগ করেন ওদের খেলা। শাওনরা ঢাকায় থাকে। ওর বাবা মাহবুব জামান একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। শাওনের মামা আসার খবর পেয়ে তিনি আজ একটু আগেই বাসায় ফিরেছেন। সন্ধ্যার পর ছোট মামাকে নিয়ে মেতেছে শাওন আর রুমকী। দু'ভাইবোন ওরা। রুমকী ছোট। কেজি স্কুলে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানে পড়ে। শাওন স্ট্যান্ডার্ড ফোর-এ এবার ফার্স্ট হয়েছে।

মামা তাই শাওনকে একটি দামি কলম গিফট করেছেন। শাহীন সাহেবের ঢাকা আসার উপলক্ষের কথা বলা হয়নি। এবার একুশে বইমেলায় শাহীন সাহেবের লেখা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হবে। এটি তার লেখা প্রথম বই। শিশু শিক্ষা মনস্তত্ত্বের উপর লেখা। তাই শাহীন সাহেব যেমন আনন্দে আছেন। তেমনি বাড়ির সবাই- আপা, দুলাভাই, ভাগ্নে-ভাগ্নি তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। সেদিন সবাই যাবে বইমেলায়। বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশ নিবে। গল্পের আসরে আব্বু আম্মুও এসে যোগ দেন।

আম্মু এসো, আব্বু এসো, মামা গল্প বলবেন–রুমকী এভাবেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। শাওন বলে, মামা! গল্প পরে হবে। আজ আমি তোমাকে ইন্টারভিউ করবো। মামা বলেন, তাতো দেখেই বুঝেছি। তখন সাংবাদিক-সাংবাদিক খেলছিলে না! জি মামা। কেমন করে বুঝলেন? তোমার অ্যাকটিং দেখেই বুঝেছি। শাওন! এবার তোমার ইন্টারভিউটা শুরু করো।

: মামা জানো! আমার না সব হতে ইচ্ছে করে। টেলিভিশনে যখন গান শুনি তখন খুব গাইতে ইচ্ছে করে। আর্ট গ্যালারিতে যখন প্রদর্শনী দেখতে যাই তখন বড় শিল্পী হতে ইচ্ছে করে। মিডিয়ায় চাঞ্চল্যকর রিপোর্টিংগুলো দেখলে আবার সাংবাদিক হতে ইচ্ছে করে। আর বিশ্বকাপ ক্রিকেট আসলে

www.icsbook.info

তো আর কথাই নেই। এমনটা হয় কেন?

: সব মানুষের মধ্যে কমবেশি সৃজনশীলতা থাকে। তাই ইচ্ছেগুলো এভাবে উঁকি দেয়। তারপর বয়সের একটি পর্যায়ে সে তার লক্ষ্য স্থির করে নেয়। এবং সেই বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে। তুমিও দেখবে, একসময় তোমার সবচেয়ে পছন্দের বিষয়টি বেছে নিতে পারবে।

: আচ্ছা মামা! তুমি তো একজন লেখক। তোমার বই প্রকাশ হয়েছে। আমি লেখক হতে চাই। আমাকে কী করতে হবে।

: তুমি লিখবে? তাহলে তোমাকে প্রচুর পড়তে হবে। লিখতে পারার ভেতর একটা অনাবিল আনন্দ আছে। এই আনন্দটাই তোমার কাম্য। তোমাকে পড়ার মাঝে প্রচুর আনন্দ খুঁজে পেতে হবে। বই মানুষকে জ্ঞান দেয়। বই মানুষকে যোগ্য করে তোলে। পড়তে পড়তে দেখবে তোমার ভেতর এক নতুন ভুবনের সৃষ্টি হয়েছে। খন্ড খন্ড অনুভূতি ভাবনার ঢেউ তুলে তোমায় আচ্ছন্ন করছে। তুমি তখন মনের অজান্তে দু'কলম লিখে ফেলতে পারবে। বিখ্যাত লেখক টলস্টয় মনে করতেন, লেখাটা কেবলমাত্র প্রতিভার ব্যাপারই নয়; বরং অন্য যে জিনিসটি তুমি করতে চাও তারই মতো অনুশীলনের বিষয়। টলস্টয় তার একটি লেখাকে বার বার সংশোধন করতেন। ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি তার চিন্তাকে কাগজ-কলমে রূপ দিতেন। তিনি বলেছেন, জীবনে তিনটি বস্তুই বিশেষভাবে প্রয়োজন, তা হচ্ছে বই, বই এবং বই। আজকাল ছেলে-মেয়েরা কম্পিউটার, মোবাইল ও ইন্টারনেট নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাদের বই পড়ার সময় কোথায়। কিন্তু তুমি যদি লেখক হতে চাও তবে তোমাকে পড়তে হবে।

: কী পড়বো?

: পাঠ্যপুস্তক তো পড়বেই। এর বাইরে গল্প-কবিতা উপন্যাস নাটক, ইতিহাস বিজ্ঞান ভূগোল সব পড়বে। নিয়মিত পত্রপত্রিকা পড়বে। ইন্টারনেটেও বই পড়ার সুযোগ রয়েছে। আমার একজন শিক্ষক কী বলতেন জানো! উনি যেদিন পড়ার কিছু না পেতেন, সেদিন হাতের কাছের পঞ্জিকাটাই নিয়ে পড়তেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অতিরিক্ত পড়াশোনার জন্য তোমাকে একটা সময় বের করে নিতে হবে। যাতে স্কুলের লেখাপড়ার ক্ষতি না হয় কেমন!

এসব গল্প হচ্ছে বুঝি!–

রুমকীর মৃদু শাসনে নড়েচড়ে বসে ওরা। আম্মু আশ্বস্ত করেন

www.icsbook.info

রুমকীকে। ঘুমানোর সময় মজার গল্প বলা হবে তোমাকে এখন লেখাপড়ার কথাই শোনা যাক।

: মামা! এবার একুশের বইমেলায় তোমার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হবে-এখন তোমার কেমন লাগছে?

: সব সৃষ্টিরই একটা সুখ আছে। কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে...। যখন গল্প কবিতা বা বই প্রকাশ পায়, তখন সব লেখকেরই ভালো লাগে। আমারও খুব ভালো লাগছে। নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে।

: মামা! তুমি কি তোমার ছাত্রদের পেটাও। আজকাল খবরের কাগজে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষক ছাত্রদের বেদম প্রহার করছে। আহত ছাত্রকে হাসপাতালে চিকিৎসা পর্যন্ত নিতে হয়েছে। এটা কি ঠিক।

: এটা মোটেও ঠিক না। শিক্ষা দানের জ্ঞানের অভাবে দু' একজন শিক্ষক এমনটা করছেন। দুষ্ট প্রকৃতির ছাত্রদের প্রহার না করে তাদের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। অভিভাবককে ডাকা যেতে পারে। শিক্ষকদের উচিত ছাত্রদের জ্ঞান অর্জনের প্রতি অনুরাগী করে তোলা। লেখাপড়ার মাঝে যে একটা অনাবিল আনন্দ আছে সেটা খুঁজে পেতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

—এবার মামা-ভাগ্নের আড্ডায় আব্বু অংশ নেন। মাহবুব সাহেব বলেন, 'তোমাদের সবার জন্য একটা আনন্দের খবর আছে।' সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সবার দৃষ্টি তাঁর প্রতি। কী সেই খবর।

: তোমরা হয়ত সবাই জেনে থাকবে সম্প্রতি আমাদের মহামান্য হাইকোর্ট শিশুদের জন্য শরীরের ওজনের দশ শতাংশের বেশি ভারী স্কুলব্যাগ বহনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আইন করতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন থেকে শিশুরা আর ভারী ব্যাগ বহন করবে না।

—রুমকী ও শাওন খবরটা শুনে খুব খুশি হয়।

গল্পে গল্পে সময় কেটে যায়। ওদিকে রাতের খাবারের ডাক পড়ে। রুমকী ওঠে পড়ে। মামা চল খেতে চল। তোমাদের এসব গল্প আমার মোটেও ভালো লাগলো না। শুধু বাবার খবরটা ভালো লাগলো। এখন থেকে আমাকে আর এত এত বই নিয়ে স্কুলে যেতে হবে না।

দেখতে দেখতে সেই শুভ সময়টি এসে গেল। আজ ১ ফেব্রুয়ারি। একুশে বইমেলার উদ্বোধন। আজই মামার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হবে।

www.icsbook.info

মেলার নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠান।

শাওন ও রুমকী মামা এবং বাবা-মাকে নিয়ে দুপুরের পর পরই মেলায় গিয়ে উপস্থিত হলো।

দীপ্ত প্রকাশনীর বর্ণাঢ্য আয়োজন। তারা দশজন লেখকের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করবে। তাদের মধ্যে সৈয়দ শাহীন তারেক অন্যতম। শাওন-রুমকীর মনে আনন্দ আর ধরে না। তাদের মামা সংবর্ধিত হবে। অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রধান অতিথি লেখকদের হাতে হাতে বই তুলে দিলেন। অনেক অনেক করতালি পড়লো। রজনীগন্ধা আর গোলাপের সৌরভে সংবর্ধিত হলেন লেখকরা। তারপর সবাই মেলা ঘুরে ঘুরে বেড়ালো। মামা শাওন ও রুমকীকে বই কিনে উপহার দিলেন।

– সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করে বাসায় ফিরলো ওরা।

রাতে শুয়ে শুয়ে শাওন ভাবে মামাকে ও একটা সারপ্রাইজ দিবে। আজকের অনুষ্ঠানমালার একটা বর্ণাঢ্য চিত্র 'ও' মনে মনে এঁকে নেয়।

গত এক মাসে শাওন প্রতিদিন একটু একটু করে লেখে। একুশে বইমেলায় মামার বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের ঘটনা প্রবাহ অনুষ্ঠানমালার চিত্র একটা গল্পে রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। অনেক ঘষামাজা আর যত্নের পর একটা গল্প দাঁড় করা 'ও'।

শাওন লেখাটি একটি জাতীয় দৈনিকের শিশুদের পাতায় পাঠিয়ে দেয়, ছাপানোর জন্য।

বসন্তকাল। ভোরের মৃদুমন্দ হাওয়ায় ঘরের দরজার পর্দাটা দুলছে। দু'টি চড়ুই পাখি ঘরের ভেন্টিলেটারে কিচির-মিচির শব্দ তুলছে। শাহীন সাহেব চা'র টেবিলে পত্রিকা পড়ছেন। পাতা উল্টাতে গিয়ে শিশুদের বিভাগ 'পাতা বাহার'-এ চোখ আটকে যায়। ছোট্ট একটি লেখা। শিরোনাম 'মামার হাতে রজনীগন্ধা' লিখেছে, শাওন আহমেদ।

মামার বিস্ময় আর কাটে না। এতো তারই বইমেলার কাহিনী। ভাগ্নে শাবাশ! শাওন সোনা সত্যি তুমি বড় লেখক-সাংবাদিক হবে। দেশ ও জাতির কল্যাণ করবে।

www.icsbook.info

একটি কান্নার গল্প

আহমদ বাসির

বাড়ির জোড়াতালি দেয়া টিনের গেটটার ওপর জোরে জোরে থাপ্পড় পড়ছে। এত জোরে গেট থাপড়াচ্ছে কে? হারিস মিয়া ভিতরে ভিতরে চমকে ওঠে। একটু আগেই গোসলখানায় ঢুকেছে সে। বালতি থেকে এইমাত্র একবাটি পানি মাথায় ঢেলেছে। এ অবস্থায় ভেজা শরীর নিয়ে গেটের দিকে যেতে ইচ্ছে হলো না তার। কাপড়ের ঘেরা দেয়া গোসলখানা থেকে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে স্ত্রীকে ডাকলো– 'কইরে সানু, গেটে কে আইলো দেখতো তাড়াতাড়ি।' খুব দ্রুতই রান্নাঘর থেকে সাড়া দিলো হারিস মিয়ার স্ত্রী– 'ভাতের মাড় গালতেছিলাম, তুমি গোসল সাইরা লও, আমি দেখতাছি। কেডা আবার এত জোরে জোরে গেট থাপড়াইতাছে।' বলতে বলতে গেটের দিকে এগিয়ে যায় সানু।

www.icsbook.info

হারিস মিয়ার পরিবারটি মোটামুটি সচ্ছল। এক ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে পাঁচ সদস্যের সংসার। হারিস মিয়া ও তার বড় ছেলে পেশায় ড্রাইভার। দু'জন ভাড়ায় অটোরিক্সা চালায়। খাওয়া-পরার অসুবিধা তেমন কিছু নেই। যা একটু অসুবিধা থাকার। অনেক চেষ্টা করে বস্তির এই ডোবা জায়গাটি ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে হারিস মিয়া। তারপর এটি ভরাট করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাকে। অবশেষে এখানে তৈরি হয়েছে চারটি থাকার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি গোসলখানা, একটি টয়লেট আর একটু খোলা জায়গায় ছোটখাটো একটি সবজি ক্ষেত। সমস্যা হচ্ছে বর্ষাকালে পানি ঠেকানো যায় না কিছুতেই। ঘরের ভিতরেই ঢুকে পড়ে পানি। তখন নানাভাবে ঠেক-ঠুক দিয়ে চলতে হয়। হারিস মিয়া মাঝে মাঝে ভাবে, থাকার এটুকু আশ্রয় না মিললে তার সংসারে খাওয়া-পরার সচ্ছলতা থাকতো না, হোক তা যতই অসুবিধাজনক। শুধু বর্ষার পানি বলে কথা নয়, এ বস্তিতে আরও নানারকম অসুবিধার আশঙ্কা থেকেই যায়।

হারিস মিয়া ও তার স্ত্রী সে রকমই কোন অসুবিধার আশঙ্কা করেছিলো। গেটের কাছাকাছি গিয়ে সানু উচ্চস্বরে জানতে চাইলো–'কে রে এত জোরে জোরে গেট থাপড়াইতেছে।' সহসাই জবাব এলো– 'আমি আম্মু, তাড়াতাড়ি গেট খুলে দাও, এত দেরি করছ কেন।' ছোট মেয়ে তিন্নির কণ্ঠ শুনে চমকে ওঠে সানু। গোসলখানা থেকে হারিস মিয়াও শুনতে পায় মেয়ের গলা। সেও চমকে ওঠে। কী হলো মেয়েটার। মেয়ে তো এভাবে গেট থাপড়ায় না, এভাবে কথা বলে না। সানু খুব দ্রুত গেট খুলে দেয়। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে– 'কী রে মা কী হইছে।' তিন্নি কোন জবাব না দিয়েই মাকে পাশ কটিয়ে একছুটে ঢুকে পড়ে ঘরে। সানুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কী হলো মেয়েটার? টিনের গেটটা ভিতর থেকে আটকে দিয়ে মেয়ের মতোই একছুটে ঘরে ঢুকে পড়ে মা। মেয়েটা বিছানার উপুড় হয়ে বালিশে মুখগুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বুকটা আরেকবার মোচড় দিয়ে ওঠে মায়ের। মেয়ের পাশে বসে পড়ে সানু। পিঠের ওপর মায়ের হাত টের পায় তিন্নি। ওর কান্নার গতি বেড়ে যায়। হাহাকার করে ওঠে সানু– 'কী হইছেরে মা আমারে কও।' মেয়ের কান্নার গতি এবার আরও বেড়ে যায়। সানু চিৎকার করে স্বামীকে ডাকে– 'কইগো তিন্নির আব্বু, তোমার এখনও গোসল শেষ হইলো না। এদিকে আমার মেয়েটা যে এমন করতেছে... কী হইছে গো ওর।' বলতে বলতে তিন্নির আম্মুও এবার কান্না জুড়ে দেয়। হারিস মিয়া

www.icsbook.info

দ্বিতীয় বাটি পানি এখনও মাথায় ঢালেনি। এতক্ষণ তার খেয়াল মেয়ের দিকেই ছিলো। হাতে নেয়া পানির বাটিটি তখনও তার হাতেই ধরা। বাটিটি দ্রুত বালতির দিকে ছুঁড়ে মেরে ভেজা কাপড়েই ঘরের দিকে ছুটল সে। ততক্ষণে মা আর মেয়ের কান্না করুণ হাহাকার হয়ে ছাড়িয়ে পড়েছে আশপাশের ঘরগুলোতে। যে যেখানে বসে এ আওয়াজ শুনেছে সে-ই ছুটে আসতে শুরু করেছে। তিন্নিদের টিনের গেটটার ওপর এবার অনেক হাতের ধাক্কা ও থাপ্পড় পড়ছে একসঙ্গে। প্রতিবেশীরা তিন্নির আব্বু-আম্মুকে ডাকছে খুব জোরে জোরে–'ও হারিস মিয়া, ও সানু, কী হইছে তোমাগো, গেটটা খুইলা দাও না।' গেটের দিকে নজর দেয়ার সুযোগ নেই হারিস মিয়া কিংবা সানুর। মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তারা।

তিন্নিদের গেটে যারা ভিড় জমিয়েছে তাদের মধ্য থেকে একটি ছেলে দ্রুতই বাঁশের খুঁটি বেয়ে গেট ডিঙিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে। ছেলেটি গেট খুলে দিলে সবাই হুড়মুড় করে ভেতরে চলে আসে। সবার মুখে একটাই জিজ্ঞাসা- 'হয়েছেটা কী।' জবাব মিলছে না কারো কাছেই। কয়েকজন নারী-পুরুষ ওই ঘরটাতে ঢুকে পড়ে। তারা তিন্নির আব্বু-আম্মুর কাছে ঘটনা জানতে চায়। হারিস মিয়া ও সানু প্রতিবেশীদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করে না। তারা বরং মেয়ের কাছ থেকে আসল কথাটি জানার কোশেশ করতে থাকে।

প্রতিবেশীদের ব্যাপক আগমন ঘটতে থাকায় দৃশ্যপট কিছুটা পরিবর্তন হয়। সানুর কান্না থেমে যায়। তিন্নির কান্নার গমকও কিছুটা কমে আসে। হারিস মিয়া সানুকে একপাশে ঠেলে দিয়ে মেয়ের মাথাটি কোলে নিয়ে বসে আছে। উৎসুক মানুষের ভিড় ক্রমাগত বাড়ছে। মানুষের জিজ্ঞাসার একটা জবাব না মিললে তারা যেন এখান থেকে এক পাও নড়বে না। হারিস মিয়া চিন্তিত হয়ে পড়ে। মেয়ের মাথার চুলে যত্নের সঙ্গে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করে– 'তিন্নি মা, এবার আব্বুর কাছে কওতো মা, কী হইছে তোমার। কতো লোক আইসা জড়ো হইছে দেখো। তোমার লগে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে আমরা সবাই মিলে তারে সাজা দিমু। তুমি শুধু আমাগোরে কও কী হইছে।'

আব্বুর কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে তখনও ফোঁপাচ্ছিল তিন্নি। সবেমাত্র আট বছরে পা দিয়েছে সে। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণিতে উঠেছে। লেখাপড়ায় ভালো হওয়ায় আব্বু ওকে বস্তির বাইরে একটি ভালো

www.icsbook.info

স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। নতুন স্কুলে ভর্তি হওয়ায় তার অনেক নতুন বান্ধবী হয়েছে। মাঝে মাঝেই ওদের কেউ কেউ তিন্নির বাসা পর্যন্ত আসে। তবে বেশি সময় থাকে না। তিন্নির আব্বু-আম্মু ওদেরকে যত্ন করে বসতে বলে। কিন্তু ওরা দ্রুতই কেটে পড়ে। প্রায় সবার একই কথা, ওদের আব্বু-আম্মু যদি জানতে পারে বস্তিতে ওদের কোন বন্ধু আছে তাহলে তিন্নির সঙ্গে ওদের আর মিশতেই দিবে না। শুনে তিন্নির আব্বু-আম্মু মনে একটু কষ্ট পেলেও ওদেরকে কিছুই বলেন না।

চোখ দুটি দু'হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কচলাতে কচলাতে চোখ খোলে তিন্নি। আশপাশে অনেক উৎসুক মুখ দেখতে পেয়ে আবারও চোখ বন্ধ করে। সবাই দেখতে পায়, কাঁদতে কাঁদতে তিন্নির চোখ দু'টি টকটকে জবা ফুলের রঙ ধরেছে। চোখ বন্ধ রেখেই তিন্নি এবার কথা বলে– 'আব্বু তুমি সবাইকে চলে যেতে বলো। আমার সাথে কেউ কোন খারাপ ব্যবহার করেনি।'

কান্না থেমে যাওয়ার উৎসুক মানুষের ভিড় কিছুটা কমে আসে। এ অবস্থায় তিন্নির আব্বু উচ্চস্বরে সবাইকে চলে যাওয়ার অনুরোধ করেন। মানুষজন আরও কমে যায়। আশপাশের ঘরের কয়েকজন মহিলাই তখনও অপেক্ষা করছিল, তিন্নির কান্নার বৃত্তান্ত জানতে। এসব মহিলাদের একজনকে তিন্নি খালা বলে ডাকে। সেই রানু খালাই এবার তিন্নির কাছে জানতে চায়– 'তিন্নি সোনা, সবাই তো চলে গেছে। এবার তুমি আমাগোরে কও তো হইছেটা কী?'

আব্বুর কোল থেকে মাথা তুলে বসে পড়ে তিন্নি। চোখ দু'টোকে আরেকবার কচলে নেয় দু'হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। তারপর বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করে– 'আব্বু, তুমি তো আমাদেরকে অনেক কিছু কিনে দাও। যা খেতে চাই এনো দাও। তাই না?' সহসাই জবাব দেয় তিন্নির আব্বু– 'হ্যাঁ, তাইতো, সব বাবা-মা-ই তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য এরকম করে।'– 'না আব্বু করে না।' বলেই তিন্নি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। হারিস মিয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন– 'কী হইছে, আগে তো খুইলা ক, তুই এত্ত কাঁদলে কইবি ক্যামনে।' তিন্নি কান্না থামোনোর চেষ্টা করে। কিন্তু তার সে চেষ্টা পুরোপুরি সফল হয় না। অবশেষে কাঁদতে কাঁদতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করে। যদিও আবেগে, উত্তেজনায় তার বর্ণনা হয়ে ওঠে বেশ অগোছালো। গুছিয়ে বলতে গেলে ঘটনাটা ছিল

www.icsbook.info

এরকম–

প্রতিদিনের মতো এদিনও বেলা দুপুর ১২টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ছুটি হয়ে যায় তিন্নিদের। তিন্নি বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে বেলপুরি খেয়ে টিফিনের টাকাটা উজাড় করে দেয়। স্কুল ব্যাগটি পিঠের ওপর ঠিকমতো সেট করে এবার সে রওয়ানা করে বস্তির দিকে। কিছুদূর এগুনোর পর সামনের মোড়ে একটি দৃশ্য দেখে চোখ আটকে যায় তিন্নির। দৃশ্যটি দেখতে দেখতেই সে এগোতে থাকে।

এই মোড়ে একটি চা ও কনফেকশনারি দোকান আছে। দোকানের কাউন্টারের সামনেই একটি মোটরসাইকেল দাঁড়ানো। মোটরসাইকেলে হেলান দিয়ে একটি লোক কোকাকোলা জাতীয় কোন কোমলপানীয় পান করছে। তার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে তিন্নির সমবয়সী একটি টোকাই ছেলে। ছেলেটির পিঠে একটি বড় বস্তা ঝুলানো। ডান হাত দিয়ে ঘাড়ের ওপর সে বস্তাটি ধরে রেখেছে। নজর তার লোকটার হাতে ধরা বোতলটির দিকে। লোকটা কিছুক্ষণ পরপর বোতলটি উপুড় করে ঢকঢক করে পান করছে। আরও কিছুদূর এগিয়ে তিন্নি দেখলো লোকটার এক হাতে একটা সিগারেটও জ্বলছে। সে একবার বোতলটি থেকে পান করছে, আবার সিগারেট থেকে।

খুবই ছোট ছোট পা ফেলে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল তিন্নি। তার নজরে পড়ল, লোকটা বোতল থেকে ঢকঢক করে পান করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছে। সঙ্গে সঙ্গেই তিন্নি তাকালো টোকাই ছেলেটার দিকে। ছেলেটা জিব দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তিন্নির বুকের ভেতরটা কেমন জানি করে ওঠে। সে এগিয়ে যায় মোড়ের আরও কাছে। লোকটি এবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দেয় টোকাই ছেলেটার মুখের ওপর। ছেলেটা মাথা এদিক-ওদিক করে ধোঁয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। লোকটা আরও একবার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দেয় ছেলেটার মুখের ওপর। ছেলেটা এবার একটু সরে দাঁড়ায়। লোকটা বোতল উপুড় করে শেষ পানীয়টুকু ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দেয়। তারপর বোতলটি ছুঁড়ে মারে টোকাই ছেলেটির গায়ের ওপর। ছেলেটি খুব দ্রুতই বোতলটি লুফে নিয়ে দৌড়ে খানিকটা এগিয়ে যায়। তিন্নিও ততক্ষণে মোড়ে চলে আসে। লোকটা দোকারদারকে টাকা দেয়ার জন্য মানিব্যাগ বের করে। টাকা বের করতে করতে খুব নোংরাভঙ্গিতে বলে ওঠে– 'টোকাইর বাচ্চা

www.icsbook.info

টোকাই একটা বোতলের জন্য কতক্ষণ ধইরা কুত্তার মতো জিহ্বা বাইর কইরা খাড়াইয়া আছে।' দোকানদার লোকটার হাত থেকে টাকা নিতে নিতে হাসিমুখে জবাব দেয়– 'ওরা ওই রকমই, কুত্তারও জাত আছে, ওগোর কোনো জাত নাই।'

কথাগুলো তিন্নির কচি কলিজাটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। সামনে তাকিয়ে সে টোকাই ছেলেটাকে খোঁজে। ছেলেটা রাস্তার ওপারে নির্বিকার দাঁড়িয়ে ওই বোতলটি উপুড় করে দু-এক ফোটা কোমলপানীয় জিহ্বায় ঢালার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তিন্নি মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে দোকানটি পিছনে পড়ে যায়। তার সামনে এখন ওই টোকাই ছেলেটি। সে এক ফোঁটাও পানীয়ের স্বাদ নিতে পারেনি। তাই বোতলের মুখের ভিতর জিহ্বা লাগিয়ে চাটছে। এ দৃশ্য তিন্নি কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় সে। চোখ দু'টি তার ঝাপসা হয়ে আসে। হতবিহ্বল হয়ে পড়ে সে। কোন মতে পা দু'টিকে টেনে নিয়ে বাড়ির গেটে এসে হাজির হয় তিন্নি। তারপর দুদ্দাড় শব্দে থাপড়াতে থাকে গেটটার ওপর।

www.icsbook.info

আজব কাণ্ড

আহমেদ বায়েজীদ

'খুনটা হয়েছে গতকাল রাতে, বুঝলে জামাল!'

নিজের কাজে মগ্ন ছিল চন্দ্রদ্বীপ থানার হেড কনস্টেবল জামাল উদ্দিন। বুঝতে পারেনি ইন্সপেক্টর ইমতিয়াজের কথাটা। তাই আবার জানতে চাইল 'কী বললেন স্যার?'

'বাংলাতেই তো বলেছি! খুনটা গতকাল রাতে হয়েছে।' আবার বললেন ইন্সপেক্টর।

'কোন খুনটার কথা বলছেন স্যার?'

'তুমি যেটার আলামত সংগ্রহ করছো। এটা একটা মার্ডার কেস।' কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বললেন ইন্সপেক্টর।

কয়েক সেকেন্ড বসের দিকে চেয়ে থাকল জামাল, কিছু বলল না। তার

www.icsbook.info

স্যার কম কথার মানুষ। এরই মধ্যে কথাটা দু'বার বলেছেন। আবার জানতে চাইলে রেগে যাবেন; কিন্তু তার কথা মাথায় ঢুকছে না জামালের। এই সাতসকালে তারা এসেছে একটি দুর্ঘটনার খবর পেয়ে। পুকুরে পড়ে গেছে একটি প্রাইভেটকার। গাড়ির মধ্যেই পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ড্রাইভিং সিটে থাকা লোকটির। খবর পেয়ে থানা থেকে ইন্সপেক্টর ইমতিয়াজের সাথে পাঠানো হয়েছে জামালসহ তিনজন কনস্টেবলকে।

থানা সদর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বাড়িটি। মূলত একটি বাগান বাড়ি। ঢাকার ধনী ব্যবসায়ী কায়েস দস্তিদার কয়েক বছর আগে বাড়িটি কিনেছেন। গ্রাম হলেও এলাকাটির রাস্তাঘাট পাকা। বাড়িটাকে নির্জনই বলা চলে, আশপাশের বাড়িগুলোও একটু দূরে। তাই নিরিবিলি অবসর কাটানোর আদর্শ জায়গা। বাড়িতে একটা মাত্র পুরনো আমলের বিল্ডিং। সামনে একটা ছোট্ট মাঠ আর একপাশে পুকুর। দস্তিদার মাঝে মধ্যে দু-একদিনের জন্য আসেন বেড়াতে, কখনো পরিবার নিয়ে, কখনো বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। একটু আগে গাড়ি থেকে তারই লাশ তোলা হয়েছে।

গতকাল রাতেই বন্ধু খবির হোসেনকে নিয়ে এখানে এসেছেন দস্তিদার। সকালে দুর্ঘটনার খবর থানায় জানিয়েছেন খবির হোসেন। তার মতে, নাস্তা আনতে পার্শ্ববর্তী বাজারে যাওয়ার জন্য গাড়ি নিয়ে বের হয়েছিলেন দস্তিদার। খবির ঘরেই ছিলেন। পানিতে বড় কিছু পতনের শব্দ শুনে বাইরে আসেন। এসে দেখেন গাড়িসহ পানিতে পড়ে গেছেন দস্তিদার। নিজে সাঁতার না জানায় বন্ধুকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারেননি। তিনিই ফোন করেছেন থানায়।

ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা এসে লাশসহ গাড়ি উদ্ধার করেছে। ইন্সপেক্টর ইমতিয়াজ দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু তদারকি করছেন। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গাড়ি আর লাশ পরীক্ষা করেছেন ইন্সপেক্টর। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখতে চাইলেন। বৃদ্ধ কেয়ারটেকার তাকে নিয়ে গেল বিল্ডিংয়ের ভেতর। যাওয়ার আগে কনস্টেবল জামালকে আবারো বললেন, 'সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে টুকে নাও নোট বুকে। থানায় গিয়ে মার্ডার কেস ফাইল করতে হবে।'

জামালের মাথায় তালগোল পাকিয়ে গেছে ইন্সপেক্টরের কথায়। সে জানে ইন্সপেক্টর ইমতিয়াজ অপ্রয়োজনীয় কথা বলার লোক নয়। দুই বছর হলো মফস্বলের এই থানায় এসেছেন। তদন্ত কাজে তার মতো এত দক্ষ লোক আগে দেখেনি জামাল। সামান্য ক্লু থেকেও তিনি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব

www.icsbook.info

রহস্যের সমাধান করতে পারেন; কিন্তু কেন এমন অদ্ভুত কথা বলছেন মাথায় ঢুকছে না জামালের।

বেশি না মিনিট পনেরো সময় নিলেন ইন্সপেক্টর বাড়ির ভেতরটা দেখতে। বাইরে এসে বললেন, 'কায়েস দস্তিদারের সাথে যে লোকটি এসেছে সে কোথায়?'

'বন্ধুর মৃত্যুতে ভীষণ ভেঙে পড়েছে স্যার। ওই যে ওখানে'। হাত দিয়ে বাড়ির একটি অংশে দেখাল জামাল। গাছের নিচে চেয়ার পেতে বসে আছে খবির হোসেন। কয়েকজন গ্রামবাসী ঘিরে আছে তাকে। ইন্সপেক্টর বললেন, 'ওকে নিয়ে যেতে হবে আমাদের সাথে। সন্দেহভাজন খুনি।'

জামাল চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলো ইন্সপেক্টরের দিকে। বললো, 'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না স্যার। দুর্ঘটনা ঘটেছে আজ ভোরে। আপনি বললেন খুন, তাও নাকি হয়েছে গতকাল রাতে! আপনার মাথাটা কি ঠিক আছে স্যার!' বলেই জিবে কামড় দিলো। বুঝলো এবার তার খবর আছে; কিন্তু রাগলেন না ইন্সপেক্টর।

'দাঁড়াও বলছি।' এটুকু বলে থামলেন। যেন জামালকে ধোঁয়াশার মধ্যে রেখে মজা পাচ্ছেন তিনি। অন্য দু'জন কনস্টেবলকে ইশারায় খবির মিয়াকে আটক করতে বললেন। তারপর জামালের দিকে ফিরে বললেন, 'এখন কয়টা বাজে?'

'সোয়া নয়টা।' হাতঘড়ি দেখে বললো জামাল।

'গুড, কায়েস দস্তিদারের গাড়ির ড্যাশ বোর্ডের সাথে একটা ঘড়ি লাগানো আছে খেয়াল করেছো নিশ্চয়ই। গাড়িটা পুকুরে পড়ার পর পানি ঢুকে ঘড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে। ঘড়ির কাঁটাটা থেমে আছে দশটা পঁচিশ এর কাছে। তার মানে আজ ভোরে তো আর দশটা পঁচিশ বাজেনি এখনো, বেজেছে গত রাতে'।

'তাই তো!' মুখ হাঁ হয়ে গেছে জামালের। 'তাহলে কি স্যার, গাড়িটা পানিতে পড়েছে গতকাল রাত দশটা পঁচিশ বা তার কিছু আগে?'

'পড়েনি, গাড়িটাকে ফেলে দেয়া হয়েছে। পানি ঢুকে ঘড়ি নষ্ট হতে পাঁচ থেকে দশ মিনিট লাগতে পারে। তাই নয়টা ২০-২৫ এর দিকে গাড়িটাকে পুকুরে ফেলে দিয়েছে খুনি।'

'কিন্তু স্যার শুধু এইটুকু ক্লুর ওপর নির্ভর করে এতবড় একটা বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায়? ঘড়িটা আগে থেকেও তো নষ্ট থাকতে পারে।' জামালের

www.icsbook.info

কণ্ঠে সন্দেহ।

'তা পারে। তবে গাড়ির কাগজপত্র দেখেছি আমি, মাত্র চার মাস আগে কেনা হয়েছে ব্রান্ডনিউ প্রাইভেট কারটি। এমন নতুন আর দামি গাড়ির ঘড়ি নষ্ট থাকার কথা নয়। আরেকটা ক্লু বলি তোমাকে।' একটু থেমে আবার বললেন ইন্সপেক্টর- 'গাড়িটার গিয়ার নিউট্রাল করা ছিলো, সেটাও তুমি খেয়াল করোনি। চলতে গিয়ে গাড়ি পানিতে পড়লে ফ্রন্ট গিয়ারে থাকবে, নিউট্রাল করা থাকবে না নিশ্চয়ই! তার মানে হচ্ছে পুকুর পাড় পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গাড়িটা ঠেলে পানিতে ফেলেছে কেউ। ফেলে দেয়ার আগে দস্তিদারকে বসিয়ে দিয়েছে ড্রাইভিং সিটে। গিয়ার নিউট্রাল করা না থাকলে গাড়ি ঠেলে নেয়া যায় না সেটা তো জানো নাকি!।'

'তাই তো!' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে জামালের মুখ। 'কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব স্যার, দস্তিদার বাধা দেয়নি?'

'তাকে কোন কিছুর সাথে মিশিয়ে ঘুমের ঔষধ খাওয়ানো হয়েছিলো বলে ধারণা করছি। ঘরের ভেতর আলনায় ঝোলানো একটি স্যুটের পকেটে ঘুমের ঔষধ পেয়েছি আমি। এমন কিছু খুঁজতেই ঘরটা সার্চ করেছি। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এলে জানা যাবে দস্তিদারের মৃত্যু কখন হয়েছে এবং শরীরে ঘুমের ওষুধ ছিলো কি না। আসা করি তখন তোমার সব প্রশ্নের জবাব পাবে। আর এসব করার জন্য খবির হোসেন ছাড়া এখানে কাউকে দেখছি না।'

জামাল বললো, 'তার মানে হচ্ছে, গত রাতে খবির তার বন্ধুকে ঘুমের ঔষধ খাইয়ে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে গাড়িটা ঠেলে পুকুরে ফেলেছে! আর থানায় জানিয়েছে সকালে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতো মহা চালাক লোক।'

'যত চালাকই হোক, অপরাধীরা স্নায়ুর চাপে কিছু ভুল করে অপরাধের প্রমাণ রেখে যায়। প্রথমে গাড়ির ঘড়িটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছে। তারপর অন্যগুলো খুঁজে বের করেছি। আর বন্ধুর হাতে খুন হওয়ার ঘটনা তো নতুন কিছু নয়।'

'কী কারণ থাকতে পারে এই খুনের পেছনে, স্যার?'

'তা জানতে হলে দু'জনের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নিতে হবে। প্রয়োজনে ঢাকায় যেতে হবে তদন্তের কাজে। তোমাকেও যেতে হতে পারে আমার সাথে, প্রস্তুত থেকো।'

'ইয়েস স্যার!' বলেই ইন্সপেক্টর ইমতিয়াজকে স্যালুট করলো জামাল। চেহারায় একরাশ খুশি আর মুগ্ধতা।

www.icsbook.info

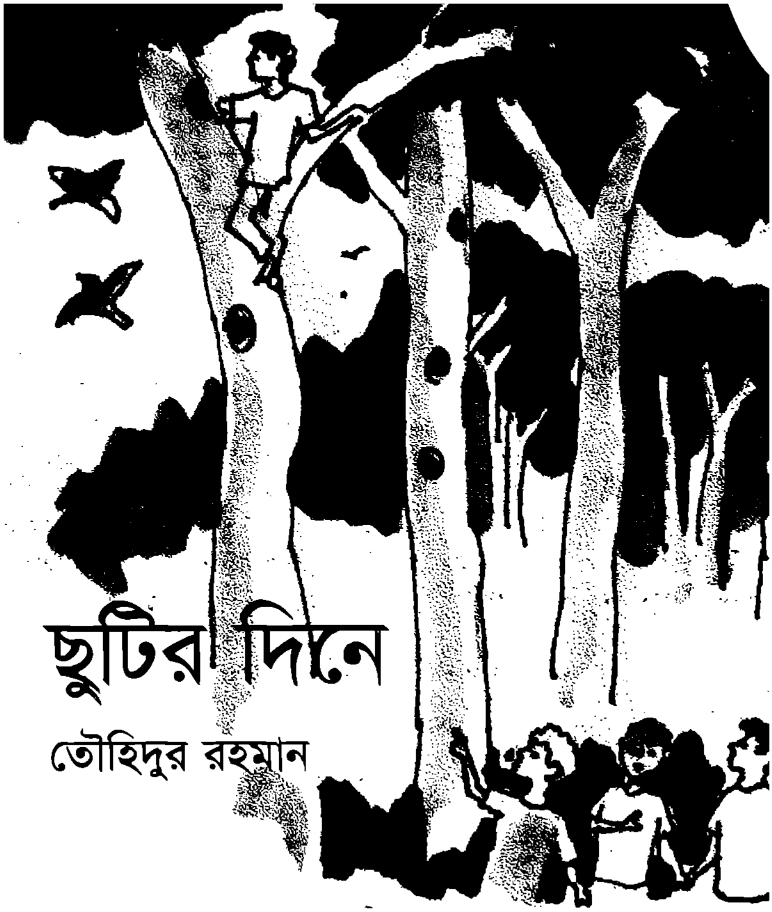

ছুটির দিনে

তৌহিদুর রহমান

রবিবারে স্কুল ছুটি। মানে সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সবাই হয়তো মনে মনে ভাবছো, দূর রবিবারে আবার স্কুল ছুটি থাকে নাকি, স্কুল তো ছুটি থাকে শুক্রবারে। সবার কথাই ঠিক। স্কুল তো ছুটি থাকে শুক্রবারে। তাহলে শোন, গল্পটা হচ্ছে আমাদের দাদাদের আমলের। তখন স্কুল রবিবারে ছুটি থাকতো। তখন হিন্দু-মুসলমান সবাই একসাথে থাকতো। একসাথে খেলতো। মানুষে মানুষে খুব মিল ছিল। কোনো বিভেদ ছিল না। মানুষ ছিল মানুষের জন্য। এটা সেই সময়কার গল্প।

সেদিন ছিল রবিবার। আর রবিবারে তো সবার স্কুল বন্ধ। সকাল বেলায় গাজিপাড়ার ছেলেদের সরদার ইউনুসের নেতৃত্বে একদল ছেলে টিয়ে পাখির

www.icsbook.info

বাচ্চার সন্ধানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। এ মাঠ সে মাঠ ঘুরে শেষে একটা বনে গিয়ে তারা পৌঁছল। সেই বনে ছিল অনেক বড় বড় গাছ। গাছে ছিল অনেক টিয়ে পাখির বাসা।

কিন্তু অতো বড় বড় গাছে ওঠা সহজ ছিল না। ইউনুস ছাড়া বাকিরা বেশ ছোট। গাছে চড়তে পারতো শুধুমাত্র ইউনুস। অতএব ইউনুসকে সবাই তোয়াজ-তোশামোদ করতো। জিয়াদ প্রথমেই ইউনুসকে পাঁচ পয়সা দিল। পাঁচ পয়সায় তখন অনেক কিছু কেনা যেতো। কামাল আগেই তাকে দু'পয়সার চিনাবাদাম কিনে দিয়েছিল। প্রশান্ত ও মান্নান ওয়াদা করেছিল যদি তাদেরকে টিয়ে পাখির বাচ্চা দেয়া হয় তবে আগামীকাল তারা তাদের বাড়ি থেকে ইউনুসের জন্য খেজুরের পাটালি গুড় এনে দেবে। এর বদলে ইউনুস তাদেরকে একটা করে টিয়ে পাখির বাচ্চা দেবে বলেছে। নাসিরের কাছে সে কোনো মূল্য চায়নি। তবুও নাসির তাকে কবুতরের একটি বাচ্চা দেয়ার লোভ দেখিয়েছে এবং এই কবুতরের বাচ্চার বিনিময়ে ইউনুসের পরেই সবচেয়ে সুন্দর টিয়ে পাখির বাচ্চাটা নাসিরকেই দেবে বলেছে। ইউনুসের নিজের পাড়ার ছেলে ছিল দু'জন। তাদের সাথে সব শর্ত সে আগেই পাকা করে নিয়েছিল। টিয়ে পাখির বাচ্চা কম-বেশি যাই পাওয়া যাক তা নিয়ে যেন আবার নিজেদের মধ্যে ঝামেলা না হয়।

পথে নাসির ইউনুসকে জিজ্ঞেস করলো, বাচ্চার সংখ্যা যদি কম হয় তাহলে?

না, এমন হবে না। ঐ বাগানের গাছে গাছে অনেক টিয়ে পাখির বাসা আছে। কেবল গাছে ওঠাই হলো একটা শক্ত কাজ। যদি কষ্ট-শিষ্ট করে একবার গাছে উঠতে পারি তবে টিয়ে পাখির বাচ্চার আর অভাব হবে না। ভাগ্যে থাকলে দু'একটা ধাড়িও ধরে ফেলতে পারি।

প্রশান্ত বলল, ওই গাছে ওঠা শুধু কঠিন নয়, মহাকঠিন একটা কাজ।

নাসির বলল, ইউনুস তুমি কিন্তু বলেছিলে কথা বলতে পারবে এমন টিয়ে পাখির বাচ্চাটি তুমি আমাকে দেবে।

হ্যাঁ, যদি দুটো পাওয়া যায়, তাহলেই একটা তোমাকে দেবো।

জিয়াদ বললো, তাহলে আমাকে দেবে না?

বাচ্চা যদি আরো বেশি পাওয়া যায় তাহলে তোমাকেও দেবো।

জিয়াদ বললো, ইউনুস! গাছে উঠে সমস্ত বাসা ভালো করে দেখবে কিন্তু। বাসার মধ্যে হাত দিয়ে দেখবে।

www.icsbook.info

দেখবো, কিন্তু যে টিয়ে পাখির গলায় লাল ডোরা কাটা থাকে তা বেশি একটা জন্ম হয় না।

কামাল বলল, বাসার মধ্যে হাত দেয়া কিন্তু খুবই বিপজ্জনক! কারণ শুনেছি টিয়ে পাখির বাসার মধ্যে সাপ থাকে। টিয়ে পাখির বাচ্চা খাওয়ার জন্য সাপ গাছে ওঠে। তারপর বাচ্চা বা ডিম যা পায় তাই খেয়ে বাসার মধ্যে চুপ করে বসে থাকে ধাড়ি এলে তা ধরার জন্য।

মান্নান বলল, তা ঠিক, তবে অতো বড় গাছে সাপ উঠতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।

প্রশান্ত বলল, দেখো ইউনুস! আমার কিন্তু একটা গলায় লাল ডোরা কাটা টিয়ের বাচ্চা চাই। এর বদলে আমি তোমাকে কালকে আরো দু'আনা দেবো এবং সাথে একটা বায়লাও উপহার দেবো।

নাসিরের উপস্থিতিতে জিয়াদ অন্য কাউকে খোশামোদ করবে এবং তোয়াজও করবে এটা তার কাছে মোটেই ভালো লাগছিল না। সে বললো, জিয়াদ! সে যদি তোমাকে গলায় লাল ডোরা কাটা টিয়ে পাখিটা না দেয় তাহলে আমি নিজে গাছে উঠে তোমাকে তা এনে দেবো।

ইউনুস বললো, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, তুমি ঐ গাছে উঠতেই পারবে না। তার গোড়া অনেক অনেক মোটা। যা ধরে গাছে ওঠা তোমার কম্ম নয়। কেবলমাত্র একটা ডাল আছে, লাফ দিয়ে ধরে যার গা বেয়ে ওপরে ওঠা যায়। কিন্তু তোমাদের কারোর হাত সেখান পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। সেই ডালে ওঠার জন্য আমারও তোমাদের সহযোগিতার দরকার হবে। দু'জনের ঘাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে তবেই আমি ডালটা ধরতে পারবো।

নাসির জিয়াদকে বললো, জিয়াদ! যদি তুমি লাল ডোরা কাটা টিয়ে পাখির বাচ্চা একটাও না পাও তাহলে আমি তোমাকে আমারটা দিয়ে দেবো। আমি না হয় সাধারণ একটা টিয়ে পাখির বাচ্চাই নেবো।

বনের মধ্যে চটকা গাছের নিচেই গিয়ে সবাই যার যার ব্যাগ মাটির ওপর রেখে দিল। নাসির ও কামাল ইউনুসকে সহায়তা করার জন্য পরস্পরের ঘাড়ে হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলো। অন্য একজন তাদের পাশে মাটিতে দু'হাত লাগিয়ে ঘোড়া হয়ে বসে পড়লো। ইউনুস তার পিঠে একটা পা রেখে অন্য পা কামালের কাঁধের ওপর রাখলো। তারপর আর একটা পা সে নাসিরের কাঁধের ওপর রেখে দিল। ইউনুসের ওজনের ভারে কামালের কোমর একদম বেঁকে যাচ্ছিল। কিন্তু নাসির তার হাত শক্ত করে ধরে

www.icsbook.info

রেখেছিল। তাই কোনো মতে সে রক্ষা পেল। না হলে কামালের কোমরটা হয়তো ভেঙেই যেতো।

কামাল ইউনুসের ভর একদম সহ্য করতে পারছিল না। সে বলছিল, ইউনুস, তুমি জলদি করে ডাল ধরো। আমি আর পারছিনে ভাই। আমি মরে যাচ্ছিরে বাবা! বড্ড চাপ পড়ছে। ওরে মারে কোমরটা বুঝি ভেঙেই গেল। আমি সরে গেলে তোমার বিপদ হতে পারে ইউনুস। সাবধান!

নাসির ও কামালের মাথায় হাত রেখে ইউনুস দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। সবেমাত্র সে গাছের ডালে হাত লাগাতে যাচ্ছিল এমন সময় কামালের পা পিছলে গেলো। কামাল নিজের জায়গা থেকে ছিটকে পড়ে গেলো। আর যায় কোথায়– ইউনুস পড়ে গেল ধপাস করে।

'ওরে বাবারে, মরে গেছিরে! কামালের বাচ্চা, কামাল! তুই....' ইউনুস নিজের কথা শেষ করার আগেই চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু পড়ে গিয়েই সে উঠে বসলো। অন্যরা অনেক কষ্টে নিজেদের হাসি চেপে রেখেছিল। ইউনুসের পরনের লুঙ্গি খুলে গিয়েছিল। এবার সেটাকে সে কষে পরে মালকোচা দিয়ে গিঁট বাঁধলো এবং দৌড়ে গিয়ে দু'হাতে কামালের কান ধরে টেনে মারলো একটা চড়।

নাসির দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে কামালকে ইউনুসের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললো, ইউনুস! এটা তোমার ভুল। তোমার ডাল ধরতে এত দেরি করা ঠিক হয়নি। যাকগে, এখন আমরা আবার তোমাকে কাঁধে তুলে নিচ্ছি এবং তুমি বেশি ভর আমার ওপর দেবে। কামালের ওপর কম ভর দেবে।

ইউনুস দ্বিতীয় বার সাহস করে এগিয়ে এলো। তবুও সে বললো, কামালের বাচ্চা, কামাল! এবার যদি তুমি আমাকে ফেলে দাও, তাহলে তোমাকে টিয়ে পাখির বাচ্চা তো দেবোই না এবং তোমাকে বিলের পানির মধ্যে নিয়ে চুবাবো, কথাটা মনে থাকে যেন।

এবার অবশ্য কামাল আগের বারের তুলনায় কোমরটা বেশ শক্ত করে দাঁড়ালো। এবার কোনো প্রকার বিড়ম্বনা ছাড়াই ইউনুস গাছের ডাল ধরে ফেললো এবং তড়াক করে গাছে উঠে পড়লো।

গাছের মাঝখানের ডালটি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মোটা ছিল। কিন্তু ইউনুসের ধারণা অনুযায়ী ঐ ডালের মাঝখানে অনেকগুলো টিয়ে পাখির বাসা ছিল। এর শাখা ডালগুলো চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এলোমেলোভাবে

www.icsbook.info

ছিল। ইউনুস ঐ ডালগুলোকে মই হিসাবে ব্যবহার করে মূল ডালের চারপাশে ঘুরপাক মেরে ওপরের দিকে উঠতে লাগলো।

মানুষের সাড়া-শব্দ পেয়ে একটা বাসা থেকে দুটো টিয়ে পাখি উড়ে চলে গেলো। ইউনুস খুশি হয়ে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণ তালাশ করার পর বললো এর ভেতর কিছুই নেই। মনে হয় বাচ্চা বড় হয়ে উড়ে গেছে। আরো ওপরে উঠতে হবে দেখছি।

নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেরা হতাশ হলো। জিয়াদ বললো, ইউনুস! ওপরে অনেকগুলো গর্ত আছে। ওগুলিতে নিশ্চয়ই গলায় লাল ডোরা কাটা টিয়ে পাখির বাচ্চা থাকবে। ভালো করে দেখো। গর্তে হাত দিয়ে দেখ। চেষ্টা করো।

পাশ থেকে নাসির জবাব দিল, জিয়াদ, তুমি চিন্তা করো না। টিয়ে পাখির বাচ্চা পাওয়া যাবেই যাবে। আর তা কম করে হলেও দশটা বারোটা তো হবেই।

হঠাৎ ইউনুছের পাশের একটা গর্ত থেকে দুটো টিয়ে পাখি উড়ে গেলো এবং এটা দেখে ইউনুস গর্তের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, ইউরেকা! হুররে! পেয়েছি, পেয়েছি! এই একটা, এই দুটো, এই তিনটে বাচ্চা পেয়েছি। ইউনুছ একের পর এক তিনটে বাচ্চা বের করে গাছের বড় ডালের ওপর রেখে দিল। তারপর বাচ্চাগুলোকে গভীরভাবে দেখে নিয়ে বললো, এদের মধ্যে কারোর গলায়ই ডোরা কাটা নেই। তা ছাড়া এই বাচ্চাগুলো এখনো অনেক ছোট। এদের পাখা এখনো ভালোভাবে গজায়নি। এখনো ডানা ঝাপটাতেও শেখেনি।

কয়েকজন ছেলে এগুলো নিয়েই ক্ষান্ত হতে চাচ্ছিল। কিন্তু জিয়াদ নিচে থেকে বললো, দেখো ইউনুস! ওই বাচ্চাগুলোকে ওখানেই রেখে দাও। আসলেই ওরা এখনো অনেক ছোট। এখন নিয়ে গেলে আমরা ওদের বাঁচাতে পারবো না।

জিয়াদের কথার পরে ইউনুস তিনটি বাচ্চাকে আবার বাসার মধ্যে রেখে দিল এবং বললো, আমি আরো ওপরের দিকে উঠে দেখছি। ওপরে অনেক বাসা আছে।

একটু ওপরে উঠে আরো একটা খোঁড়ল থেকে ইউনুস আরো দুটো টিয়ে পাখির বাচ্চা পেলো। কিন্তু দেখলো এদের কারোরই গলায় ডোরাকাটা হার নেই। তবুও এই বাচ্চাগুলো বেশ বড় ছিল। অনেকটা উড়োখোল হওয়ার

www.icsbook.info

পর্যায়ে। গাছের নিচে সবাই চৌকোনা করে চাদর মেলে ধরে দাঁড়িয়েছিল। নিচ থেকে সবাই চিৎকার করছিল, ইউনুছ, ওদেরকে এই চাদরের ওপরে ফেল।

ইউনুস কারো কথায় কোনো কান দিল না। সে বললো, এগুলোকে আমি আমার ঝোলার মধ্যে রেখে দিচ্ছি। এতো ওপর থেকে ফেললে মরে যেতে পারে। আমি ফেরার সময় এদেরকে নিয়ে যাবো। ওপরে আরো বাসা আছে। আমি আরো ওপরে উঠছি। ওগুলো দেখবো। তারপর পাশের ডালটাও দেখবো।

অনেক ওপরে গাছের চিকন একটা ডালে পৌঁছে ইউনুস আরো একটা টিয়ে পাখির বাসা দেখতে পেলো। সে ওপর থেকে চিৎকার করলো, নাসির! ওপরে ভালো করে তাকিয়ে দেখো, আমি যে ডালটায় বসে আছি এর মাথায় কোনো একটা বড় পাখির বাসা আছে বলে মনে হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছিনে ওটা কিসের বাসা!

নাসির কিছুক্ষণ মনোযোগ সহকারে দেখার পর বললো, আরে ভাই! ওটা তো অনেক বড় একটা বাসা দেখছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে ওটা হেড়েবাজের বাসা!

নিচ থেকে কামাল বললো, ইউনুস! আমার দাদী বলতেন, হেড়েবাজের বাসায় সোনা পাওয়া যায়।

পাশ থেকে নাসির বললো, আরে বাজে কথা, বাজ পাখি সোনা পাবে কোথায়? ওসব ফালতু কথা।

আমি সত্যিই বলছি নাসির! দাদী বলতেন, হেড়েবাজের বাসায় সোনা থাকে মানে সোনার হার থাকে।

নাসির বললো, যদি না থাকে তাহলে? তাহলে কিন্তু তোকে...। কথা শেষ করতে পারলো না নাসির।

কামালের কাছে এই কথার কোনো উত্তর ছিল না।

এবার জিয়াদ বললো, হ্যাঁ নাসির! কামাল ঠিকই বলেছে। বাজ পাখির বাসায় মাঝে মাঝে সোনা পাওয়া যায়। তুমি কি এই গল্প শোননি, ওই তো নীলকান্ত জমিদারের মেয়ে ছাদের ওপর গলার হার খুলে রেখে গোসল করছিল এবং বাসা বানানোর জন্য একটি বাজ পাখি তা ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গিয়েছিল? এরপর একজন লোক বনে কাঠ কাটতে গিয়ে হেড়েবাজের বাসা থেকে ওই সোনার হারটা পেয়েছিল। এ কথা জানাজানি হলে লোকটা হারটা

www.icsbook.info

নিয়ে জমিদারের কাছে গেলে জমিদার তাকে অনেক টাকা বখশিশ দিয়েছিলেন। তারপর তো লোকটা ধনী হয়ে গিয়েছিল। এ গল্প তো এই গ্রামের সবাই জানে।

এবার কামাল বললো, দেখলে তো আমি সঠিক বলেছি। আসলেই বাজপাখির বাসায় সোনার হার, সোনার চুড়ি এসব পাওয়া যায়। ভাগ্যে থাকলে আমরাও পেতে পারি।

নিচ থেকে জোরে চেঁচিয়ে নাসির ইউনুসকে বললো, দেখো ইউনুস! একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখো। হার বা চুড়ি পেয়েও যেতে পারো ইউনুস।

ইউনুস জিয়াদের বলা গল্পটা আগেই শুনেছিল। তার আর কোনো পরামর্শের প্রয়োজন ছিল না। ইউনুস তাড়াতাড়ি গাছের ওপরের দিকে উঠছিল। তার কাছে এখন গলায় লাল ডোরা কাটা টিয়ে পাখির চেয়ে সোনার হারের গুরুত্ব বেশি হয়ে উঠেছিল। সে ভাবছিল, যদি সোনা পাওয়া যায় তাহলে খুব বাহাদুরির একটা কাজ হবে। এখন সোনার হার পাওয়ার জন্য ইউনুস সব ধরনের বিপদের ঝুঁকি নিতে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্ট করে সে বাজপাখির বাসার কাছে গিয়েছিল। সে খুব সাবধানে বাজপাখির বাসায় হাত দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগে সে একেবারে বাসার কাছে গিয়ে হাত উঁচু করলো। আর যায় কোথায় অমনি বাসার ভেতরে ঘড়ঘড় একটা আওয়াজ হলো এবং মুহূর্তেই একটি বাজপাখি ইউনুসের মাথায় ঠোকর মেরে উড়ে পাশের ডালে গিয়ে বসলো। ইউনুসের মাথাটা বেশ জ্বালা করে উঠলো। সে কেবলমাত্র তার মাথায় হাত দিতে যাচ্ছিল এমন সময় হেড়েবাজটা আরেকবার শূন্যে উঠে গিয়ে আকাশে দু'একবার চক্কর মেরে উড়ে এসে এবার ইউনুসের মাথায় পাখিটার পাঁচ আঙুলের নখ বসিয়ে দিল। ইউনুস খুব জোরে জোরে হায়-হৈ করে পাখিটাকে হাত দিয়ে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগলো এবং দ্রুত নিচে নামতে লাগলো। কিন্তু পাখিটা উড়ে এসে তাকে বারবার ঠোকর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। পড়িমরি করে ইউনুস গাছের আগার চিকন বিপজ্জনক ডাল থেকে নেমে নিচের দিকে কিছুটা মোটা ডালে এসে পা রেখেছিল। কিন্তু এতক্ষণে মেয়ে পাখিটির ডাকাডাকি শুনে পুরুষ পাখিটিও কোথা থেকে ছুটে এলো। এখন দু'টি পাখি একযোগে বার বার ইউনুসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। তাদের ধারালো ঠোঁট ও পায়ের নখের আঘাতে ইউনুসের সদ্য

www.icsbook.info

নেড়া করা চকচকে মাথা ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল। এই কাণ্ড দেখে নিচে ইউনুসের সাথের ছেলেরা হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছিল। ইউনুস গাছের একটা ডাল ভেঙে হাতে নিয়ে যতদূর সম্ভব পাখিদের তাড়াতে চেষ্টা করছিল। আর নিচের সবার হাসি দেখে সে রাগে ফেটে পড়ছিল। সে গাছে বসে চিৎকার করে বলছিল, ওই কামালের বাচ্চা, কামাল! তোর দাদী বাজপাখির বাসায় সোনা রেখে গিয়েছিল, তাই না? দাঁড়াও আগে নিচে নামি তারপর... সে তার কথা শেষ করতে পারলো না, আবার দুটো বাজপাখি একসাথে উড়ে এসে তার মাথায় ঠোকর মারলো। গাছের ডালে বসে মারে বাবারে বলে চিল্লাছিল ইউনুস।

নাসির ওপরের দিকে তাকিয়ে বারবার চিল্লাচ্ছিল, ইউনুস! হেড়েবাজ, হেড়েবাজ, হেড়েবাজ! এলো, এলো, এলোরে, তোর মাথায় ঠোকর মারলোরে। নিচে কেউ হাসছিল, কেউ চিৎকার করছিল আবার কেউ ঝোপের আড়ালে গিয়ে চুপ করে বসেছিল।

আর গাছের ওপরে ইউনুস এক হাত দিয়ে ডাল ধরে নিচের দিকে নামছিল আর অন্য হাতে পাতাসহ ভাঙা ডাল ধরে রেখে তা দিয়ে পাখির নখ থেকে নিজের মাথা ও চোখ বাঁচানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। পাতাসহ গাছের ভাঙা ডাল সে ঢাল বানিয়ে নিয়েছিল। বাজপাখি যখন তার থেকে কিছুটা দূরে চলে যাচ্ছিল তখন সে দ্রুত কয়েক ধাপ নিচে নেমে আসছিল।

বাজপাখির গতিবিধি দেখে নিচে থেকে নাসির আবার চিল্লাচ্ছিল, ইউনুস সাবধান! বাজপাখি নামছে, আবার তোর মাথায় ঠোকর মারলোরে। সাবধান!

ইউনুস আল্লাহর দোহাই দিতে দিতে, চিৎকার করতে করতে বাজপাখির আঁচড়ে-ঠোকরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়িমরি করে গাছের নিচের একটা ডালে এসে ঝুলে পড়ে মাটির ওপর দিল একটা লাফ। তার মাথা থেকে তখন রক্ত ঝরছিল। এটা দেখে সবার হাসি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইউনুস কিছুক্ষণ নীরব হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকলো। একটু পরে উঠে বসে সবাইকে দেখতে লাগলো। মনে মনে সে কামালকে খুঁজছিল।

প্রশান্ত কালকেসন্দি গাছের পাতা হাতে ডলে তার রস ইউনুসের মাথার ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিচ্ছিল।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ইউনুস বললো, কামালের বাচ্চা, কামাল। তুইও

www.icsbook.info

হাসছিলি?

কামালের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ইউনুস চারপাশে তাকিয়ে একবার দেখে নিল। কামাল আগেই বিপদের আঁচ করতে পেরেছিল। তাই কামাল চুপিসারে সেখানে থেকে কেটে পড়েছিল।

প্রশান্ত রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো, আরে ওই তো কামাল গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে। সবাই উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, ওই তো ওই দিকে।

ইউনুস উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, কোথায়? কোন দিকে?

সবাই সমস্বরে চিৎকার করতে লাগলো, ওই যে ওই দিকে। তাকিয়ে দেখো! ধরো ওকে।

ইউনুস চিৎকার করলো, দাঁড়া, ওই কামালের বাচ্চা, দাঁড়া।

কিন্তু কামাল পড়ি কি মরি প্রচণ্ড বেগে দৌড়াচ্ছিল। এমনিতেই ইউনুসের একটা চড় খেয়ে তার কানটা তখনো গরম হয়েছিল। পেছনে সকলের ধর ধর, কামালকে ধর! চিৎকার শুনে কামালের বুক ধড়ফড়ানি খুব বেড়ে গিয়েছিল। ফলে দৌড়ানোর গতি আরো অনেক গুণ সে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার দৌড়ানোর গতি দেখে বোঝা যাচ্ছিল নিজের বাড়িতে পৌঁছানোর আগে আর সে পেছন ফিরে তাকাবে না।

সবাই হৈ হৈ, রৈ রৈ! কামালের বাচ্চা গেল কই? বলতে বলতে গ্রামের দিকে দিল দৌড়।

www.icsbook.info

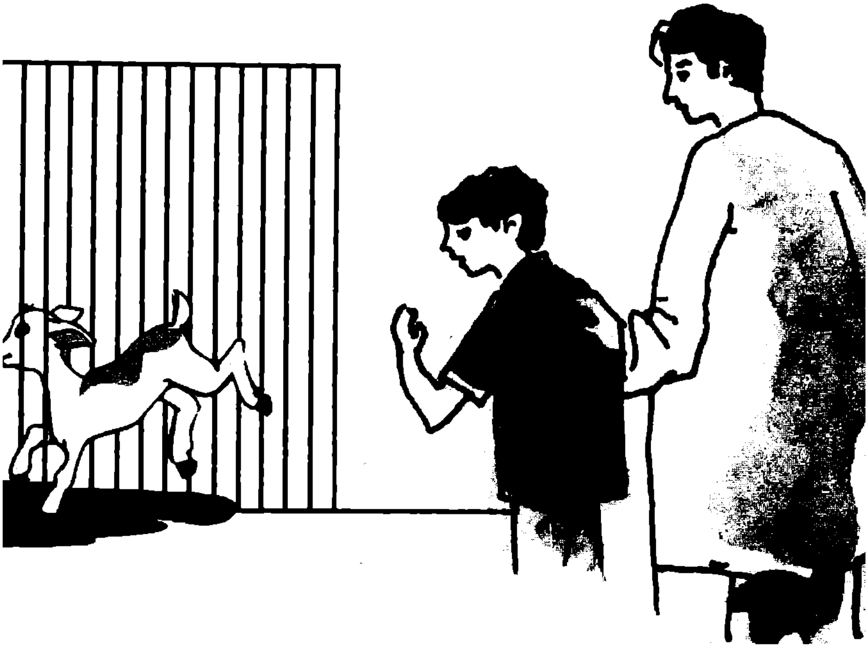

শহুরে এক ছাগলছানা

এ কে আজাদ

ছাগলের বাচ্চাটা কেবল ব্যা ব্যা করেই চলেছে। লোহার গ্রিলের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। সামনেই একটা বড় ছাগল ঘুরাঘুরি করছে। বাচ্চাটা ঐ ছাগলের কি না তা কে জানে? হয়তো তাই হবে।

– ছাগলগুলো ওখানে কী করছে? - বাবাকে জিজ্ঞেস করল আলকারীব।

– ওরা হয়তো খাবার টাবার খুঁজছে। আমরা বাজারে যাচ্ছি, চলো যাই। ওসব দেখে আমাদের কাজ নেই - কাটখোট্টাভাবে জবাব দিলেন বাবা।

আলকারীব চাচ্ছিলো- ওখানে একটু দাঁড়াবে। ছাগলগুলোকে দেখবে। ওরা কী করে? কোথায় থাকে? কী খায়? জানার আছে অনেক কিছু? কিন্তু কী করে? শহরে বেশি একটা ছাগল গরু দেখা যায় না। যা আছে তা ঐ

www.icsbook.info

শহরতলিতে। আশপাশে দু'একটা গরুর খামার যা আছে তাও আবার দেখতে যাবার সময় নেই। ছাগলের খামার নেই। তাই ছাগল বিষয়ে আলকারীবের কৌতূহল একটু বেশি। এই বার যেহেতু হাতের কাছে পাওয়া গেছে, সুতরাং কিছু জানা যাবে। কিন্তু বাবাটা যে কি! খালি বাজার আর হাবিজাবি কাজ নিয়েই ব্যস্ত। কিছু দেখতেই দিলেন না। হর হর করে টেনে নিয়ে গেলেন আলকারীবকে।

ছোট মানুষ। ছোট্ট হৃদয়। সেই হৃদয়ের কোণে হাজারও প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল। গেটের ওখানে তো ঘাস লতাপাতা কিছু নেই। তাহলে বাবা যে বললেন- ওরা খাবার টাবার খুঁজছে। কী খাবার খুঁজছে ওরা? খাবার যদি নাই থাকে তাহলে গ্রিলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কেন ছাগল দুটো? আর ক্ষুধা যদি লেগেই থাকে তাহলে সামনেই তো একটা আমগাছ আছে, ওখানে কিছু পাতাও পড়ে আছে, ওখানে গেলেই তো কিছু খাবার খেতে পারে। তাহলে ওখানে ঐ খট্‌খটে জায়গায়, ইট পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কেন? শিশু মনের এত সব প্রশ্নের উত্তর কোথায়? আর বাবাটাও যেন কেমন? চলছে তো চলছেই। কোন প্রশ্ন করার জো নেই।

যা হোক, বাজার শেষে বাসায় ফেরার সময় আলকারীব দেখলো সেই ছাগলের বাচ্চাটা রাস্তার পাশে সেই লোহার গ্রিলের সাথেই দাঁড়িয়ে আছে। ব্যা ব্যা করছে। আরেকটা বড় ছাগল তার গা শুঁকছে।

বাবা তো হন হন করে ছুটছে সুকুমার রায়ের সেই ছড়ার মতন - চলে হন্ হন্, ছোটে পন্ পন্। আলকারীব খপ করে ধরে ফেললো বাবার হাত-

– ও বাবা! বাবা! ওরা তো ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ওরা অন্য কোথাও যাচ্ছে না কেন?

বাবা ধমক দিলেন - ধুত্‌তুরি ছাই! চলো তো বাবা আমরা যাই।

– আচ্ছা বাবা! বড় ছাগলটা ঐ বাচ্চাটার গা শুঁকছে কেন? - আবার প্রশ্ন করে আলকারীব।

– ওটা যে ওর মা, তাই ওকে আদর করছে।

– তাহলে ওর মা ওকে নিয়ে যাচ্ছে না কেন? ঐ দিকে তো ঘাস আছে, পাতা আছে, আরও কত কি! ওগুলো খাওয়ালেই তো পারে?

বাবা কিছুটা বিরক্ত হলেন- চলো তো বাপু! ওসব গবেষণা করে তোমার কাজ নেই। ওরা ছাগল, ওদের কাজ ওরা করুক। আমাদের অনেক কাজ

www.icsbook.info

আছে, চলো।

কিন্তু আলকারীব নাছোড়বান্দা। হাঁটতে হাঁটতে আবার বাবাকে পেঁচিয়ে ধরে-

– ওরা ছাগল হলেও ওরা তো আমাদের অনেক কাজে আসে। ছাগল না থাকলে যখন দাদু আসবে তখন ছাগলের গোস্ত কোথায় পাবে? দাদু তো গরুর গোস্ত খান না। তা ছাড়া ছাগল অনেক শান্ত প্রাণী। কুকুর খারাপ। কিন্তু ছাগল তো ভালো। তাহলে ওদের দিকে খেয়াল করছ না কেন?

এইবার বাবা রাস্তার পাশে দাঁড়ান। আলকারীবের দিকে বিস্ময়ে তাকান। ছেলে তো ঠিকই বলছে। পশুপাখি তো আমাদের অনেক উপকারে আসে। তাই তো! ওদের প্রতি তো আমাদের খেয়াল রাখা উচিত। এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলেন-

– আচ্ছা বাবা! আমরা আগে বাসায় যাই চলো। তারপর ওদের বিষয় নিয়ে ভাবা যাবে। তোমার যত প্রশ্ন আছে, সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো। বাসায় চলো।

আলকারীব মাথা নেড়ে সায় দেয়।

– ঠিক আছে, চলো। কিন্তু বাসায় গেলে তুমি তো ভুলে যাবে। ঐসব পেপার-টেপার নিয়ে বসে পড়বে।

বাবা মুচকি হাসেন। ছেলেকে নিয়ে বাসায় রওয়ানা দেন। আলকারীব কিছুক্ষণ চুপ থাকে। বাবার পিছু পিছু হাঁটতে থাকে।

বাড়ির পাশেই বকশিবাজার। বাসা থেকে তিন-চার মিনিটের পথ। তাই আলকারীব হেঁটেই ওর বাবার সাথে বাজারে গিয়েছিল। শুক্রবার এলেই বাবার সাথে সে বাজারে যায়। বাজার শেষে বাসায় ফিরে গোসল করে। মসজিদে যায়, নামাজ পড়ে। নামাজ শেষে বাসায় আসে। সবার সাথে মজা করে দুপুরের খাবার খায়। মায়ের হাতে রান্না করা ফ্রাইডে স্পেশাল পোলাও। খুব মজা হয়। তাই তো সারা সপ্তাহ ধরে এই শুক্রবারের জন্য অপেক্ষা করে আলকারীব আর তার বোন মণি। আলকারীব নার্সারি ওয়ানে পড়ে, আর মণি পড়ে ক্লাস ফোরে।

দুপুরের খাবার শেষে একটু ঘুমিয়ে নেয় ভাইবোন মিলে বাবার সাথে। পড়ন্ত বিকেলে বাবা বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। আলকারীবও বাবার সাথে যাবার জন্য বায়না ধরে। বাবা নিতে চান না সাথে। কিন্তু আলকারীব

www.icsbook.info

নাছোড়বান্দা। অবশেষে ওকে নিয়েই বের হন বাবা। মোটরসাইকেলে বাবা ছেলে। রাস্তার পাশে খোরশেদ উকিল সাহেবের বাসার কাছে যেতে না যেতেই চিৎকার দিয়ে ওঠে আলকারীব।

– বাবা! বাবা! ঐ তো ছাগলের বাচ্চাটা! ও তো গেটের সাথেই দাঁড়িয়ে আছে। ও সারা দিন ধরে এখানেই আছে !

– এখন সময় নেই আব্বু! পরে আমরা ছাগল দেখব!

– ছেলের কথায় যেন গুরুত্বই দিলেন না বাবা।

ভোঁ ভোঁ করে পার হয়ে গেল ওরা। আলকারীবের ছোট্ট মনের উঠোন জুড়ে তখন উৎকণ্ঠা! কী হয়েছে বাচ্চাটার?

মিটিং শেষে সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরছে বাবা ও ছেলে। সেই খোরশেদ উকিলের বাড়ির কাছে আসতেই আবারও চিৎকার দিয়ে উঠলো আলকারীব।

– বাবা, বাবা! ঐ তো ছাগলের বাচ্চাটা ওখানেই আছে। ব্যা ব্যা করছে। ও মনে হয় কাঁদছে।

মোটরসাইকেল থামালেন বাবা। সত্যিই তো! সকাল থেকেই এই ছাগলের বাচ্চাটা লোহার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কেন? আর অনবরত ব্যা ব্যা করছেই বা কেন? কী সমস্যা হয়েছে ছাগলের বাচ্চাটার? উৎসুক হয়ে বাবার সাথে আলকারীবও গেল ছাগলের বাচ্চাটার কাছে। ওর কাছাকাছি যেতেই আরো জোরে ব্যা ব্যা করতে লাগল ছাগলের বাচ্চাটা। কিন্তু মাথাটা নাড়াতে পারছে না। হঠাৎ আলকারীব চিৎকার দিয়ে বলল-

– বাবা, গ্রিলের ফাঁকের মধ্যে ওর মাথাটা আটকে আছে।

– আরে! তাই তো! ব্যাপারটা কী?

তারপর ভালো করে বাবা ও ছেলে মিলে চেষ্টা করল ছাগলের বাচ্চাটার মাথা বের করার জন্য। বেশ বেকায়দাভাবে বাচ্চাটার মাথা আটকে গেছে। তারপর বেশ কসরত করে ছাগলের বাচ্চাটার মাথা বের করা গেল। বের করার সাথে সাথেই ছাগলের বাচ্চাটা মাথা নাড়তে লাগলো। মনে হলো দীর্ঘক্ষণ ধরে মাথা আটকে থাকায় বেশ কষ্ট পেয়েছে। ব্যা ব্যা করতে করতে আর মাথা নাড়তে ছাগলের বাচ্চাটা রাস্তা দিয়ে চলে গেল। বেচারা বেঁচে গেল!

আলকারীব বলল- দেখেছো বাবা, আমি বলেছিলাম না ও একটা সমস্যায় এখানে আটকে গিয়েছিলো। তুমি তো কোনো কথাই শুনলে না। সেই সকাল থেকেই বাচ্চাটা কষ্ট পাচ্ছিল, আর তুমি গুরুত্বই দিলে না।

www.icsbook.info

তোমার জন্যই সারা দিন কষ্ট পেল ছাগলের বাচ্চাটা!

ছেলের কথায় আলকারীবের বাবা লজ্জা পেলেন- তাই তো! অনুশোচনা হলো তার- আহারে! ছেলের কথা যদি সকাল বেলা শুনতাম তাহলে ছাগলের বাচ্চাটার কষ্ট কম হতো। সে সারাদিন না খেয়েও থাকত না।

আলকারীব বলল- বাচ্চাটা সারাদিন না খেয়েছিল। ওর খুব কষ্ট হয়েছে তাই না আব্বু?

বাবা মাথা নেড়ে সায় দিলেন ছেলের কথায়। এবার বাবা ছেলে মিলে গবেষণায় লেগে গেল কিভাবে ছাগলের বাচ্চাটা আটকে গিয়েছিল।

গ্রিলের গেটের ওপারে সামান্য কিছু ঘাস জন্মেছিল, একটি ক্ষুধার্ত ছাগল ও তার বাচ্চা ঘাস খাওয়ার আশায় গ্রিলের ফাঁকের মধ্যে মুখ ঢুকিয়েছিল। তখন বাচ্চাটির মাথা গ্রিলের মধ্যে আটকে গিয়েছিল। লোহার গ্রিলের ফাঁকাগুলো এমন ছিল যে উপরের অংশটা একটু বেশি ফাঁকা হলেও নিচের দিকে একটু বেশি চাপা। ক্ষুধার্ত ছাগলের বাচ্চাটা পা একটু উঁচু করে গ্রিলের ফাঁকে মুখ ঢুকিয়েছিল ক্ষুধার্ত পেটে একমুঠো ঘাস দেবে বলে। কিন্তু বিধি বাম, যেই মুখটা একটু নিচু করেছে, ওমনি গ্রিলের ফাঁকের মধ্যে মাথাটা আটকে গেছে। পা দুটোও তখন মাটিতে, ফলে বাচ্চাটা আর মাথা বের করার মতো বুদ্ধি এবং শক্তি কোনটাই পায়নি। আর প্রাণী হিসেবেও ছাগলের বুদ্ধি কম, তার ওপর আবার বেকায়দা জায়গা ।

আলকারীব প্রশ্ন করে- আচ্ছা বাবা, তুমি তো ছোট বেলায় ছাগল চরাতে, তাই না? তোমাদের তো অনেক ছাগল ছিল।

বাবা উত্তর দিলেন- হ্যাঁ বাবা, আমাদের ৩২টি ছাগল ছিল। আমি ঐ ছাগলগুলোকে নিয়ে মাঠে যেতাম, ঘাস খাওয়াতাম, দেখাশুনা করতাম। আর ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে খুব আদর করতাম। আমি যখন ওদের আদর করতাম তখন ওরা খুব আনন্দিত হতো। ওরা খুশি হয়ে নাচানাচি করত। বাচ্চাদের আনন্দিত মুখ যদি তুমি দেখতে তাহলে খুব মজা পেতে।

– তাহলে তুমি এই ছাগলের বাচ্চাটার কষ্ট বুঝতে পারলে না কেন? পাল্টা প্রশ্ন করে আলকারীব।

লজ্জা পেল বাবা। বাবা কোনো উত্তর দেন না। মনে মনে ভাবেন - এই শহরের ব্যস্ত জীবনে মানুষের বাচ্চার খোঁজ-খবরই তো রাখতে পারি না, আর ছাগলের বাচ্চার খবর রাখবো কিভাবে? গ্রামের মানুষেরা কতো

www.icsbook.info

আন্তরিক! প্রতিবেশী প্রত্যেক বাড়িরই খবর রাখে তারা। একে অন্যের বিপদে ছুটে আসে। এক গ্রামের মানুষ আশপাশের আরও দু'চার গ্রামের মানুষদের চেনে। খোঁজখবর রাখে। আর শহরের মানুষ একই বিল্ডিংয়ের অন্য ফ্ল্যাটের লোকদেরকে চেনে না, একে অপরের সাথে পরিচিত হয় না, কথা হয় না, হয় না কোন আন্তরিকতা। একজনের ঘরে দিনের আলো ঝলোমল, পাশের বাড়ির লোকের ঘরে অন্ধকার। সে অন্ধকার এতই সীমাহীন যে, কেউ সে অন্ধকারের কোন খবরও রাখে না। আর একটা ছাগল কোথায় আটকা পড়ল, কি মারা গেল তা দেখার মতো ফুরসত কোথায়?

বাবার চিন্তায় ছেদ পড়ে ছেলের প্রশ্নে- বাবা এই ছাগলদের কি মালিক নেই? ওরা ছাগলের খেয়াল রাখে না কেন?

– কি জানি বাবু! হয়তো আছে। কিন্তু ছাগলের খোঁজ নেয়ার মত সময় কোথায় তাদের? আনমনা ভাবে উত্তর দেন বাবা।

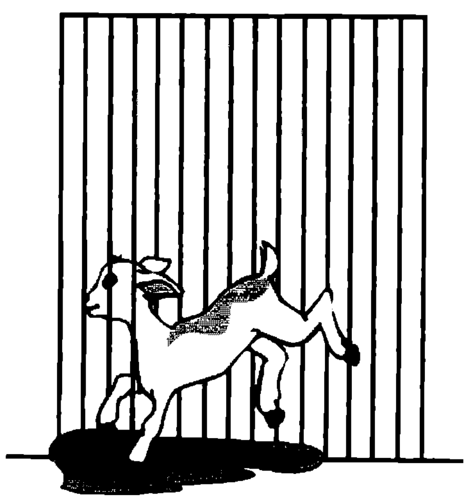

www.icsbook.info

নানুর যুদ্ধ জয়ের গল্প

আবদুল ওহাব আজাদ

নেহাল স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখলো, তার জুলিয়েট চুপচাপ, কেবল ঝিমুচ্ছে, অন্যদিন হলে তার মুখে নেহাল নেহাল খই ফুটতো। জুলিয়েট তার টিয়া পাখির নাম। নেহালের আরো একটি শালিক ছানা আছে। তার নাম রোমিও। ছোট মামার ইচ্ছাতেই প্রেমের উপাখ্যানকে মূল্য দিতে এ রকম নামকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোমিও জুলিয়েটের বিভিন্ন ধরনের ডাকাডাকিতে সারা বাড়ি সারাক্ষণ সরগরম থাকে।

ধীর পায়ে নেহাল জুলিয়েটের খাঁচার পাশে গিয়ে বলল, 'জুলিয়েট, কথা বলছো না কেন? কী হয়েছে তোমার?' জুলিয়েট ভাঙা গলায় কী যেন বলতে চেয়েও পারলো না। স্বরটা ভাঙা ভাঙা, আম্মা এসে দেখলেন, নেহালের মন খারাপ। রোমিও-জুলিয়েটের কিছু হলে নেহালের অবস্থাও স্বাভাবিক থাকে না। নেহাল আম্মাকে বলল, 'জুলিয়েটের কী হয়েছে আম্মা, জুলিয়েট কথা বলছে না কেন?

আম্মা বললেন, 'হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়েছে তো, হয়তা শরীর খারাপ করেছে। যাও স্কুলড্রেজ ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে খেতে এসো।'

নেহাল জুলেয়েটের পাশ থেকে নড়লো না। আম্মা কিছুটা বিরক্ত হয়ে

www.icsbook.info

বললেন, 'সামনে তোমার ফাইনাল পরীক্ষা, এভাবে জুলিয়েটের জন্য চিন্তা ভাবনা করলে তুমিও অসুস্থ হয়ে পড়বে।' নেহাল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল,

'আমার কিছু ভালো লাগছে না মা, আমার খেতেও ইচ্ছে করছে না।'

আম্মা একটু ম্লান হেসে বললেন, অত চিন্তা করো না নেহাল, তোমার জুলিয়েটের চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, আর তা ছাড়া তোমার মন ভালো করার লোকটি কিন্তু এখন আমাদের বাড়িতে। নেহাল অনেকটা সহাস্যে বলল, 'কে এসেছে আম্মা, নানু ভাই বুঝি?'

আম্মা অনেকখানি হেসে বললেন, 'এই তো ঠিক ধরেছ, যাও আর দেরি না করে খেতে এসো, তারপর নানু ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করবে।

নেহাল অনেকখানি স্বাভাবিক হলো, নানু ভাইয়ের সঙ্গে নেহালের অনেক ভাব, নানু ভাই অনেক মজার মজার গল্প বলতে পারে। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে নানু ভাইয়ের বিছানার পাশে গেল নেহাল, নানু তখন কিছুটা বিশ্রামে ছিলেন, নানুর গায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নেহাল বলল,

'কখন এসেছ নানু ভাই।'

নানু নেহালকে ছোট্ট করে আদর করে বলল, এইতো কিছুক্ষণ আগে নানুভাই।

নেহাল কথার রেশ না কেটেই বলল, 'তুমি আসবে তো আমাকে আগে জানাওনি তো নানু ভাই?'

নানু ভাই বলল, 'তোমাকে একেবারে চমকে দেবো বলে বিষয়টি জানানো হয়নি বুঝলে?'

নেহাল নানুর হাত ধরে টেনে তুলে বলল, 'ভালো হয়েছে এখন নদীর ধারে বেড়াতে যাবো চলো। আজ কিন্তু আমাকে অনেক মজার মজার গল্প বলতে হবে।

নানু নেহালের পিঠ চাপড়ে বলল, 'হ্যাঁ নানু ভাই, আজ আমি তোমাকে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গল্পটি শোনাবো।'

নানু ধড় ফড় করে উঠে বসলো, আম্মা চা-নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, তোমরা বের হচ্ছো, আর কখন ফিরবে তার ঠিক নেই, চা নাস্তা করে যাও।

চা নাস্তা সেরে নানু পাঞ্জাবিটা গায়ে ঢুকিয়ে নিলো। গলায় মাফলার জড়িয়ে নিতেও ভুল করলো না নানু ভাই। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আম্মা এসে বললেন, 'হঠাৎ কিন্তু খুব ঠাণ্ডা পড়ছে, তোমরা যেন বেশি দেরি করো না, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসবে, নেহাল নানু ভাইয়ের হাত ধরে বাড়ি থেকে বের

www.icsbook.info

হলো।

একটা বিল পার হলেই বেতনার নদী। নদীর দুই পাশ দিয়ে বাবলা গাছের সারি, মাঝে মাঝে দু-একটি বটের চারা শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে, কখনো বা দুই একটি বকের সারি নীল আকাশ সাদা করে উড়ে যাচ্ছে।

নেহাল বেতনার ভেড়ি বেয়ে নানুর হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'নানু ভাই তুমি তো ডাক্তার, দাও না আমার জুলিয়েটের রোগটা ভালো করে?'

নানু নেহালের মুখ চেপে ধরে বলল, ছিঃ নানু ভাই ওভাবে বলতে নেই, রোগ ভালো করার কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই, সব ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। তবে হ্যাঁ হোমিওপ্যাথিতে পশু পাখির ভালো চিকিৎসা আছে।

নেহাল বলল, 'তবে সেই চিকিৎসার ব্যবস্থাটি করো নানু ভাই।' নানু নেহালের পিঠ চাপড়ে বলল, 'তুমি কোন চিন্তা করো না, নানু ভাই, যাওয়ার পথে বাজার থেকে সেই ঔষধটি কিনে নিয়ে যাবো।'

নেহাল এবং নানু ভাই বটের চারার নিচে গিয়ে বসলো। গোড়াটা পাকা করা, তাই বসতে অসুবিধা হলো না ওদের। নেহাল নানুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, এবার সেই গল্পটি বলো নানু ভাই,

– নানু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল,

গল্পটি শুনবে তাহলে? শোন তবে, এটি আমার জীবনের গল্প, আমার যুদ্ধজয়ের গল্প। নানুভাই ফিরে যায় উনিশ শত একাত্তর সালে। নানুর কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে, স্মৃতিতে ভেসে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো। যা নানু ভাইয়ের জীবনে ঘটেছিল। নানু ভাই বলতে শুরু করলো, 'আমি তখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, আমি যুদ্ধে যাবো, আমার আব্বা যুদ্ধে যেতে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন, আমি তার কথা অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে গেলাম।

নেহাল বলল, 'তখন তোমার বয়স কত হবে নানু ভাই?'

নানু ভাই জবাবে বলল–'কত আর হবে; ষোলো না হয় সতেরো; গল্পটা মন দিয়ে শুনবে কেমন? নেহাল মাথা নাড়লো।

নানু ভাই আবার বলতে শুরু করলো, 'তখন শ্রাবণ মাস, বর্ষার মৌসুম, মাঠ ঘাট পানিতে থই থই করছে, বিলের মধ্য দিয়ে কাঁচা-পাকা রাস্তাটি জেলা শহরের সঙ্গে মিশেছে।

আমরা সংবাদ পেলাম, এ পথ দিয়েই খান সেনারা আসবে। আমরা চল্লিশজনের একটি টিম নিয়ে ফটকের বিলে অবস্থান করতে লাগলাম। ভয়ও করছিল প্রচুর। খান সেনারা গুলি ছুড়তে ছুড়তে সামনে এগিয়ে আসছে।

www.icsbook.info

আমাদের কমান্ডার আরিফ হাসান বললেন, কোন রকমে পিছপাও হওয়া যাবে না। আমাদেরকে বিলের মধ্যে গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে থাকতেই হবে এবং খান সেনাদের ফলো করতে হবে। ব্যস যেই কথা সেই কাজ, আমরা তাই করলাম, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অনেক...। নেহাল বলল, কী সমস্যা নানু ভাই। নানু ভাই বলল, সমস্যার কি শেষ আছে নানু ভাই। পানিতে পচা লাশের গন্ধ, সাপ-পোকের ভয়, মাঝে মাঝে গুলির শব্দ, চারিপাশ থেকে আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে গ্রামে গঞ্জে খান সেনাদের অত্যাচার।

আমরা তখন শাহবাজপুর গ্রামের একটা বিলে অবস্থান করছি। মিলিটারিরা গ্রামে পৌঁছেছে এই মেসেজ পেয়ে আমরা একটু উঁচু জায়গায় ঝোপের ভেতর অবস্থান নিলাম; কিছুক্ষণের মধ্যে তিনখানা মিলেটারির গাড়ি শাহবাজপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়লো। আমরাও পজিশন নিয়ে থাকলাম। ওরা ঝোঁপঝাড় দেখলে নির্বিচারে গুলি চালাতো। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে ওরা গুলি চালাতে শুরু করলো। আমার সহকর্মী মিজানের পায়ে একটি গুলি লাগলো। মিজান চিৎকার করে উঠলো। কমান্ডার বললেন, ওর মুখ চেপে ধরো, যেন চিৎকার করতে না পারে। কমান্ডার আমাদের গুলি চালাতে দিলেন না। হয়তো তার কোন নতুন মতলব ছিল। ওরা আজ গ্রামে আসবে এবং এই পথ দিয়ে জেলা শহরে প্রবেশ করবে এ সংবাদও কমান্ডার জানতেন। শাহবাজপুর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে হায়াতপুর ব্রিজ। কমান্ডারের নির্দেশে একটি দল সেই ব্রিজ মাইন মেরে উড়িয়ে দিল। খান সেনারা আর এগোতে পারলো না। সেখানেই ওদের গাড়ি থেমে গেল। পেছন থেকে আমরা এগোলাম, চারিপাশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা জড়ো হলো, এবার আমরা এক সঙ্গে অ্যাটার্ক করলাম খান সেনাদের ওপর। ওরাও গুলি ছুড়লো কিন্তু পারলো না। আমাদের বিভিন্ন রকম যুদ্ধেরকৌশলের কাছে ওরা হার মানলো। কয়েকজন খান সেনা আমাদের গুলিতে নিহত হলো। আর শেষে ওরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। আরো যে কত ঘটনা ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তা বলে শেষ করা যাবে না নানু ভাই।

নেহাল বলল, 'এই জন্যই তো তোমরা দেশের শ্রেষ্ঠসন্তান নানুভাই।'

নানুভাই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঐ টুকুই আমাদের পরম পাওয়া, ঐ টুকুই আমাদের সান্ত্বনা।'

নেহাল নানু ভাইকে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরলো তখন অনেক রাত। তারপরও নেহাল জুলিয়েটের ক্ষীণ স্বরে ডাক শুনতে পেল– নেহাল নেহাল।

www.icsbook.info

বাবা ফিরে আসেনি

আবদুস সবুর খান

আমাদের ক্লাসে নতুন একটা ছাত্র এসে ভর্তি হয়েছে। নাম দিপু। খুব নম্র ও ভদ্র। সবসময় কম কথা বলে। কম হাসে। তার চেহারার মধ্যে কেমন যেন বিষণ্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হয় সবসময়। কী যেন একটা তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। আমার একটা স্বভাব আছে। স্কুলে নতুন কোনো ছাত্র ভর্তি হলে তাকে আমি বন্ধু বানিয়ে ফেলি। তাই দিপুকেও অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু বানিয়ে ফেলেছি আমি। আমিই তার সাথে এখন সবচেয়ে বেশি চলাফেরা করি। তার সাথে চলাফেরা করতে গিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। তাকে কেউ তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে সে কোনো উত্তর দেয় না। বরং মন খারাপ

www.icsbook.info

করে। তার বাড়িতে একদিন সে আমাকে নিয়ে যায়। সেখানে তার বড় ভাই ও মাকে দেখেছি। কিন্তু তার বাবাকে দেখিনি। সে মন খারাপ করবে বলে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তারা আমাকে কমল বাবু বলে ডাকেন। আমার নাম কমল হোসেন।

একদিন ক্লাসে গণিত শিক্ষক আমজাদ স্যার দিপুকে তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করে বসেন। বলেন, তোমার বাবা কী করে? দিপু নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো উত্তর দেয় না। স্যার কী যেন একটা আন্দাজ করে তাকে বসিয়ে দেন। সেদিন স্কুলে সে সারাক্ষণ মন খারাপ করে বসেছিল। আমি তাকে হাসাবার চেষ্টা করেছি। সে হাসেনি। ক্লাসের সহপাঠীরা তাকে তার বাবার ব্যাপারে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে সে অনেক মন খারাপ করে। মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে পানি বের হওয়ার উপক্রম হয়।

আমি একদিন বিকেলে দিপুর বাসায় যাই। গিয়ে দেখি দিপু ঘরে নেই। তার মা আমাকে বললেন, কমল বাবু দিপু বাইরে ঘুরতে গেছে। মনটা নাকি ভীষণ খারাপ। আমি দিপুদের বাসা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসি।

দিপুকে খুঁজতে থাকি। হঠাৎ দেখি দিপু একটা আমগাছের নিচে বসে কাঁদছে। আমি তার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসি। তাকে জিজ্ঞেস করি, কাঁদছ কেন দিপু? দিপু আমার দিকে তাকায়। তারপর বলে, ক্লাসের সবাই আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করে। আমি কিভাবে তার উত্তর দেবো? আমার বাবা যে এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। তার কথা মনে করলে আমার কান্না পায়।

আমি বলি, তোমার বাবা মারা গেছেন? বিস্ময়ে প্রশ্ন করি। সে বলে, হ্যাঁ। সে অনেক কাহিনী। দিপু কাঁদতে কাঁদতে তার আব্বার কথা আমাকে বলতে লাগল।

১৯৭১ সাল। গণ-আন্দোলনে উত্তাল সারাদেশ। পাক সেনারা এ দেশের মানুষের ওপর পৈশাচিক আচরণ শুরু করেছে। চারদিকে শুধু পাক সেনাদের নির্মমতার হাহাকার। তারা গ্রাম পুড়িয়ে শহর গুঁড়িয়ে লাখ লাখ বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে ফেলছে। পাক সেনারা আমাদের গাঁয়ে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গুলি করে মেরেছে। এ জন্য গ্রামের সবাই এক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যে করেই হোক এর প্রতিশোধ নিতে হবে। আমাদের গ্রামের সবাই প্রস্তুত হয় যুদ্ধ করার জন্য। আমার বাবাও তৈরি হন আমাদের মায়া ছেড়ে। আমার বাবা যুদ্ধে চলে যাবার দিন আমাকে কোলে তুলে চুমু খান। আমি

www.icsbook.info

তখন ছোট। বাবা আমাকে বলেন, আমি চলে যাচ্ছি সোনা। তোমার জন্য অনেক বেলুন নিয়ে ফিরে আসব। আমি বুঝতে পারিনি কিছু। বেলুন আমার খুবই প্রিয় ছিল। তাই বাবার মুখে বেলুনের কথা শুনে সেদিন ফ্যাল ফ্যাল করে হেসেছিলাম। বাবা মাকে বলে যান, ছেলে দুটোকে মানুষের মতো মানুষ করবে। বাবার একটা ছোট্ট গোপনীয় ঘর ছিল। বাবা সেটাতে তালা দিয়ে মায়ের হাতে চাবিটা তুলে দেন। তিনি বলেন, আমি ফিরে এসে ঘরের তালাটা খুলব। এরপর বাবা চলে যান।

দিন যায়, মাস যায়। বাবা ফিরে আসেন না। আস্তে আস্তে দীর্ঘ ৯ মাস কেটে যায়। বাবা তবু ফেরেন না। দেশ স্বাধীন হলে আমাদের গাঁয়ের একজন এসে বলে, আমার বাবা পাক হানাদারদের বুলেটের আঘাতে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। এইটুকু বলে দিপু জোরে চিৎকার করে বলে, বাবা ফিরে আসেননি।

বাবা আমার জন্য বেলুন নিয়ে ফিরে আসেননি।

আমিও দিপুর কান্না দেখে কেঁদে ফেললাম। দিপু আবার বলে, মা অনেক কষ্টে বড় ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। এখন আমাকেও স্কুলে পড়াচ্ছেন। সে একটু থেমে থাকে। পরে আবার বলে, বাবার ঘরটাতে এখনও তালা ঝুলছে। বাবা ফিরে এসে আর এ তালা খুলতে পারবেন না। হয়তো চিরকালই এ ঘরটা তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকবে।

আমি দিপুকে বললাম, দিপু কেঁদো না। তোমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। এ দেশের গর্ব। দিপু বলে, হ্যাঁ। আমি চাই বাবার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশের জন্য মরতে। দেশের সেবা করে আমি আমার জীবনকে ধন্য করতে চাই।

মানুষের মতো মানুষ হতে চাই। এতেই আমার বাবার স্বপ্ন পূরণ হবে। আল্লাহ আমাকে সেই তাওফিক দান করুক। দিপু আকাশের দিকে দু'হাত উঁচু করে ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।

www.icsbook.info

স্বাধীনতার গল্প

তোফাজ্জল হোসাইন

ছোটমামা, আজ কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের গল্প বলতে হবে- বীথি ও আল আমিনের আবদার শুনে হাসলেন ছোটমামা আবু আবদুল্লাহ। একটু অবাকও হলেন। যে সময়ে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবই, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের বাইরে অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে পারে না, সে সময়ে ওরা দেশ নিয়ে ভাবছে। মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে চাচ্ছে। ছোটমামা থাকেন ঢাকার চকবাজারে। তিনি কেবলমাত্র বাংলাদেশের স্বনামধন্য একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করেছেন। কোথাও বেড়াতে গেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গল্প শোনার জন্য চেপে ধরলে বাধ্য হয়ে তিনি শুনাতে থাকেন নতুন যুগের নতুন সেনাপতিদের গল্প। ঢাকা থেকে বাড়িতে এলে বোনদের বাড়িতে বেড়াতে

www.icsbook.info

যান। ছোট বোনের সন্তান দু'টি। বড় মেয়ে বীথি আর ছোট ছেলে আল আমিন। দু'জনই খুব মেধাবী। তারা নিজ নিজ ক্লাসে শ্রেষ্ঠ। তাদের স্বপ্ন মুক্তিযোদ্ধারা যেমনি এই দেশকে নিজেদের রক্ত, শ্রম ও দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন করেছিলেন তেমনি তারাও এই দেশকে একটি সোনার বাংলা রূপে গড়ে তুলবে। মার্চ মাস। স্বাধীনতা ঘোষণার মাস। পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেল সবগুলোতে মহান স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বীথি ও আল আমিন মাঝে মাঝে চ্যানেল খুলে একটু আধটু দেখে। এ মাসে ছোটমামা তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসায় স্বাধীনতাযুদ্ধের গল্প শোনার জন্য চেপে ধরেছে। তাদের চাপাচাপিতে স্বাধীনতাযুদ্ধের সঠিক গল্প তুলে ধরলেন মামা। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশকে শাসন করত ব্রিটিশরা। তাদের থেকে স্বাধীন হয় ভারত ও পাকিস্তান। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান এবং হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ভারত। পাকিস্তানের দু'টি অংশ, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব অংশ পশ্চিম অংশের তুলনায় নানাভাবে বঞ্চিত হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিরা বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। এ দেশের ধন-সম্পদ তারা কুক্ষিগত করে। আর এরই প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে আপামর জনসাধারণ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস স্বাধীনতাযুদ্ধ স্থায়ী হয়। অবশেষে যুদ্ধে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামক একটি ভুখন্ডের সূচনা হয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা, নারী-পুরুষ তথা আপামর জনসাধারণ। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো আমাদের লাল-সবুজের পতাকা। যুদ্ধের গল্প শুনতে শুনতে আল আমিন বলল, 'আচ্ছা মামা, মুক্তিযুদ্ধ আর হবে না?' মামা প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, মুক্তিযুদ্ধ কখনো শেষ হয় না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও শেষ হয়নি। আমাদের অনেক অর্জন থাকলেও সকল স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এখনও অনেকে প্রতিদিন দুইবেলা আহার পায় না। এখনও সবাই পড়ালেখা করার সুযোগ পায় না। অনেকে ফুটপাথে ঘুমায়, এখনও সকল মানুষের মুখে হাসি ফোটেনি। বীথি বলে

www.icsbook.info

উঠল, 'মামা, আমরা ছোট, আমরা কিভাবে যুদ্ধ করব?' মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'আমাদের দেশ গঠনের যুদ্ধে সবাই ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা যদি আমাদের টিফিনের টাকা থেকে টাকা বাঁচিয়ে অল্প অল্প করে জমিয়ে ক্লাসের যে ছাত্রটির টিফিন কেনার সামর্থ্য নেই, তাকে একদিন টিফিন করাই। নানা কারণে যে ছেলেটি স্কুলে যেতে পারে না, তাকে লেখাপড়া করালে এক সময় আমাদের স্বপ্ন সার্থক হবে।' বীথি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'ক্লাসের কয়েক বন্ধু মিলে প্রতিদিন একজনকে টিফিন করাতে পারি।' মামা আরও বলতে লাগলেন, 'আমাদের দেশের বাজারে দেশীয় পণ্যের পাশাপাশি বিদেশী পণ্যও আছে। বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে আমাদের দেশীয় পণ্য ব্যবহার করলে দেশের অর্থনীতির উপকারে আসবে। হয়তো আমাদের দেশীয় পণ্য একটু কম উন্নত হতে পারে, কিন্তু আমরা সবাই ব্যবহার করলে চাহিদা বাড়বে, দেশীয় উৎপাদকরা উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করবেন।' আল আমিন বলল, মামা, 'আমাদের বেশি ব্যবহারের কারণে কখনও কি এমন হয়েছে?' মামা উত্তর দিলেন, 'হবে না কেন? আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর আগে আমাদের দেশের ওষুধের বাজার বিদেশী ওষুধের দখলে ছিল। এখন কিন্তু অল্প কিছু ওষুধ ছাড়া বাকি সকল ওষুধ আমরা উৎপাদন করি। অনেক ওষুধ বিদেশেও রফতানি হয়। ইলেকট্রনিকস পণ্যও দেশে উৎপাদিত হয়ে বিদেশে রফতানি হচ্ছে।' মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে দেখে বীথি ও আল আমিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারা দু'জন কানে কানে কী যেন বলল, তারপর এক সাথে দু'জনে মামাকে বলল, 'ছোটমামা, আমরাও আজ থেকে দেশ গড়ার মুক্তিযুদ্ধ শুরু করলাম।'

www.icsbook.info

ওপারের জারজিস

নাবিউল হাসান

হালকা সবুজের মাঝে আকাশের নীল রঙ মিশে স্বচ্ছ আয়নার মতো আরেকটা পৃথিবীর ছবি দেখা যাচ্ছে পুকুরটিতে। সাহেব আলী জমিদারের ৮ বিঘা জমি বিস্তৃত বিশাল এ পুকুর। পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি ডাবগাছ। মাঝে দূরত্ব বজায় রেখে পেয়ারা, বাতাবিলেবু, জামরুল, লটকান, জলপাই, আমড়া, কামরাঙ্গাসহ প্রায় সব প্রজাতির ফলগাছ দিয়ে চার পাশটা মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী রাস্তাটা পুকুর পাড়ের দক্ষিণ দিকে ২০০ গজ দূর দিয়ে অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর বাইরের উঠোন হয়ে জমিদার বাড়িতে প্রবেশ করেছে। রাস্তা ও উঠোনের দুই দিকেই হরেক রকম ফুলগাছ দিয়ে নকশা আঁকানো। পুকুরের পূর্ব পাড়ে বসে আছে হারুন, তমাল, শিশির,

www.icsbook.info

সবুজ এবং কাজল। গ্রামের দুরন্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা এদের বয়স ১৪-১৭ এর মধ্যে। প্রতিদিন জমিদার বাড়ির ফলগাছগুলোতে কয়েক দফা অভিযান চালালেও আজ কোনদিকে তাকিয়ে দেখাছে না তারা। মাথা নিচু করে বসে আছে নীরবে। একজন বন্ধুকে এভাবে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলতে হবে কোনদিনও ভাবেনি কেউ। ফেসবুকের একটিমাত্র স্ট্যাটাস ওদের মনের বাগানে কালবৈশাখী ঝড় বয়ে বেড়াচ্ছে। যে ডাবগাছগুলোতে এতদিন নিদ্বির্ধায় চড়া এবং নামা পছন্দ হতো সেগুলো আজ দাঁতালো রাক্ষুসীর মতো মনে হচ্ছে। কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে ওরা, তাই বলছে না কেউ। কাজল আনমনে হয়ে মোবাইলটা ধরে আছে। এখান থেকেই জারজিস ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদটা এসেছিল। পুকুরের পানি অশান্ত করে দেয়া আর গাছে গাছে দাপিয়ে বেড়ানো ছেলে-পুলেদের এমন ভদ্র হয়ে বসে থাকা লক্ষ করেন জমিদার সাহেব। এক পা দু'পা করে নিঃশব্দে তাদের পেছনে এসে দাঁড়ান। কিছুক্ষণ পর একে একে টের পেয়ে যায় সবাই তবু সস্থানে নীরব বসে থাকে তারা। "কিরে তোমরা আজ পালাচ্ছ না যে?" কিঞ্চিৎ হাসিমাখাকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন সাহেব আলী জমিদার।

"আমরা তো কোন দোষ করিনি আঙ্কেল," আলতোভাবে জবাব দেয় সবুজ। কিন্তু তার কান্নাজড়িত কণ্ঠস্বর ভাষার মোহনায় মিলিত হলো। বিস্মিত হলেন জমিদার। প্রকৃতির নির্মল ছন্দে হেসে-খেলে বেড়ানো কয়েকটা দুরন্ত বালকের অভয়ারণ্য জমিদারের এ পুকুর পাড়টি। প্রতিদিন তারা চুপি চুপি আসে, এগাছ থেকে ওগাছে ওঠে, বিভিন্ন রকম ফল পেড়ে খায়, গাছের ছায়ায় বসে খেলাধুলা করে, পুকুর জলে দাপাদাপি করে গোসল সেরে আবার চলে যায়। জমিদার কাউকে জোরগলায় কোন দিন ধমকও দেননি। তিনি জানতেন প্রকৃতির অন্যান্য শোভার মধ্যে এদের দুষ্টুমিও অন্যতম শোভার আয়োজন করে। কোনদিন খুব বেশি বাড়াবাড়ি হলে বাসা থেকে বাইরে আসাই তাঁর কাজ। তাতেই দৌড়ে পালায় সবাই। এদের এমন নিশ্চিত অবস্থা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেন না তিনি। কী হয়েছে তাদের? মন খারাপ কেন? জানতে ইচ্ছে করে জমিদার সাহেব আলীর। কাছে চলে যান তাদের। কাজল আর হারুনের মাঝখানে বসে পড়েন তিনি। তাদের দু'জনের দুই কাঁধে হাত রেখে জড়িয়ে নেন দু'জনকেই। অবুঝ বালকের মতো বলতে থাকেন, "আমিও তোমাদের বন্ধু, ছোট থেকে এতবড় যে হয়েছ; বলতো কাউকে আমি কোন দিনও কি মেরেছি তোমাদের, জোর

www.icsbook.info

গলায় ধমক দিয়েছি? আমার সমস্ত পুকুর পাড় তোমাদের জন্যই তো উন্মুক্ত। তোমরা কান্না করছ কেন একটু বলা যাবে না?" জমিদার চাচার যে সাগরের মতো উদার হৃদয় এ কথা জানা ছিল না কারো। তাঁর অমায়িক সান্ত্বনার সুখানুভূতি আর জারজিস ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ আনন্দ-বেদনার দু'টি অমলিন ধারা একসঙ্গে ঢেউয়ের মতো আসতে থাকে অশ্রুফোঁটা হয়ে। অনেক কষ্ট করে বলে শিশির, "জারজিস ভাই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন ওপারের যাত্রী হয়ে" বলতে গিয়েও কয়েকটা ধাক্কা খায় সে। আবারও শুরু হয় কান্নার প্রতিযোগিতা। "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জারজিস?" প্রশ্ন করেন জমিদার চাচা। "হ্যাঁ জবাব দেয় সবাই। "ছেলেটা আমাদের চোখের সামনে হেসে খেলে বেড়াত, ভদ্রতা আর মেধাবীর জন্য সবাই ভালোবাসতো তাকে।" বলেই কান্নায় শামিল হলেন জমিদার চাচাও। কামলা-কৃষাণরা মাঠের কাজ সেরে হাত-মুখ ধোয়ার জন্য পুকুর পাড়ে এসেছিল। ছোট ছেলেদের সঙ্গে জমিদার চাচার এমন গলাগলি বন্ধুত্ব দেখে তাজ্জব হয়ে যান সবাই। "গত আট দিন আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ হবিবুর রহমান হলের সামনে এক ডাবগাছে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে যান জারজিস ভাই। সেখানে থেকে রাজশাহী মেডিক্যালে সাত দিন নিবির পরিচর্যা কেন্দ্রে লাইফ সাপোর্টে থাকার পর গতকাল পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তিনি।" জারজিসের চাচাতো ভাই তমালের এমন বর্ণনায় শোকের ছায়া নেমে আসে সাহেব আলী জমিদারের পুকুর পাড়ে। ■

www.icsbook.info

কিশোর কণ্ঠ

গল্পসমগ্র

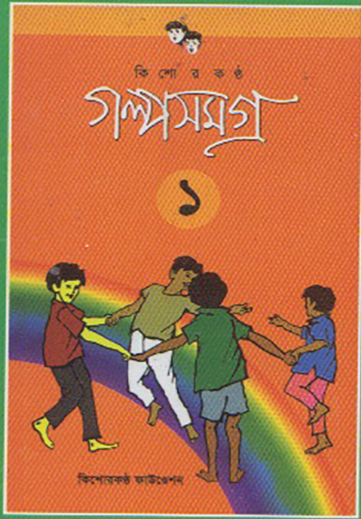

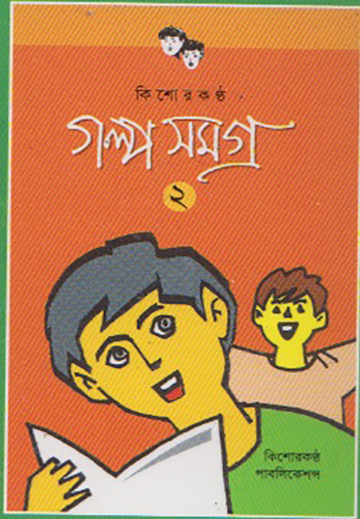

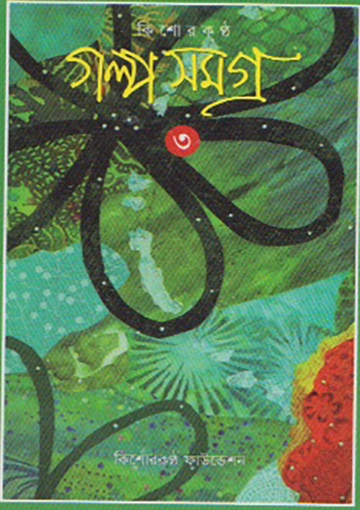

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন